হিজ লাস্ট বাও

আর্থার কোনান ডয়েল

সূচিপত্র

উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি........2
নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক........53
বিদায় নিলেন শার্লক হোমস........107
রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি........141
লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান রহস্য........172
শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায়........210
শয়তানের পা........243

উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ উইসটেরিয়া লজ]

১৮৯২ সালের মার্চ মাস। দিনটা বড়ো বিষণ্ণ, ঝোড়ো বাতাস বইছে একনাগাড়ে। লাঞ্চ খেতে বসে হোমস একটা টেলিগ্রাম পেয়ে তৎক্ষণাৎ তার জবাবও লিখে দিয়েছে। তারপর এ নিয়ে আর কথা বলেনি বটে, তবে আগুনের চুল্লির ধারে দাঁড়িয়ে পাইপ টানতে টানতে এক মনে তা নিয়ে ভাবছে আর মাঝে মাঝে টেলিগ্রামের বয়ানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। এক সময়ে সে আচমকা ফিরে দাঁড়াল আমার দিকে। দেখলাম, দুষ্টুমি নাচছে তার দুই চোখে। বলল, ওয়াটসন, হাজার হলেও তুমি একজন সাহিত্যিক। কিম্ভুতকিমাকার শব্দটার সংজ্ঞা কী বলতে পার?

অদ্ভুত। আশ্চর্য–বললাম আমি।

সংজ্ঞাটা পছন্দ হল না হোমসের। মাথা নেড়ে বললে, তার চাইতেও বেশি। এ-শব্দের পেছনে ছায়ার মতো যেন লেগে আছে অতি ভয়ংকর বিয়োগান্তক কিছু একটা ব্যাপার। অপরাধীর ক্ষেত্রে এই কিম্ভুতকিমাকার শব্দটা যে কতখানি গভীর তোমার লেখা আমার আগেকার কাহিনিগুলোর মধ্যে তার প্রমাণ পাবে। লালচুলো লোকদের ঘটনাটা মনে করে দেখ। প্রথম দিকে তা কিম্ভুতকিমাকার ঠেকলেও শেষের দিকে দেখা গেল বেপরোয়া ডাকাতির কেস। পাঁচটা কমলাবিচির সেই অত্যন্ত কিম্ভুতকিমাকার কেসটার কথাই ধরো

না কেন। কেস শেষ হল খুনের ষড়যন্ত্রে। কিম্ভুতকিমাকার শব্দটা শুনলেই তাই সজাগ হই।

টেলিগ্রামে শব্দটা আছে বুঝি? শুধোই আমি।

হোমস তখন পড়ে শোনাল টেলিগ্রামটা : এইমাত্র একটা অবিশ্বাস্য আর কিম্ভুতকিমাকার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। আপনার পরামর্শ পাব কি?–স্কট ইক্লিস, পোস্ট অফিস, শেরিং ক্রস।

পুরুষ না মহিলা?

পুরুষ তো বটেই। মহিলারা কখনো রিপ্লাই-পেড টেলিগ্রাম পাঠায় না, সশরীরে হাজির হয়।

দেখা করবে তো?

ভায়া ওয়াটসন, তুমি তো জান কর্নেল ক্যারুথার্সকে খাঁচায় পোরার পর থেকে কীরকম একঘেয়ে ভাবে দিন কাটছে আমার। আমার এই মনটা হল ছুটন্ত ইঞ্জিন, যে-কাজের জন্যে সৃষ্টি সে-কাজের মধ্যে না-থাকলে নিজের মনেই ছুটতে ছুটতে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে যায়। জীবন বড়ো মামুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে, খবরের কাগজগুলোয় অপরাধ-জীবাণুর চিহ্নমাত্র নেই, হঠাৎ বড়ো বিশুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। অপরাধ দুনিয়া থেকে রোমান্স আর

ঔদ্ধত্য যেন হঠাৎ চিরবিদায় নিয়েছে। কাজেই যত তুচ্ছ হোক না কেন, কোনো মামলাই পায়ে ঠেলতে এখন রাজি নই। হুম, মক্কেল ভদ্রলোক এসে গেলেন মনে হচ্ছে।

সিঁড়ির ওপর হিসেবি পায়ের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকলেন। গালপাট্টায় পাক ধরেছে, চেহারার মধ্যে অভিজ্ঞতা মাখানো। ভারী মুখ আর জাঁকালো আচরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছে জীবনের ইতিহাস। গোড়ালি ঢাকা কাপড় থেকে আরম্ভ করে সোনার চশমা পর্যন্ত সর্বত্র লেখা একই কাহিনি : ভদ্রলোক সনাতনী, গির্জেভক্ত, সংরক্ষণশীল, গোঁড়া এবং আদর্শ নাগরিক। কিন্তু আশ্চর্য কোনো অভিজ্ঞতার আক্রমণে বেশ বিপর্যস্ত। মনের ওপর দিয়ে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে। চুল খাড়া, মুখ লাল, সাধারণ হাবভাব উত্তেজিত। ঘরে ঢুকেই ঝটপট শুরু করে দিলেন কাজের কথাবার্তা। রাগে ফুলতে ফুলতে বললেন, মি. হোমস, জীবনে এ-রকম পরিস্থিতিতে পড়িনি। অভিজ্ঞতাটা যেমন অস্বস্তিকর, তেমনি আশ্চর্য। অত্যন্ত অন্যায়, অত্যন্ত যাচ্ছেতাই। এ কী উৎপাত বলুন তো। আমি এর মানে জানতে চাই।

স্নিগ্ধকণ্ঠে হোমস বললে, মশাই, আগে বসুন। তারপর বলুন প্রথমেই আমাকে স্মরণ করলেন কেন?

আরে মশাই, এ-কেস পুলিশের আওতায় আসে বলে মনে হয় না আমার। সব ঘটনা শুনলে আপনিও বুঝবেন। এমনিও ফেলে রাখা যায় না, কিছু একটা করা দরকার। যদিও প্রাইভেট ডিটেকটিভদের ওপর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আমার নেই, কিন্তু আপনার নাম শোনবার পর...

বেশ, বেশ। এবার বলুন তো সঙ্গেসঙ্গে এলেন না কেন?

কী বলতে চান?

ঘড়ি দেখল হোমস। বলল, এখন সোয়া দুটো। একটা নাগাদ পাঠিয়েছিলেন টেলিগ্রাম। কিন্তু আপনার প্রসাধন আর পরিচ্ছদের অবস্থা দেখে একমাত্র অন্ধ ছাড়া প্রত্যেকেই বলবে, ঘুম ভাঙার পর থেকেই ঝাটে পড়েছেন আপনি।

হাত দিয়ে অবিন্যস্ত চুল সমান করে নিয়ে না-কামানো গালে হাত বোলালেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, বলেছেন ঠিক, মি. হোমস। প্রসাধন-পারিপাট্য নিয়ে ভাববার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। আমি তখন ওইরকম একখানা বাড়ি থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি। তারপর থেকে আপনার কাছে আসা পর্যন্ত ক্রমাগত দৌড়োচ্ছি নানান তত্ত্ব তল্লাশি নিয়ে। হাউস এজেন্টের কাছে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, মি. গারসিয়াকে বাড়িভাড়া দেওয়াই আছে, উইসটেরিয়া লজের ব্যাপারে কোনোরকম লটঘট নেই।

মি, স্কট ইক্লিস, আপনি দেখছি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনের মতো উলটোভাবে গল্প শুরু করেন, শেষের কাহিনি আগে বলে দেন। বড়ো বাজে অভ্যেস। ভাবনাচিন্তাগুলো আগে মনে মনে সাজিয়ে নিন। তারপর পর পর যেভাবে যা-যা ঘটেছিল সব বলে যান। বলুন কেন চুল না-আঁচড়ে দাড়ি না-কামিয়ে, বুট আর ওয়েস্টকোটের বোম পর্যন্ত ঠিকমতো না-লাগিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এসেছেন আমার পরামর্শ আর সাহায্য নিতে।

মক্কেল ভদ্রলোক হতাশ মুখভঙ্গি করে তাকালেন নিজের বিপর্যস্ত চেহারার দিকে। বললেন, কী করব বলুন, জীবনে এ-রকম ঝামেলায় পড়িনি। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। গোড়া থেকে বলছি শুনুন। শোনবার পর বুঝবেন কেন এইভাবে আপনার সামনে–

ভদ্রলোকের কথা শেষ হল না, বাইরে একটা হুড়মুড় আওয়াজ, মিসেস হাডসনের ঝটিতি দ্বার উন্মোচন এবং ঝড়ের মতো রঙ্গস্থলে গাঁট্টাগোট্টা দুই পুলিশ অফিসারের প্রবেশ। এদের একজনকে আমি চিনি–স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর গ্রেগসন। অত্যুৎসাহী, সাহসী কিন্তু বুদ্ধিমত্তার দৌড় সীমিত। শার্লক হোমসের সঙ্গে সঙ্গী অফিসারের পরিচয় করিয়ে দিল গ্রেগসন। সারে কন্সট্যাবুলাবির ইনস্পেকটর বেলেজ।

তারপর বললে, মি. হোমস, শিকারের পিছু নিয়ে ছুটে এসেছি এখানে। অতঃপর তার ডালকুত্তা-চক্ষু নিবদ্ধ হল দর্শনার্থীর ওপর আপনার নাম মি. জন স্কট ইক্লিস, নিবাস লী-এর পপহ্যাম হাউসে, কেমন?

অবশ্যই।

সকাল থেকে আপনাকে ফলো করছি আমরা।

টেলিগ্রামটা দেখে বুঝলেন যে, এখানে এসেছেন উনি? বললে হোমস।

ঠিক ধরেছেন। শেরিং ক্রস পোস্ট অফিসে গিয়ে খোঁজখবর নিয়ে জানলাম কার দরজা মাড়িয়েছেন। তারপর সোজা চলে এলাম।

কিন্তু ফলো করছেন কেন? কী চান? দর্শনার্থীর প্রশ্ন।

আপনার জবানবন্দি। উইসটেরিয়া লজ নিবাসী মি. অ্যালয়সিয়াস গারসিয়া কাল রাতে মারা গেছেন কীভাবে, সেই সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনতে চাই।

বিস্ফারিত চোখে সোজা হয়ে বসলেন মক্কেল ভদ্রলোক। বিস্মিত মখ থেকে তিরোহিত হল যাবতীয় বর্ণ। অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, মারা গেছেন? বলছেন কী? মারা গেছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছেন।

কিন্তু কীভাবে? অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?

খুন হয়েছেন।

ও গড! কী সাংঘাতিক! আপনি... আপনি কি তাহলে আমাকে সন্দেহ করছেন?

নিহত ব্যক্তির পকেটে আপনার লেখা চিঠি পাওয়া গেছে। আপনি লিখেছিলেন, কাল রাতটা তার বাড়িতে থাকবেন।

হ্যাঁ লিখেছিলাম।

আচ্ছা! লিখেছিলেন তাহলে!

ফস করে বেরিয়ে পড়ল পুলিশ নোটবই। এক সেকেন্ড, গ্রেগসন। বাধা দিল শার্লক হোমস, তুমি চাও সাদাসিধে একটা জবানবন্দি, কেমন?

সেইসঙ্গে মি. স্কট ইক্লিসকে হুঁশিয়ারও করে দিতে চাই–জবানবন্দি তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতে পারে।

তুমি ঘরে ঢোকার পূর্বমুহূর্তে সব কথাই বলতে যাচ্ছিলেন মি. ইক্লিস। ওয়াটসন, একটু ব্র্যান্ডি আর সোডা দাও ওঁকে। মি. ইক্লিস, এবার যা বলতে যাচ্ছিলেন। ঘরে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। ঠিক যেভাবে শুরু করছিলেন, ওইভাবে চালিয়ে যান।

কোঁত করে ব্র্যান্ডি-সোডা গিলে নিলেন দর্শনার্থী। রং ফিরে এল মুখে। সন্দিগ্ধ চোখে ইনস্পেকটরের নোটবইয়ের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন অসাধারণ জবানবন্দি।

আমি বিয়ে করিনি। মিশুকে বলে এন্তার বন্ধুবান্ধব। এদের মধ্যে একটি ফ্যামিলির নাম মেলভিল। এককালে এদের ড্রিঙ্কসের কারবার ছিল, এখন রিটায়ার করেছে। থাকে

কেনসিংটনের অ্যালবামারলে ম্যানসনে। কয়েক হপ্তা আগে এর বাড়িতেই টেবিলে আলাপ হল একজন ইয়ংম্যানের সঙ্গে, নাম তার গারসিয়া। শুনলাম, জন্মসূত্রে সে স্পেনের মানুষ। দূতাবাসের সঙ্গেও কীরকম একটা যোগসূত্র আছে। চমৎকার ইংরেজি বলে, ব্যবহার বড়ো মধুর, দেখতেও বড়ো মিষ্টি। এমন অপূর্ব চেহারা জীবনে দেখিনি।

বন্ধুত্ব নিবিড় হল ইয়ংম্যানের সঙ্গে। বেশ লাগত গারসিয়াকে। আমার লীয়ের বাড়িতে এল আলাপ যেদিন হল সেইদিনই। তারপর আমাকে নেমন্তন্ন করল ওর বাড়ি উইসটেরিয়া লজে দিন কয়েক কাটিয়ে আসার জন্যে। বাড়িটা এশার আর অক্সশটের মাঝামাঝি জায়গায়। গতকাল সন্ধ্যায় এশার গেলাম কথামতো।

বাড়ির খবর আগেই শুনেছিলাম গারসিয়ার মুখে। দেশোয়ালি একটি চাকরের সঙ্গে থাকে গারসিয়া। খুব বিশ্বাসী লোক। গারসিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম সে করে। ইংরিজিটা বলে ভালো, সংসার ঠেলে নিজের হাতে। এ ছাড়া আছে একজন পাঁচক–দেশে দেশে বেড়াতে গিয়ে পথে কুড়িয়ে পাওয়া বলতে পারেন–শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা নেই, কিন্তু রাঁধে চমৎকার। কথার ফাঁকেই জেনেছিলাম এসব। গারসিয়া আরও বলেছিল, সারে-র বুকে অদ্ভুত এই গেরস্থালির মধ্যে থাকতে হয় তাকে। গেরস্থালিটা যা শুনেছিলাম তার চাইতে যে ঢের বেশি অদ্ভুত, সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম পরে।

এশারের মাইল দুয়েক দক্ষিণাঞ্চলে গাড়ি হাঁকিয়ে গেলাম আমি। মাঝারি সাইজের বাড়ি, রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে, বাড়ির সামনের পথটার দু-পাশে উঁচু উঁচু চির সবুজ গাছের সারি। বেশ সেকেলে বাড়ি, জরাজীর্ণ অবস্থা, মেরামত হয়নি অনেকদিন। ঘাসছাওয়া পথ

মাড়িয়ে ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল ছাতলা পড়া রোদ আর বৃষ্টিতে বিবর্ণ দরজার সামনে। গারসিয়া নিজে দরজা খুলে বেশ খাতির করে আমাকে নিয়ে গেল ভেতরে। মালপত্র বয়ে নিয়ে গেল চাকরটা। দেখলুম কীরকম যেন মিইয়ে পড়া বিমর্ষ চেহারা তার। গারসিয়া আগে দেখাল আমার শোবার ঘর। পুরো বাড়িটাই যেন বুকের ওপর চেপে বসে, মন যেন দমে যায়। খেতে বসে গারসিয়া সমানে বকে চললেও লক্ষ করলাম, কথার মধ্যে সংগতি নেই। ঝাঁপসা আবোল-তাবোল বকুনির মাথামুণ্ডু বুঝতে পারলাম না। এক নাগাড়ে টেবিলে আঙুলের টরে টক্কা বাদ্যি বাজিয়ে, কখনো নখ কামড়ে নানারকমভাবে গারসিয়া বুঝিয়ে দিলে, ভেতরে ভেতরে ও যেন দারুণ ঘাবড়ে গিয়েছে। খাবার-টাবারও খুব ভালো রান্না হয়নি, পরিবেশনের মধ্যেও খুঁত রয়েছে। বিষণ্ণ আর কাঠখোট্টা চাকরটা হাজির থাকায় খাওয়ার আনন্দটাও যেন মাঠে মারা গেল। বেশ কয়েকবার ভাবলাম, ছুতোনাতা করে সরে পড়ি, ফিরে যাই লীতে।

আপনারা দুজনে যে-ব্যাপারে তদন্ত করতে নেমেছেন, একটা ঘটনা শুনলে সে-ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত ঘটতে পারে। তখন অবশ্য এ নিয়ে একদম ভাবিনি। খাওয়া যখন শেষ হতে চলেছে, একটা চিরকুট এনে দিলে চাকরটা। লক্ষ করলাম, চিরকুটটা পড়েই যেন আগের চাইতে উন্মনা আর বিচিত্র হয়ে গেল গারসিয়া। এতক্ষণ জোর করে কথা বলে অতিথি আপ্যায়নের চেষ্টা করছিল। চিরকুট পাওয়ার পর সে-চেষ্টাও আর করল না। একটার পর একটা সিগারেট টানতে টানতে গুম হয়ে বসে রইল। চিরকুটে কী লেখা আছে, সে-সম্পর্কেও কিছু বলল না। এগারোটা নাগাদ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম শোবার ঘরে গিয়ে। কিছুক্ষণ পর দরজায় এসে দাঁড়াল গারসিয়া। ঘর তখন অন্ধকার। জিজ্ঞেস করল আমি ঘন্টা বাজিয়ে চাকরকে তলব করেছি কি না। করিনি বললাম। এত রাতে বিরক্ত

করার জন্য ক্ষমা চাইল গারসিয়া। ওর মুখেই জানলাম, রাত কম হয়নি প্রায় একটা। এর পরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই রাত কাবার।

এবার আসছি আমার কাহিনির সবচেয়ে অদ্ভুত জায়গায়। ঘুম যখন ভাঙল, রোদ তখন বেশ চড়চড়ে। ঘড়ি দেখলাম, প্রায় ন-টা বাজে। বলে রেখেছিলাম, আটটায় যেন তুলে দেওয়া হয় আমাকে। ডাকেনি দেখে অবাক হলাম। ঘন্টা বাজিয়ে ডাকলাম চাকরকে। সাড়া পেলাম না। ঘণ্টা বিগড়োয়নি তো? ধড়ফড় করে কোনোমতে জামাকাপড় পরে নিয়ে হুড়মুড় করে নীচে নেমে এলাম গরম জল চাইতে। কাকপক্ষীকেও দেখতে পেলাম না। হল ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করলাম। কেউ জবাব দিল না। ঘরে ঘরে দৌড়োলাম। সব ঘরই ফাঁকা। আগের রাতে গারসিয়া দেখিয়েছেন কোন ঘরে শোয়। সেই ঘরে গিয়ে পাল্লা খুলে ঢুকলাম ভেতরে। ঘর খালি, বিছানায় কেউ শোয়নি–চাদর নিভঁজ! চাকরবাকর সমেত গৃহস্বামীও সটকেছে বুঝলাম। একরাতেই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে পরদেশি রাঁধুনি, বিদেশি চাকর এবং ভিনদেশি গৃহস্বামী! উইসটেরিয়া লজে এর পর আর কেউ থাকে।

দু-হাত ঘষতে ঘষতে আপনমনে খুকখুক করে হাসতে হাসতে বিচিত্র কাহিনি শ্রবণ করল শার্লক হোমস। বলল, আপনার অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে তুলনাবিহীন। এবার বলুন, তারপর কী করলেন।

রেগে টং হলাম। প্রথমে ভাবলাম, নিশ্চয়ই গাড়োয়ানি ইয়ার্কি করা হচ্ছে আমার সঙ্গে। ব্যাগে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম এশারের দিকে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো ল্যান্ড এজেন্ট অ্যালান ব্রাদার্সের অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানলাম,

বাড়িটা তাদের কাছ থেকেই ভাড়া নেওয়া হয়েছে। তখন মনে হল এত কাণ্ড নিশ্চয়ই আমাকে বোকা বানানোর জন্যে করা হয়নি, আসলে ভাড়া না-দিয়ে পালিয়েছে গারসিয়া। মার্চের প্রায় শেষ, শেষ কয়েকটা দিনের ভাড়া তো মেরে দেওয়া গেল। কিন্তু সে গুড়েও বালি পড়ল, যখন শুনলাম, ভাড়া আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। শহরে ফিরে এসে গেলাম স্পেনের দূতাবাসে। গারসিয়াকে কেউ চেনে না সেখানে। গেলাম মেলভিলের বাড়িতে। কিন্তু দেখলাম, আমার চাইতেও সে কম খবর রাখে গারসিয়া সম্পর্কে। সবশেষে আপনার কাছ থেকে টেলিগ্রামের জবাব পেয়ে সটান চলে এলাম এখানে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে। কিন্তু এখন ইনস্পেকটরদের মুখে শুনছি সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে উইসটেরিয়া লজে। যা বললাম, তা সত্যি এ ছাড়া কোনো খবরই আমি রাখি না। কিন্তু পুলিশকে সবরকমভাবে সাহায্য করতে চাই।

অমায়িক স্বরে ইনস্পেকটর গ্রেগসন বলল, মি. স্কট ইক্লিস, আপনি যা যা বললেন, তার সবই প্রায় ঘটনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, ওই চিরকুটখানা, খাবার টেবিলে যা হাজির করেছিল। তারপর কী গতি হয়েছিল চিরকুটটার লক্ষ করেছিলেন কি?

দলা পাকিয়ে আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল গারসিয়া।

মি. বেনেজ, কী মনে হয় আপনার?

মি. বেনেজ মৃদুমন্দ হাসল। পকেট থেকে বার করল একটা দলাপাকানো বিবর্ণ কাগজ। ভদ্রলোকের মোটাসোটা লালচে ফুলো মুখের চামড়ার ভাঁজে ঢাকা অত্যুজ্জ্বল অসাধারণ

চক্ষু সত্যিই নজর কাড়বার মতো। বলল, মি. হোমস, গারসিয়া একটু বেশি জোরে ছুঁড়েছিল চিরকুটটা, চুল্লি টপকে গিয়ে ওটা পড়েছিল পেছনে। না-পোড়া অবস্থায় কুড়িয়ে পেয়েছি আমি।

মৃদু হেসে তারিফ জানাল হোমস। বলল, এ-রকম একটা কাগজ যখন খুঁজে পেয়েছেন, তখন কি ধরে নিতে পারি, পুরো বাড়িটাই খুঁজেছেন তন্নতন্ন করে।

আমার কাজের ধারাই সে-রকম, মি. হোমস। মি. গ্রেগসন, পড়ব?

ঘাড় নেড়ে সায় দিল লন্ডন ইনস্পেকটর।

কাগজটা সাধারণ ক্রীম-লেড পেপার। জলছাপ নেই। একটা কাগজের চার ভাগের এক ভাগ। ছোটো ফলাওলা কঁচি দিয়ে কাটা কাগজ। তিন ভাজ করে লাল গালা দিয়ে সিলমোহর করে একটা চেপটা ডিমের মতো জিনিস দিয়ে তাড়াহুড়ো করে চাপা হয়েছে। ঠিকানাটা উইসটেরিয়া লজের মি. গালিসার নামে। চিঠির বয়ান :–আমাদের নিজেদের রং সবুজ আর সাদা। সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ। মূল সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডাইনে সপ্তম, সবুজ উলের আচ্ছাদন। তাড়াতাড়ি। ডি। হাতের লেখা মেয়েলি, সরু মুখ কলমে লেখা। কিন্তু ঠিকানাটা হয় অন্য কলমে, না হয় অন্য কারো হাতে লেখা। বেশ মোটা, বলিষ্ঠ লেখা।

চিরকুটে চোখ বুলিয়ে হোমস বলল, সত্যিই আশ্চর্য চিঠি। খুঁটিয়ে দেখার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। মি. বেনেজ, ছোটোখাটো দু-একটা ব্যাপার এর সঙ্গে জুড়ে দিতে চাই। ডিশের মতো জিনিসটা হল শার্টের কাফলিংক, সিলমোহর করা হয়েছে তা-ই দিয়ে। কঁচিটা নখকাটা কঁচি। দু-বার কচি মারা হয়েছে প্রতিবার, দু-বারেই দেখুন একইভাবে বেঁকে বেঁকে পড়েছে কাঁচির ফলা।

শুকনো হাসি হাসল বেনেজ। বলল, ভেবেছিলাম, সব খবর বার করতে পেরেছি। চিঠির বয়ান সম্বন্ধে কিন্তু এখনও যে তিমিরে, সেই তিমিরে। শুধু বুঝছি, এর মধ্যে একটা চক্রান্ত আর সব কিছুর মুলে একজন স্ত্রীলোক রয়েছে।

নড়েচড়ে বসলেন মি. ইক্লিস। বললেন, মি. গারসিয়ার কী হল তা কিন্তু এখনও শুনলাম না।

গ্রেগসন বললে, বাড়ি থেকে প্রায় একমাইল দূরে অক্সশট কমনে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। গারসিয়াকে। ভারী বালির বস্তা বা এ-জাতীয় কোনো জিনিস দিয়ে মেরে তার খুলি ভেঙে একেবারে পিণ্ডি চটকে দেওয়া হয়েছে। জায়গাটা নির্জন, সিকি মাইলের মধ্যে কোনো বাড়ি নেই। প্রথমে মাথায় মারা হয়েছিল পেছন থেকে। মারা যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ ধরে থেঁতো করা হয়েছে মাথাটা। বড়ো ভয়ংকর আক্রমণ। কারো পায়ের ছাপ বা আততায়ীদের কোনো সূত্র পাওয়া যায়নি।

উদ্দেশ্যটা ডাকাতি নয় তো?

ডাকাতির কোনো চেষ্টা দেখা যায়নি।

কাঁপা গলায় মি. ইক্লিস বললেন, কিন্তু আমার সঙ্গে গারসিয়ার মৃত্যুর কী সম্পর্ক? কিছুই তো জানি না। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন?

খুব সহজ কারণে বলল ইনস্পেকটর বেনেজ, নিহত ব্যক্তির কী নাম এবং কোন বাড়িতে থাকে, তা জানা গেছে একটা খামে লেখা নাম-ঠিকানা থেকে। চিঠিখানা লিখেছিলেন আপনি, পাওয়া গেছে তাও পকেটে। ঠিকানা অনুযায়ী ন-টার পর উইসটেরিয়া লজে পৌঁছে আপনার টিকি দেখতে না-পেয়ে মি. গ্রেগসনকে টেলিগ্রাম করে দিলাম, যেন লন্ডনে আপনাকে খোঁজ করা হয়। তারপর খানাতল্লাশি শুরু করলাম উইসটেরিয়া লজে। শেষকালে এলাম শহরে। দেখা করলাম মি. গ্রেগসনের সঙ্গে এবং হাজির হলাম এখানে।

গ্রেগসন উঠে দাঁড়িয়ে বললে, এবার কর্তব্য করা যাক। মি. ইক্লিস, আপনি থানায় গিয়ে এজাহার দেবেন চলুন।

নিশ্চয়ই যাব। মি. হোমস, আপনি কিন্তু এর পেছনে লেগে থাকুন, রহস্য ফাঁস করুন। আপনাকে আমি ছাড়ছি না।

হোমস বলল, আচ্ছা মি. বেনেজ, আপনার সঙ্গে আমি তদন্ত চালিয়ে গেলে আপত্তি করবেন তো?

সম্মানিত বোধ করব।

ঠিক কোন সময়ে গারসিয়া মারা গেছে জানতে পেরেছেন? কোনো সূত্র?

রাত একটা থেকে ছিল ওখানে। বৃষ্টি হয়েছিল একটা নাগাদ। মারা গেছে বৃষ্টির আগে।

কিন্তু তা অসম্ভব, মি. বেনেজ। সবিস্ময়ে বললেন মি. ইক্লিস, গারসিয়ার গলা আমি চিনি। দিব্যি গেলে বলতে পারি, ঠিক ওই সময়ে শোবার ঘরে মুখ বাড়িয়ে কথা বলে গেছে ও।

খুবই আশ্চর্য ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু অসম্ভব নয়। হাসতে হাসতে বললে হোমস।

সূত্র হাতে এসেছে মনে হচ্ছে? শুধোয় গ্রেগসন।

কেসটা চমকপ্রদ। কিন্তু মোটেই জটিল নয়। তবে সব তথ্য না-জানা পর্যন্ত মুখ খোলা সমীচীন হবে না। ভালো কথা, মি. বেনেজ, বাড়ি তল্লাশ করে এই চিরকুট ছাড়া আর কিছু পেয়েছেন?

অদ্ভুত চোখে বন্ধুর পানে তাকায় সরকারি ডিটেকটিভ। তারপর বলে, তা পেয়েছি। আশ্চর্য কয়েকটা জিনিস চোখে পড়েছে। থানার কাজ শেষ করে আপনাকে নিয়ে গিয়ে চাক্ষুষ দেখাবখন।

ঘন্টা বাজিয়ে মিসেস হাডসনকে ডেকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে বললে হোমস, রিপ্লাই-পেড় টেলিগ্রাম। দুই ইনস্পেকটরকে নিয়ে মি. ইক্লিস গেলেন থানায়।

চুপ করে বসে আছি দুজনে। হোমস চিন্তানিবিষ্ট, ভুরু কুঁচকে নেমে এসেছে সূচীতীক্ষ্ণ দুই চোখের ওপর, মাথা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, ধূমপান করছে অনর্গল।

হঠাৎ আমার দিকে ফিরে হোমস বলল, ওয়াটসন, কী বুঝলে?

কিস্‌সু না। স্কট ইক্লিস যা নিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছেন, আমার কাছে এখনও তা রহস্যাবৃত।

কিন্তু খুনটা তো আর অস্পষ্ট নয়।

নিহত ব্যক্তির লোকজন পালিয়েছে যখন, বুঝতে হবে, খুনের সঙ্গে তারাও জড়িয়ে পড়েছে, পালিয়েছে পুলিশের ভয়ে।

কিন্তু ভায়া, মনিবকে খুন করার জন্যে যেকোনো একটা রাত নির্বাচন করলেই তো হত, বাড়িতে যেদিন অতিথি হাজির, ঠিক সেদিনই খুন না-করলে কি চলত না?

তাহলে পালাল কেন?

তাও তো বটে। পালাল কেন? এটা যেমন একটা বিরাট ঘটনা, ঠিক তেমনি আর একটা বিরাট ঘটনা হল মি. স্কট ইক্লিসের আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। এই দুই ঘটনার যোগসূত্র হিসেবে যদি বিচিত্র ওই চিরকুটকে ধরে নিতে পারি, তাহলে কিন্তু সমাধানে পৌঁছোতে বেশি দেরি নাও হতে পারে।

বুঝলাম। কিন্তু তোমার আন্দাজি যোগসূত্রটা কী, তা বলবে তো?

অর্ধনিমীলিত চোখে চেয়ারে হেলান দিল হোমস। বলল, ওয়াটসন, গাড়োয়ানি ইয়ার্কির সম্ভাবনা বাদ দিতে পার। জলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন হয়েছে অত্যন্ত নৃশংসভাবে এবং উইসটেরিয়া লজে মি, স্কট ইক্লিসকে ভুলিয়েভালিয়ে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তার একটা সম্পর্ক আছে।

কী সম্পর্ক?

পাটে পাটে ভাঁজ খোলা যাক। প্রথমে দেখা যাচ্ছে, স্পেনের এই ছোকরা হঠাৎ দারুণ ভাব জমিয়ে ফেলল ইংলন্ডের এক জমাটি ভদ্রলোকের সঙ্গে। আলাপ জমানোর ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে গারসিয়া নিজে। যেদিন প্রথম পরিচয়, সেইদিনই লন্ডনের অপর প্রান্তে গিয়েছে ইক্লিসের বাড়িতে। দু-দিন যেতে-না-যেতেই নেমন্তন্ন করে নিয়ে গেছে নিজের বাড়িতে। কিন্তু কেন? কী এমন আকর্ষণ আছে মি. স্কট ইক্লিসের মধ্যে? ব্যক্তিত্ব? বুদ্ধিমত্তা? সে-রকম কিছুই তো নেই। তা সত্ত্বেও লন্ডন শহরের এত লোকের মধ্যে

থেকে স্কট ইক্লিসকে পছন্দ করেছে গারসিয়া নিজের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। কী গুণ দেখে জান? মি. স্কট ইক্লিস হলেন একজন খাঁটি মানী ইংরেজ, যা শোনামাত্র বিশ্বাস করবে যেকোনো ইংরেজ। দেখলে না ভদ্রলোকের আশ্চর্য কাহিনি নিয়ে বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস প্রকাশ করল না দুই দুঁদে পুলিশ অফিসার?

কিন্তু বাড়িতে নিয়ে গেল কেন? কী দেখাতে?

যা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, তা আর দেখানো হয়নি। সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস তা-ই।

অন্যত্রস্থিতি, মানে, অ্যালিবির সাক্ষী হিসেবে নিশ্চয়ই?

আরে ভায়া ঠিক ধরে ফেললে দেখছি। তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি, উইসটেরিয়া লজের প্রত্যেকেই একই চক্রান্তের চক্রী। মি. ইক্লিস মনে করেছেন, এগারোটায় শুতে গেলেন। আসলে গেছেন তার অনেক আগে। চালাকি করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে তাকে দেখানো হয়েছে এগারোটা। তারপর গারসিয়া গিয়ে অন্ধকারে তাকে বলেছে, রাত একটা বাজে। সে আসলে গেছে বারোটা নাগাদ। অর্থাৎ বারোটায় বেরিয়ে একটার মধ্যে ফিরে আসত গারসিয়া। কোর্টে গিয়ে হলফ করে বলতেন মি. ইক্লিস, গারসিয়ার কণ্ঠস্বর শুনেছেন তিনি একটা নাগাদ। সব্বাই তা বিশ্বাস করত।

কিন্তু বাড়ির সবাই হাওয়া হয়ে গেল কেন?

সব ঘটনা না-জানা পর্যন্ত ফট করে কিছু বলতে চাই না।

চিরকুটের বয়ান সম্বন্ধে কী বলবে?

কী ছিল চিঠিতে? আমাদের নিজেদের রং সবুজ আর সাদা। কথাগুলো রেসের কথা মনে করিয়ে দেয় না কি? সবুজ খোলা, সাদা বন্ধ। নিশ্চয়ই একটা সংকেত। মূল সিঁড়ি, প্রথম বারান্দা, ডাইনে সপ্তম, সবুজ উলের আচ্ছাদন। অর্থাৎ বিশেষ একটা কাজের দায়িত্ব। সব কিছুর মূলে শেষ পর্যন্ত দেখব হয়তো ঈর্ষাকাতর কোনো ব্যক্তিকে। খুবই বিপজ্জনক কাজের দায়িত্ব, নইলে তাড়াতাড়ি শব্দটা লিখত না। ডি হল সেই ব্যক্তি যে এই নিশানা দিচ্ছে।

ডি নামে হয়তো ডলোরেস, স্পেনে খুব চালু নাম। লোকটাও তো স্প্যানিয়ার্ড।

বলেছ ভালো, কিন্তু ভায়া মোটেই ঠিক নয়। কেননা একজন স্প্যানিয়ার্ড যখন আরেকজন

স্প্যানিয়ার্ডকে চিঠি লেখে, স্পেনের ভাষাতেই লেখে, ইংরেজিতে লেখে না। চিঠি যে লিখেছে, নিঃসন্দেহে সে ইংরেজ। ধৈর্য ধরো বন্ধু, ইনস্পেকটর কী খবর আনেন দেখা যাক।

ইনস্পেকটর এসে পৌঁছোনোর আগেই এল হোমসের টেলিগ্রামের জবাব। পড়বার পর নোটবইয়ে রাখতে গিয়ে আমার সাগ্রহ মুখচ্ছবি দেখে হেসে ফেলল হোমস, টোকা মেরে সেটা এগিয়ে দিল আমার দিকে।

তুলে নিলাম তারবার্তা। দেখলাম, সারি সারি অনেকগুলো অভিজাত নাম আর ঠিকানা : লর্ড হ্যারিংবি, দ্য ডিঙ্গল, স্যার জর্জ ফলিয়ট, অক্সশট টাওয়ার্স, মি. হাইনিজ, জে পি, পার্ডে প্লেস, মি. জেমস বেকার উইলিয়ামস, ফোটন ওল্ড হল, মি. হেনডারসন, হাই গেবল; রেভারেন্ড জোসুয়া স্টোন, নেদার, নেদার ওয়াল স্লিং।

হোমস বললে, তদন্তক্ষেত্র বেশ সংকীর্ণ হয়ে এল হে। আশা করি বেনেজ ওর সাজানো মন নিয়ে ঠিক এই প্ল্যান অনুসারে তদন্ত চালাচ্ছে।

স্পষ্ট বুঝলাম না।

ভায়া, চিরকুট পাঠিয়ে কোনো একটা কাজের জন্যে বা দেখা করার জন্যে ডেকে পাঠানো হয়েছিল, এটা তো বোঝা গেল। তা-ই যদি হয়, তাহলে গারসিয়াকে কোনো একটা বাড়ির মূল সিঁড়ি বেয়ে উঠে বারান্দা বেয়ে উঠে ডান দিকের সপ্তম দরজায় ঢুকতে হত। অর্থাৎ বাড়িখানা বেশ বড়ো, আর অক্সশট থেকে দু-এক মাইলের মধ্যে, কেননা ওইদিকেই হাঁটছিল গারসিয়া এবং তাকে অ্যালিবি রক্ষার্থে একঘণ্টা মানে একটার মধ্যে ফিরে আসতে হত উইসটেরিয়া লজে। অক্সশটের কাছাকাছি পেল্লায় বাড়ি সংখ্যায় খুব

বেশি নেই আশা করে মি. ইক্লিস-বর্ণিত ল্যান্ড এজেন্টের শরণাপন্ন হলাম এবং ফিরতি টেলিগ্রামে পেলাম এই লিস্ট।

ছটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম এশারের সারে গ্রামে। সঙ্গে ইনস্পেকটর বেনেজ। রাত কাটানোর সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়েই এসেছিলাম। সরাইখানায় সেসব রেখে বেজেকে নিয়ে রওনা হলাম উইসটেরিয়া লজ অভিমুখে। তখন বৃষ্টি পড়ছে, জোরে হাওয়া দিচ্ছে। মার্চের কনকনে ঠান্ডা রাতে চোখে-মুখে সূচীতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ঝাঁপটা সইতে সইতে অগ্রসর হলাম এক বিয়োগান্তক পরিণতির দিকে।

২. সান পেদ্রোর শার্দুল

মাইল দুয়েক হেঁটে পৌঁছোলাম স্লেট-রঙা আকাশের পটভূমিকায় পিচের মতো কালো একটা বিমর্ষ বাড়ির সামনে। কাঠের ফটক থেকে গাড়ি যাওয়ার রাস্তার দুপাশে চেস্টনাট গাছের সারি। দরজার বাঁ-দিকের একটা জানলা থেকে ম্যাড়মেড়ে আলো পড়ছে বাইরে।

একজন কনস্টেবল মোতায়েন রেখেছি বাড়িতে। বলে বেনেজ শার্সির কাচে আঙুল ঠুকল ঠকঠক করে। কুয়াশায় ঝাঁপসা কাচের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম, ঠকঠক আওয়াজ শুনেই আর্ত চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল একজন কনস্টেবল। প্রায় সঙ্গেসঙ্গে খুলে গেল দরজা। ঠকঠক করে কাঁপছে লোকটা, মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে বিষম ভয়ে, হাতের মোমবাতি পর্যন্ত স্থির নেই।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে বেনেজ, ওয়াল্টার্স, ব্যাপার কী?

রুমাল বার করে কপাল মুছল ওয়াল্টার্স। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললে, তা-ই বলুন আপনারা এসেছেন! উফ! আমার নার্ভ আর সইতে পারছিল না।

তোমার শরীরে নার্ভ আছে জানা ছিল না তো?

কীরকম খাঁ খাঁ করছে দেখেছেন বাড়িটা? তার ওপরে রান্নাঘরে ওইসব অদ্ভুত জিনিস। কোথাও কোনো শব্দ নেই। এমন সময়ে শার্সিতে ঠকঠক আওয়াজ শুনে ভাবলাম, ওই রে, আবার বুঝি এসেছে!

কে এসেছে?

পিশাচ! জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কখন?

ঘণ্টাদুয়েক আগে। দিনের আলো তখন কমে এসেছে। চেয়ারে বসে বই পড়ছি। হঠাৎ চোখ তুললাম। কেন তুললাম তা বলতে পারব না। দেখলাম, নীচের শার্সিতে মুখ চেপে

ধরে পিশাচ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সে কী মুখ স্যার! স্বপ্নে দেখলেও আঁতকে উঠব!

ছিঃ ওয়াল্টার্স! তুমি না পুলিশ কনস্টেবল?

জানি, স্যার, জানি। কিন্তু ভয়ে আমার ধাত ছেড়ে গিয়েছে। মুখটা স্যার কালো নয়, সাদাও নয়, দুনিয়ার কোনো রং দিয়েই যেন তৈরি নয়। কাদায় দুধ গুলে দিলে যা হয়, অনেকটা যেন সেইরকম। সাইজে আপনার মুখের দু-গুণ। দু-চোখ ভাটার মতো ঘুরছে। দু-পাটি দাঁত হিংস্র জানোয়ারের মতো ঝকঝকে, খিদের চোটে যেন টসটস করে লাল ঝরছে জিভ দিয়ে। স্যার, বিকট বীভৎস সেই মুখ দেখে আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারি না আমি। চেয়ে ছিলাম ফ্যালফ্যাল করে। তারপর সাঁৎ করে মুখটা সরে যেতেই ঝড়ের মতো বেরিয়ে এলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম। ঝোপ পর্যন্ত খুঁজলাম। কিন্তু কারো টিকি দেখলাম না। ভাগ্যি ভালো, বেটা পালিয়েছে।

ওয়াল্টার্স, তোমার রেকর্ড ভালো বলেই তোমার নামের পাশে উঁাড়া দিলাম না। অন্য কেউ হলে ছাড়তাম না। লজ্জা করে না তোমার পিশাচ বলে ভয় পেয়ে একজনকে ধরতে না-পারার জন্যে ভাগ্য ভালো বলে আস্ফালন করছ। মিথ্যে ভয় পেয়েছ, না, সত্যিই কিছু দেখেছ?

তার ফয়সালা এখুনি হয়ে যাবে। পকেট-লণ্ঠন জ্বালিয়ে নিয়ে বললে হোমস। ঘাসের চাপড়ার ওপর জুতোর ছাপ দেখে বলল, বারো নম্বর জুতো দেখছি। দানব বললেই চলে লোকটাকে।

কিন্তু সে গেল কোথায়?

ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে রাস্তায় সটকান দিয়েছে মনে হচ্ছে।

বেনেজ বললে, চুলোয় যাক সে, কাজের কথায় আসুন। মি. হোমস, বাড়ি দেখবেন চলুন।

শোবার ঘর, বসবার ঘরে তন্নতন্ন করে সার্চ করা হয়েছে দেখলাম। এ-বাড়িতে যারা ছিল, সঙ্গে তারা খুব বেশি মালপত্র আনেনি। মার্ক্স অ্যান্ড কোং, হাই হলবর্ন মার্কামারা কতকগুলো জামাকাপড় দেখে টেলিগ্রাম করা হয়েছিল মার্ক্স অ্যান্ড কোং-কে। তারা বলেছে, খদ্দেরের হাঁড়ির খবর তারা রাখে না, তবে টাকাকড়ি পেতে বেগ পেতে হয়নি মোটেই। খানদুয়েক স্প্যানিশ বই, নভেল, কয়েকটা তামাক খাওয়ার পাইপ, একটা সেকেলে পিনফায়ার পিস্তল আর একটা গিটার–এইসব ফেলে পালিয়েছে বাড়ির লোকজন।

এর মধ্যে কিছু নেই মি. হোমস। মোমবাতি হাতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যেতে যেতে বললে বেনেজ, চলুন, এবার রান্নাঘরে যাওয়া যাক।

রান্নাঘরটা বাড়ির একদম পেছন দিকে। কড়িকাঠ খুব উঁচু। বিমর্ষ চেহারা। এককোণে একরাশ খড়, পাঁচক মশাইয়ের শোবার জায়গা বোধ হয়। টেবিলে এঁটো বাসনের কাড়ি।

বেনেজ বললে, এদিকে দেখুন, মি. হোমস।... কী বুঝছেন?

মোমবাতি তুলে ধরে বাসনের আলমারির পেছনে একটা অত্যন্ত বিচিত্র বস্তু দেখাল বেনেজ। বস্তুটা শুকিয়ে কুঁচকে এমনভাবে গুটিয়ে গেছে যে আসলে কী তা বোঝা মুশকিল। কালচে চামড়ার মতো, অনেকটা বামন চেহারার কোনো মানুষের মতো। প্রথমে মনে হল, নিগ্রো শিশুকে মমি করে রাখা হয়েছে। তারপর মনে হল, পুরাকালের বিকৃত কোনো বাঁদর হলেও হতে পারে। শেষকালে হাল ছেড়ে দিলাম–জানোয়ার, না মানুষ, ধরতে পারলাম না। জিনিসটা দাঁড়িয়ে আছে খাড়াভাবে এবং শাঁখের একজোড়া মালা ঝুলছে কোমরের কাছে।

পৈশাচিক সেই প্রতীকের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করে হোমস বললে, ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখছি! আর কিছু আছে?

বাসন ধোয়ার চৌবাচ্চার কাছে মোমবাতি হাতে গেল বেনেজ। দেখলাম, একটা বিরাট সাদা পাখিকে নৃশংসভাবে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে রাশি রাশি পালক ছড়িয়ে আছে, ছিন্ন মস্তকে লেগে আছে ঝুঁটি। ঝুঁটি দেখে হোমস বললে, সাদা মোরগ। খুবই ইন্টারেস্টিং, খুবই অদ্ভুত ব্যাপার।

কিন্তু এর চাইতে নারকীয় বস্তুগুলো সবশেষে দেখানোর জন্যে এতক্ষণ চুপ করে ছিল বেনেজ। এবার চৌবাচ্চার তলা থেকে টেনে বার করল এক গামলা রক্ত। মাংস কাটার টেবিল থেকে আর একটা বারকোশ এনে দেখাল স্তূপাকার একরাশ পোড়া হাড়। বলল, কাউকে খুন করে পোড়ানো হয়েছিল, এ-ই সন্দেহ করে সমস্ত বাড়ি আমরা সার্চ করেছি। সকাল বেলা ডাক্তার এসে বলে গেলেন, হাড় আর রক্ত মানুষের নয়।

খুশি হল হোমস। দু-হাত ঘষে বললে, ইনস্পেকটর, অভিনন্দন রইল খুঁটিয়ে তদন্ত করার জন্যে। আপনার ক্ষমতার উপর্যুক্ত সুযোগ অবশ্য এ-অঞ্চলে কম, তাই না?

তা যা বলেছেন, মি. হোমস। পাড়াগাঁ তো, ভালো কেসের অভাবে উপোসে দিন কাটে। এ ধরনের সুযোগ নমাসে-ছমাসে এক-আধটা আসে। হাড় দেখে কী বুঝলেন?

হয় ছাগলছানা, নয় মেষশাবক।

সাদা মোরগ দেখে কী বুঝলেন?

অদ্ভুত, মি. বেনেজ, সত্যিই বড়ো অদ্ভুত। অদ্বিতীয়ও বলতে পারেন।

যা বলেছেন। অদ্ভুত কতকগুলো মানুষ ঘাঁটি গেড়েছিল এ-বাড়িতে। সৃষ্টিছাড়া তাদের চালচলন। তাদের একজন অক্কা পেয়েছে। কে মারল তাকে? সঙ্গীরা? তা-ই যদি হয়, তা

পালিয়ে তারা পার পাবে না। সবকটা বন্দরে পুলিশ নজর রেখেছে। তবে কী জানেন মি. হোমস আমার নিজের মত একদম অন্য। একেবারে আলাদা।

তার মানে, মনে মনে একটা থিয়োরি খাড়া করেছেন?

তা করেছি। কাজও করব সেই থিয়োরি অনুসারে। একাই করব, আপনার সাহায্য নেব না। লোকে জানবে যা করেছি, নিজেই করেছি, আপনার সাহায্য নিইনি।

অট্টহাসি হাসল হোমস। বললে, বেশ তো, তা-ই হবেখন। আপনি আপনার লাইনে চলুন, আমি চলি আমার লাইনে, তবে দরকার হলেই আমার তদন্ত-ফল গ্রহণ করতে পারেন। আপাতত এ-বাড়িতে আর কিছু দেখার আছে বলে মনে হয় না। বিদায়। কপাল খুলে যাক আপনার।

অন্যের চোখ এড়িয়ে যেতে পারে, আমি কিন্তু হোমসের চোখে-মুখে এমন কতকগুলো চাপা লক্ষণ দেখলাম, যা থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ডালকুত্তার মতো গন্ধ পেয়েছে আমার শিকারি বন্ধুটি। অন্যের চোখে তা অদৃশ্য, কিন্তু আমি তো ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ওর চাপা উত্তেজনা, চালচলনের ক্ষিপ্রতা আর ঔজ্জ্বল্য দেখেই বুঝলাম, খেল শুরু হতে আর দেরি নেই। অভ্যেস মতো মুখে চাবি দিল হোমস। আমার অভ্যেসমতো আমিও চুপ করে গেলাম, অযথা প্রশ্ন করে সমস্যা-আবিষ্ট মস্তিষ্ককে উৎপীড়িত করলাম না। জানি তো, যথাসময়ে সবই জানব।

সেই কারণেই নীরবে অপেক্ষা করে গেলাম। কিন্তু সে-অপেক্ষা যে এত লম্বা হবে, কে জানত। দিন এল দিন গেল, হোমস এক পা-ও আর এগিয়েছে বলে মনে হল না। একদিন শুধু শহরে কাটিয়ে এল। কথাচ্ছলে শুনলাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়েছিল। এ ছাড়া বাকি দিন হয় স্রেফ বেড়িয়ে, হয় গ্রামের লোকজনের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে কাটিয়ে দিল।

গ্রামে থাকা যে কত ভালো, এ নিয়ে জ্ঞান দিত আমাকে। উদ্ভিদবিজ্ঞানের বই, টিনের বাক্স আর খন্তা হাতে গাছপালার নমুনা সংগ্রহ করার এই হল মোক্ষম সুযোগ–বলে রোজ সরঞ্জাম নিয়ে বেরোত বটে, কিন্তু সন্ধে নাগাদ যেসব নমুনা নিয়ে ফিরত, তা দেখলে কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানীরই উৎসাহ বোধ করার কথা নয়।

পল্লি-ভ্রমণে বেরিয়ে প্রায়ই দেখা হত ইনস্পেকটর বেনেজের সঙ্গে। হাতের কেস নিয়ে কোনো কথা না-ভাঙলেও হাসিতে কেঁচকানো লালচে মুখ আর কুতকুতে চোখের ঝিকমিকে রোশনাই লক্ষ করে বুঝতাম, তার তদন্ত বিলক্ষণ সন্তোষজনক।

দিন পাঁচেক পরে একদিন সকাল বেলা খবরের কাগজ খুলে দারুণ অবাক হয়ে গেলাম। বড়ো বড়ো হরফে ছাপা হয়েছে এই খবরটা :

অক্সশট রহস্য সমাধান

সন্দেহভাজন গুপ্তঘাতক গ্রেপ্তার

শিরোনাম পড়ে শোনাতেই চেয়ার থেকে এমনভাবে ছিটকে গেল হোমস, যেন বিছে কামড়েছে।

কী সর্বনাশ! হল কী! বেনেজ ধরে ফেলেছে খুনিকে।

তা-ই তো মনে হচ্ছে। বলে পড়ে শোনালাম পুরো খবরটা :

অক্সশট হত্যা সম্পর্কে একজনকে গ্রেপ্তার করার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে এশার এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। স্মরণ থাকতে পারে, কিছুদিন আগে অক্সশট কমনে নৃশংসভাবে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায় উইসটেরিয়া লজ নিবাসী মি. গারসিয়াকে। সেই রাতেই তার চাকর এবং পাঁচক চম্পট দেওয়ায় সন্দেহ করা হয়, খুনের ব্যাপারে তারাও জড়িত এবং দুজনের কেউই ধোয়া তুলসী পাতাটি নয়। অনুমান করা হয়েছিল, নিহত ব্যক্তির বাড়িতে নিশ্চয়ই দামি জিনিস ছিল, তাকে খুন করা হয়েছে এই জিনিসের লোভেই। এই অনুমানের কোনো প্রমাণ অবশ্য আজও পাওয়া যায়নি। পলাতকদের গোপন বিবর অন্বেষণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিলেন ইনস্পেকটর বেনেজ। তারা যে পালিয়ে বেশিদূর যায়নি এবং আগে থেকেই ঠিক করে রাখা কোনো ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে–ইনস্পেকটর বেনেজ তা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করতেন। গোড়া থেকেই তিনি জানতেন, পলাতকরা ধরা পড়বেই। কেননা রান্না করার লোকটিকে জনাকয়েক ফেরিওয়ালা রান্নাঘরের শার্সি দিয়ে দেখে বলেছে লোকটাকে দেখতে নাকি অতি কদাকার, বিরাটকায় নিগ্রো-জাতীয় চেহারা। জাতে মুলাটো, অসাধারণ তার হলদেটে আকৃতি। লোকটার স্পর্ধা কম নয়। খুন করার পরেও একদিন রাত্রে এসেছিল

উইসটেরিয়া লজে। কনস্টেবল ওয়াল্টার্স তার পিছু নেয়। ইনস্পেকটর বেনেজ আঁচ করেছিলেন, লোকটা একবার যখন এসেছে, তখন আবার ফিরে আসবেই। তাই বাড়ি থেকে পাহারা তুলে নিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লোক মোতায়েন করেন। এই ফাঁদেই পড়ে লোকটা গতরাতে। দারুণ কামড়ে দেয় কনস্টেবল ডাউনিংকে। আশা করা যাচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে কয়েদিকে হাজির করার পর অনেক ঘটনাই ফাঁস হয়ে যাবে।

টুপি নিতে নিতে উত্তেজিতভাবে হোমস বললে, চলো চলো, এখুনি চলো। বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই বেনেজকে ধরতে চাই।

ছুটতে ছুটতে এলাম গাঁয়ের পথে। বেনেজ তখন সবে বেরিয়েছে বাড়ির বাইরে। আমাদের দেখেই হাতের খবরের কাগজটা নাড়তে নাড়তে বললে, কাগজ পড়েছেন মি. হোমস?

পড়েছি, বেনেজ। বন্ধুভাবে হুঁশিয়ার করতে এলাম, যদি কিছু মনে না করেন।

হুঁশিয়ার করবেন! আমাকে?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি বেলাইনে চলেছেন। আর এগোবেন না, গাড্ডায় পড়বেন।

আপনার অশেষ দয়া, মি. হোমস।

আপনার ভালোর জন্যেই বলছি, বেনেজ।

কেন জানি মনে হল, কথাটা শুনে বেনেজের কুতকুতে চোখে চাপা দুষ্টুমি ঝলকে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, কিন্তু মি. হোমস, আমরা যে ঠিক করেছি, যে যার লাইন অনুসারে তদন্ত চালিয়ে যাব।

তাহলে তাই হোক। আমাকে দোষ দেবেন না।

না, না, সে কী কথা! আপনি তো আমার মঙ্গলই চান। তবে কী জানেন, প্রত্যেকের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি আছে। আপনার পদ্ধতির সঙ্গে আমার পদ্ধতি মিলবে কেন?

এ নিয়ে আর কথা না-বলাই ভালো।

আমার সব খবরই আপনি পাবেন, মি. হোমস। লোকটা একটা আস্ত বর্বর। গায়ে গাড়িটানা ঘোড়ার মতন শক্তি, হিংস্রতায় পিশাচকেও হার মানায়। কবজায় আনার আগেই ডাউনিংয়ের বুড়ো আঙুলটা চিবিয়ে প্রায় ছিঁড়ে এনেছে বললেই চলে। মুখে ইংরেজি বুলি একদম ফোটে না, ঘোঁতঘোঁত করা ছাড়া কোনো আওয়াজই করে না।

প্রমাণ পেয়েছেন, এই লোকই খুন করেছে তার মনিবকে?

আমি তা বলিনি মি. হোমস, মোটেই তা বলিনি। আপনি চলবেন আপনার লাইনে আমি চলব আমার লাইনে, এ-ই হল গিয়ে আমাদের কাজের চুক্তি।

দু-কাঁধ কঁকিয়ে চলে এল হোমস। আমাকে বললে, বেনেজকে ঠিক ধরতে পারছি না। লোকটা জেনেশুনে গাড্ডায় পড়তে চলেছে। ঠিক আছে, ও যখন চায় যে যার লাইনে তদন্ত চালাই, তা-ই হোক। কিন্তু বেনেজের কথাবার্তা যেন কেমনতরো... খটকা লাগছে।

সরাইতে ফিরে এলাম। হোমস বললে, ওয়াটসন, বোসসা। পরিস্থিতিটা এবার তোমার সামনে মেলে ধরতে চাই। কারণ আজ রাতে তোমার সাহায্য আমার দরকার হবে। কেসটা ধাপে ধাপে কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে, কান খাড়া করে শোনো। মাঝখান থেকে এই লোকটাকে গ্রেপ্তার করায় সব গুবলেট না হয়ে যায়! ডিনারের সময়ে টেবিলে যে চিরকুট এসে পৌঁছেছিল, শুরু করা যাক সেখান থেকে। সেই রাতেই মারা যায় গারসিয়া। গারসিয়ার চাকরবাকর খুন করেছে মনিবকে–বেনেজের এই ধারণা মন থেকে সরিয়ে রাখো। প্রমাণ একটাই : গারসিয়া নিজে স্কট ইক্লিসকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল অ্যালিবি খাড়া করার জন্যে। অ্যালিবির জন্যে যখন এত কাণ্ড সে করেছে, বুঝতে হবে বেআইনি কাজে বেরিয়েছিল গারসিয়া, তাই এত আটঘাট বেঁধেছিল। তার এই ক্রিমিনাল অভিযানের ফল হল নিজেই খুন হয়ে যাওয়া। কে তাকে খুন করতে পারে? নিশ্চয়ই সে, যার বিরুদ্ধে ক্রিমিনাল অভিযানে সে বেরিয়েছিল। চাকরবাকরের অন্তর্ধান-রহস্য এবার বোঝা যাচ্ছে। ওরা দুজনেই গারসিয়ার নৈশ ষড়যন্ত্রের সাগরেদ। ঠিক হয়েছিল, গারসিয়া একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাম ফতে করে ফিরে এলে ইংরেজ ভদ্রলোকের এজাহার অনুযায়ী গারসিয়ার অ্যালিবি প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং কেউ আর তাকে সন্দেহ করতে

পারবে না। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সে না ফেরে, তাহলে বুঝতে হবে বিপজ্জনক অভিযানে সে নিজে খতম হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আগে থেকে ঠিক করে রাখা কোনো জায়গায় গিয়ে এই দুজনে লুকিয়ে থাকবে এবং সময় আর সুযোগমতো গারসিয়ার অসমাপ্ত অভিযান সমাপ্ত করতে নিজেরাই আবার বেরোবে।

দুর্বোধ্য জট একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে এল আমার মনের মধ্যে। প্রতিবারের মতো এবারেও। মনে হল, ভারি সোজা তো! ঠিক এইরকমটাই তো হওয়া উচিত ছিল! বললাম, কিন্তু রান্না করার লোকটা ফিরে এল কেন?

হয়তো তাড়াহুড়ো করে চম্পট দেওয়ার সময়ে এমন একটা দামি জিনিস ফেলে গিয়েছিল, প্রাণ গেলেও যা কাছছাড়া করতে সে রাজি নয়।

তারপর?

খেতে বসে একটা চিরকুট পেল গারসিয়া। কে লিখল চিরকুট? নিশ্চয়ই তার আর একজন স্যাঙাত। কোত্থেকে লিখল? আগেই বলেছি তোমাকে, একটা বড়ো বাড়ির নিশানা দেওয়া হয়েছিল চিঠির মধ্যে। এ-অঞ্চলে বড়ো বাড়ি খুব বেশি নেই। উদ্ভিদের নমুনা সংগ্রহ করার অছিলায় কয়েকটা দিন তল্লাট চষে ফেললাম, বড়ো বড়ো বাড়িগুলোর নাড়িনক্ষত্র বার করে ফেললাম, বাসিন্দাদের খবর সংগ্রহ করলাম। হাইগেবল-এর সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন জ্যাকারিয়ান প্রাসাদটাই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সবচেয়ে বেশি। বাড়িটা অক্সশট থেকে মাইলখানেক দূরে, অকুস্থল থেকে আধ মাইলের

মধ্যে। অন্যান্য প্রাসাদের মালিকরা কাঠখোট্টা ধরনের মান্যগণ্য ব্যক্তি, রোমান্সের ধার ধারেন না। কিন্তু হাইগেবলের মি. হেলডারসন সব দিক দিয়ে বড়ো বিচিত্র পুরুষ, বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার তাকেই মানায়। তাই তাঁর বাড়ির এবং বাড়ির লোকজনের ওপর আমার দৃষ্টি সংহত করলাম!

—ওয়াটসন, বাড়ির সব লোকই যেন কেমনতরো। আশ্চর্য, সৃষ্টিছাড়া। সবচাইতে আশ্চর্য হলেন, হেনডারসন স্বয়ং। অছিলা করে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেছি আমি। ভদ্রলোকের কালো কোটরে-ঢোকানো ভাবালু চোখ দেখে বুঝেছি, আমার আসল মতলব তিনি ধরে ফেলেছেন। বছর পঞ্চাশ বয়স ভদ্রলোকের, চটপটে, শক্তসমর্থ চেহারা। চুল লৌহ-ধূসর, জটার মতো বিশাল ভুরু, পা ফেলেন হরিণের মতো, হাঁটেন সম্রাটের মতো। কর্তৃত্ব তার চলনেবলনে। মুখের পরতে পরতে ভীষণ প্রকৃতি আর ইচ্ছাশক্তি যেন ঠিকরে যায় স্ফুলিঙ্গের মতো। ভদ্রলোক হয় বিদেশি, না হয় দীর্ঘকাল গরমের দেশে থেকেছেন। সেই কারণেই চেহারা অত হলদে, শুকনো কিন্তু চাবুকের মতো শক্ত। সেক্রেটারির নাম মি. লুকাস। ইনি যে বিদেশি তাতে সন্দেহ নেই। কথাবার্তা মিষ্টি বিষের মতো মধুক্ষরা, চালচলন বেড়ালের মতো চটপটে পিচ্ছিল, গায়ের রং চকলেটের মতো বাদামি। ওয়াটসন, তাহলেই দেখ, এ-রহস্যের দু-দিকে দু-দল বিদেশিকে দেখছি। একদল উইসটেরিয়া লজে, আর একদল হাইগেবলে। মাঝের ফাঁক বন্ধ হতে বিশেষ দেরি নেই আর।

একটু থেমে হোমস ফের বলতে থাকে, বাড়ির মধ্যে এই দুই ব্যক্তিই কেন্দ্রমণি বলতে পার। কিন্তু এ দুজন ছাড়াও একজন আছে, এই মুহূর্তে যার গুরুত্ব আমাদের কাছে

অনেক বেশি। হেনডারসন দুই মেয়ের বাবা। একজনের বয়স এগারো, আর একজনের তেরো। গভর্নেসের নাম মিস বার্নেট। জাতে ইংরেজ, বয়স বছর চল্লিশ। এ ছাড়াও একজন বিশ্বস্ত চাকর আছে। বাড়ির মধ্যে আসল ফ্যামিলি বলতে এদেরকেই বোঝায়, কেননা হেনডারসন দেশ বেড়াতে খুব ভালোবাসেন। কখনো এক জায়গায় বেশিদিন থাকেন না এবং এই চারজনে একসঙ্গে টোটো করেন দেশ হতে দেশান্তরে। বছরখানেক বাইরে কাটিয়ে কয়েক হপ্তা হল হেনডারসন হাইগেবল ফিরেছেন। ভদ্রলোক সাংঘাতিক বড়োলোক, যেকোনো খেয়াল চরিতার্থ করার মতো টাকা তাঁর আছে। এ ছাড়া বাড়িতে আছে খাসচাকর, ঝি, দারোয়ান ইত্যাদি, যেকোনো সচ্ছল ইংরেজ পরিবারে যা থাকে। গাঁয়ের লোকের গুলতানি শুনে আর নিজের চোখে দেখে সংগ্রহ করলাম এত খবর। সবচেয়ে বেশি খবর পাওয়া যায় চাকরিতে বরখাস্ত ক্ষুব্ধ চাকরের মুখে। আমার কপাল ভালো, এমনি একটা চাকরের সন্ধান পেলাম। কপাল ভালো বললাম বটে, কিন্তু ঠিক এই ধরনের লোক খুঁজেছিলাম বলেই পেয়ে গেলাম। নইলে বরাত খুলত না কোনোদিনই। বেনেজ তো বড়াই করে গেল, ওর কাজের পদ্ধতি আলাদা। আমারও কাজের পদ্ধতি কারো সঙ্গে মেলে না। বিশেষ এই পদ্ধতি অনুসারেই খুঁজে-পেতে বার করলাম জন ওয়ার্নারকে–এককালে হাইগেবলে মালী ছিল। বাদশাহি মেজাজে রাগের মাথায় দুর দুর করে তাড়িয়ে দেন। হেনডারসন। ওয়ার্নার সেই থেকে মহাখাপ্পা হেনডারসনের ওপর। বাড়ির অন্যান্য চাকরবাকরের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। মেজাজি মনিবের ভয়ে তারা সকলেই একজোট হয়েছে। ওয়াটসন, এইভাবে হাইগেবল রহস্যের চাবিকাঠির সন্ধান আমি পেলাম।

হোমস থামল। আমি কিছু বলতে যাবার আগেই বলে উঠল, ঘাবড়িয়ো না বন্ধু একে একে বলছি সব। বুঝলে ভায়া, অদ্ভুত লোক বটে এরা! স্পষ্ট কিছুই এখনও বুঝে উঠিনি, শুধু বুঝেছি, এদের চালচলন সবই যেন সৃষ্টিছাড়া। বাড়িটায় দুটো অংশ। এক অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়ার দরজা একটাই। একদিকে থাকে চাকরবাকর, আর একদিকে ফ্যামিলি। হেনডারসনের বিশ্বস্ত চাকর ছাড়া দুই অংশের মধ্যে যাতায়াত কেউ করে না। ফ্যামিলির খাবার সে-ই নিয়ে যায় অন্দরে। মেয়েদের নিয়ে গভর্নেস বাগান ছাড়া কোথাও বেরোয় না। হেনডারসন কখনো একা হাঁটেন না। ছায়ার মতো পেছনে লেগে থাকে কুটিল সেক্রেটারিটা, চাকরবাকরেরা বলে, হেনডারসন নাকি অষ্টপ্রহর ভয়ে জুজু হয়ে থাকেন। কীসের এত আতঙ্ক, তা কেউ জানে না। তবে ওয়ার্নারের বিশ্বাস, খোদ শয়তানের কাছে নিজের আত্মা বিকিয়ে দিয়েছেন পাজির পাঝাড়া এই হেনডারসন। যেকোনো দিন কেনা জিনিসের দখল নিতে আসতে পারে শয়তান, এই ভয়ে নাক সিটিয়ে থাকেন হেনডারসন। ভদ্রলোক কোন চুলো থেকে এসেছে, আদত পরিচয় কী, কেউ জানে না। মেজাজ এদের প্রত্যেকেরই সপ্তমে চড়ে আছে, অত্যন্ত গনগনে স্বভাব। হেনডারসন নিজে দু-একবার কুকুর মারা চাবুক দিয়ে চাকরবাকরদের এমন ঠেঙিয়েছিলেন যে ব্যাপারটা নির্ঘাত আদালত পর্যন্ত গড়াত। কিন্তু স্রেফ টাকার জোরে ক্ষতিপূরণ দিয়ে সবার মুখ চেপে দেন ভদ্রলোক। ওয়াটসন, এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। চিঠিটা এসেছে অদ্ভুত এই গেরস্থালি থেকে, গারসিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে চক্রান্ত মাফিক কিছু একটা করার জন্যে। লিখেছে কে? নিশ্চয় মিস বার্নেট-গভর্নেস। যুক্তিতর্ক করে দেখা যাচ্ছে, সে ছাড়া এ-চিঠি লেখার মতো মেয়ে বাড়িতে আর কেউ নেই। অনুমান হিসেবে এই ধারণা নিয়ে তদন্তে নামা যাক, দেখা যাক। ঘটনার স্রোতে কতক্ষণ তা খাড়া থাকে। ভালো কথা ওয়াটসন, গোড়ায়

তোমায় যে বলেছিলাম, এ-কাহিনিতে ঈর্ষার ব্যাপার আছে, সেটা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি।না, সে-রকম কিছু এখানে নেই। যাক, যে-কথা বলছিলাম। মিস বানেট যদি চিঠি লিখে ডেকে এনে থাকে গারসিয়াকে, তাহলে বুঝতে হবে, চক্রান্তের অন্যতম চক্রী সে নিজেও। তা-ই যদি হয়, গারসিয়ার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার। পর বুকে প্রতিহিংসার জ্বালা নিয়ে নিশ্চয়ই সে সুযোগ পায়ে ঠেলবে না। তাই আমার প্রথম প্রচেষ্টাই হল মিস বার্নেটের সঙ্গে দেখা করা এবং কথা বলা। কিন্তু মিস বার্নেট যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে গারসিয়া নিধনের রাত থেকেই। বেঁচে আছে কি না, তাও বোঝা যাচ্ছে না। গারসিয়ার সঙ্গে হয়তো তাকেও যমালয়ে পাঠানো হয়েছে, অথবা কোথাও কয়েদ করে রাখা হয়েছে। কিছু কখনো জানা যায়নি। ওয়াটসন, আশ্চর্য এই ধাঁধার সমাধান আমাদের করতেই হবে। কোর্ট থেকে ওয়ারেন্ট বার করে মিস বানেটকে খুঁজতে যাওয়া মূর্খতা। ম্যাজিস্ট্রেট বিশ্বাস করবেন না জলজ্যান্ত একটা মহিলাকে স্রেফ গায়েব করে দেওয়া হয়েছে এমন একটা খানদানি বাড়িতে, যে-বাড়িতে একটানা কিছুদিন কাউকে দেখতে না-পাওয়াটা অদ্ভুত হলেও অসম্ভব কিছু নয়। অথচ দেখ, সৃষ্টিছাড়া এই বাড়িতে এই মুহূর্তে হয়তো ভদ্রমহিলা ধুকছে, প্রাণটা তার যেতে বসেছে। তাই ওয়ার্নারকে নিয়ে আড়াল থেকে ফটক পাহারা দেওয়া ছাড়া কিছুই আমি করতে পারিনি। আইনের সাহায্য নিয়ে যদি কিছু নাও করতে পারি, নিজেরাই ঝুঁকি নেব ঠিক করেছি।

কী করতে চাও?

ভদ্রমহিলার ঘর আমি চিনি। বারবাড়ির ছাদ থেকে যাওয়া যাবে। আমি চাই আজ রাতে তুমি আর আমি দুজনে হানা দেব রহস্যের ঠিক খাসমহলে।

শুনে মিইয়ে গেলাম। একে তো ওই অদ্ভুত বাড়ি, লোকজনের প্রকৃতি ভীষণ, খুনের ছায়া জড়িয়ে রয়েছে বাড়ির আনাচেকানাচে, অজানা বিপদ পদে পদে, তাতে করে রাতবিরেতে বেআইনিভাবে ওইরকম একখানা ভয়ংকর বাড়িতে চোরের মতো ঢুকতে হবে শুনে মনের মধ্যে খুব একটা উৎসাহ পেলাম না। তারপর বিচার করে দেখলাম, হোমসের চাচাছোলা যুক্তি অনুযায়ী রহস্য সমাধান করার একমাত্র উপায় কিন্তু ওইটাই বাড়ির মধ্যে চুপিসারে ঢুকে পড়া। নীরবে তাই জড়িয়ে ধরলাম ওর দুই হাত, ঠিক হয়ে গেল নিশীথ রাতের ভয়ানক অভিযান।

কিন্তু বিধি বাম, তাই এমন একটা অ্যাডভেঞ্চার মাঠে মারা গেল শেষ পর্যন্ত। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মার্চের বিষণ্ণ সন্ধে যখন একটু একটু করে ঘোমটা ঢাকা দিচ্ছে পৃথিবীর ওপর, ছন্নছাড়া একটা লোক ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে ঢুকল ঘরে।

পালিয়েছে, মি. হোমস! পাখি উড়েছে। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে নিয়ে যেতে পারেনি, রাস্তায় গাড়িতে বসিয়ে এসেছি।

শাব্বাশ, ওয়ার্নার!তড়াক করে লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস, ওয়াটসন, মাঝের ফাঁকটা দেখছি খুব তাড়াতাড়িই জুড়ে আসছে।

ভাড়াটে গাড়ির মধ্যে এলিয়ে থাকতে দেখলাম গরুড-নাসা শীর্ণকায়া এক ভদ্রমহিলাকে। স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত ধকল যাওয়ায় যেন আধমরা হয়ে গেছে। বুকের ওপর এলিয়ে

পড়েছে। মাথা। মাথা তুলে চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম, চোখের তারা ছোটো হয়ে এসেছে দুটি বিন্দুর মতো, যেন দুটো কালচে ফোঁটা। বুঝলাম, আফিঙে বেহুঁশ রয়েছে মিস বার্নেট।

বরখাস্ত মালী বললে, মি. হোমস, আপনার কথামতো নজর রেখেছিলাম ফটকের ওপর। গাড়িটা বেরিয়ে আসতেই পেছনে পেছনে গেলাম স্টেশন পর্যন্ত। মিস বার্নেট যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটছিলেন। সবাই মিলে ঠেলেঠুলে ট্রেনে তুলতে যাওয়ার সময়ে উনি সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ধস্তাধস্তি করতে লাগলেন। জোর করে ঠেলে কামরায় তুলে দিতেই উনি ছিটকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আমি ঠুঁটো জগন্নাথের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। ওঁকে নিয়ে এনে বসলাম। ছ্যাকড়াগাড়িতে আসবার সময়ে কামরায় হলদে শয়তানটাকে যেভাবে কটমট করে তাকাতে দেখেছি, তাতে বুঝেছি, এদিকে ফের যদি ও আসে, তো আমার পরমায়ু আর বেশিদিন নেই।

ধরাধরি করে ভদ্রমহিলাকে নিয়ে গেলাম ওপরতলায়। সোফায় শুইয়ে দিয়ে দু-কাপ কড়া কফি খাওয়াতেই আফিঙের রেশ কেটে গেল মগজ থেকে। খবর পাঠানো হল বেজেকে।

সব শুনে আনন্দে আটখানা হয়ে হোমসের হাত জড়িয়ে ধরে বেনেজ বললে, কী কাণ্ড দেখুন! আরে মশাই, আমিও তো এঁকে খুঁজেছিলাম। গোড়া থেকেই আপনি যে লাইনে চলেছেন, আমিও সেই লাইনে চলেছি।

তার মানে? আপনি হেনডারসনের ওপর নজর রেখেছিলেন?

মি. হোমস, গাছের মাথায় বসে আপনাকে দেখছি, হাইগেবলের ঝোঁপের মধ্যে কী চমৎকার হামাগুড়ি দিচ্ছেন! দেখছিলাম কে আগে আসল সাক্ষীকে হাতে পায়।

তাহলে মুলাটোকে গ্রেপ্তার করতে গেলেন কেন?

খুকখুক করে হেসে উঠে বেনেজ বললে, হেনডারসন একটা ছদ্মনাম। ও জানত আমরা ওকে সন্দেহ করছি। ওকে আমরা নিশ্চিন্ত করার জন্যেই জাল পেতে মুলাটোকে ধরেছিলাম। বিপদমুক্ত হয়েছে না-ভাবা পর্যন্ত ও তো পালাবে না মিস বানেটকে নিয়ে, তাই নিরীহ লোকটাকে ইচ্ছে করেই গ্রেপ্তার করে চোখে ধুলো দিয়েছিলাম প্রত্যেকের।

বেনেজের কাঁধে হাত রেখে হোমস বললে, জীবনে অনেক উঁচুতে আপনি উঠবেন। আপনার সহজাত বুদ্ধি আছে, দৃষ্টিশক্তি আছে।

আনন্দে ঝিকমিক করে ওঠে বেনেজ। বলে, এই সাতদিন স্টেশনে সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন রেখেছিলাম। হাইগেবলের ফ্যামিলি যে চুলোতেই যাক না কেন, আমার চর পেছন পেছন যাবে। তবে মিস বানেট ছিটকে দলছাড়া হওয়ায় মহাফপরে পড়েছিল বেচারা। যাই হোক, মিস বার্নেটের এজাহার না-নেওয়া পর্যন্ত শয়তানটাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব নয়। আসুন, আগে ওঁর বক্তব্য লিখে নিই।

গভর্নেসের চেহারাখানা একবার দেখে নিয়ে হোমস বললে, আগের চাইতে অনেক চাঙা হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা। বেনেজ, আরও বলুন হেনডারসন লোকটা আসলে কে।

ডন মুরিলো, সান পেদ্রোর টাইগার নামে যাকে সবাই চিনত।

সান পেদ্রোর টাইগার! বিদ্যুৎ ঝলকের মতো লোকটার সমস্ত ইতিহাস ঝলসে উঠল আমার স্মৃতির পটে। সান পেদ্রোর টাইগার! সভ্যতার মুখোশ পরে জঘন্য অত্যাচার আর রক্তাক্ত ইতিহাস রচনায় অদ্বিতীয় সেই ডন মুরিলো। অসীম তার মনোবল, নির্ভীক তার অন্তর, উদ্যম তার অপরিসীম, শক্তি তার অপরিমেয়। ভয়ে জুজু গোটা দেশকে একনাগাড়ে দশ-বারো বছর পায়ের তলায় রেখে দেওয়ার মতো গুণ তার মধ্যে ছিল। মধ্য আমেরিকায় তার নাম শুনলে আঁতকে উঠত না, এমন লোক কেউ নেই। দীর্ঘ একযুগ পরে জাগ্রত হল গণশক্তি। কিন্তু সাপের মতো পিচ্ছিল সে, শেয়ালের মতো ধূর্ত। জাগ্রত গণশক্তিকে কোনো সুযোগই সে দিল না। পট পালটাচ্ছে আঁচ করেই গুপ্ত ধনাগার অতি গোপনে জাহাজ বোঝাই করে পাচার করে দিল দেশের বাইরে। এ-ব্যাপারে সাহায্য করল অনুগত স্যাঙাতরা। পরের দিন মারমুখো জনতা হানা দিয়ে দেখল বাড়ি খালি পাখি উড়েছে, দুই মেয়ে আর সেক্রেটারিকে নিয়ে বলদর্পী একনায়ক১২ উধাও হয়ে গিয়েছে ধনরত্ন সমেত। সেই থেকেই ধরাতলে তার নাম আর শোনা যায়নি। ইউরোপের খবরের কাগজে অবশ্য প্রায়ই কটুকাটব্য শোনা গেছে তার সম্পর্কে।

বেনেজ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই সেই ডন মুরিলো, সান পেদ্রোর টাইগার। খোঁজ নিলে জানবেন, সান পেদ্রোর রং হল সবুজ আর সাদা, চিঠিতে যা লেখা ছিল। হেনডারসন ওর

ছদ্মনাম। আমি কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছি, প্যারিস, রোম, মাদ্রিদ, বার্সিলোনায় ১৮৮৬ সালে গিয়েছিল ওর জাহাজ। প্রতিহিংসার জন্যে ওখানকার লোকেও খুঁজছে ওকে। অবশেষে হদিশ পেয়েছিল এইখানে।

মিস বার্নেট উঠে বসে কান খাড়া করে শুনছিল কথাবার্তা। এখন বললে, এক বছর আগে ডন মুরিলোর সন্ধান পায় ওরা। একবার খতম করার চেষ্টাও হয়েছিল, কিন্তু যেন পৈশাচিক প্রেতাত্মারা আগলে রেখে দিয়েছে ওকে, কেশাগ্র স্পর্শ করা যায়নি। এবারেও দেখুন, ভালো মানুষের ছেলে দিলখোলা গারসিয়া খতম হয়ে গেল, কিন্তু আসল পিশাচ পার হয়ে গেল। কিন্তু সূর্য যেমন সত্যি, ডন মুরিলোকেও তেমনি একদিন খতম হতেই হবে। একজন গেছে, আবার একজন আসবে। সে না-পারলে আসবে আর একজন।

বলতে বলতে অত্যন্ত ঘৃণায় কুঁচকে গেল মিস বার্নেটের শীর্ণ মুখ, মুষ্টিবদ্ধ হল শিরা-বার-করা সরু হাত।

হোমস বললে, কিন্তু ইংরেজের মেয়ে হয়ে আপনি এই রক্তারক্তির ষড়যন্ত্রে ঢুকলেন কেন? পৃ

থিবীর কোনো আইন বা আদালতে এতবড়ো অন্যায়ের বিচার করা যাবে না বলে। বহু বছর আগে সান পেদ্রোতে রক্তনদী বয়ে গেছে, জাহাজ-বোঝাই ধনরত্ন নিয়ে পিশাচ ডন মুরিলো। পালিয়ে এসেছে। তাতে ইংলন্ডের আইনরক্ষকদের কী এসে যায়? আপনাদের কাছে এসব ঘটনা অন্য গ্রহের ঘটনার শামিল। কিন্তু হাহাকার আর রক্তপাতের মধ্যে

দিয়ে আমরা জেনেছি, নরকের শয়তান যদি কোথাও থাকে, তা এই ডন মুরিলো। প্রতিহিংসা-পাগল সর্বহারারা যতদিন প্রতিহিংসা নিতে না-পেরে হাহাকার করে ফিরবে, ততদিন শান্তি আসবে না এ-পৃথিবীতে।

ডন মুরিলো যে কী সাংঘাতিক লোক, আমি তা জানি মিস বার্নেট। কিন্তু আপনার গায়ে আঁচ লাগল কীভাবে?

সব বলব। শয়তান ডন মুরিলো নানা অছিলায় পর পর মানুষ খুন করত। যখনই বুঝত অমুকের মধ্যে প্রতিভা আছে, ক্ষমতা আছে, বেশি উঠতে দিলে তার নিজের বিপদ হতে পারে, তাকেই ছুতোনাতা করে ডেকে এনে শেষ করে দিত। আমার আসল নাম সিগনোরা১৪ ভিক্টর ভোরাভো। আমার স্বামী লন্ডনে সান পেদ্রো মিনিস্টার ছিলেন। অমন মহৎ মানুষ জীবনে আর দেখিনি। আমাকে উনি লন্ডনে দেখেন এবং বিয়ে করেন। ডন মুরিলো যখন শুনল ওঁর সুনাম, ডেকে পাঠাল বাড়িতে, তারপর কুকুরের মতো গুলি করে ফেলে দিল লাশ। আমার স্বামী বুদ্ধি করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাননি, আঁচ করতে পেরেছিলেন বোধ হয় জীবন্ত আর ফিরতে হবে না। ডন মুরিলো ওঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে। স্বামীহারা আমি রাস্তার ভিখিরি হয়ে হাহাকার করে বেড়াতে লাগলাম সেই থেকে। তারপরেই পতন ঘটল পিশাচ ডন মুরিলোর, পালিয়ে গেল ধনরত্ন আর মেয়েদের নিয়ে। কিন্তু একদিন যাদের বুকে ও আগুন জ্বালিয়েছে, যাদের জীবন ধ্বংস করেছে, তারা ওকে ছেড়ে দিল না। সংঘবদ্ধ হল, সমিতি স্থাপন করল, প্রতিজ্ঞা করল, ডন মুরিলোর রক্ত দিয়ে হোলি খেলা না পর্যন্ত সমিতি টিকে থাকবে। হেনডারসন ছদ্মনামে শয়তানটা এখানে আস্তানা নিয়েছে শুনে ভার পড়ল আমার ওপর গভর্নেসের

চাকরি নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে খবর চালান করার। পিশাচ ডন মুরিলো কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করেনি, প্রত্যেকদিন যার সঙ্গে মুখোমুখি বসে খাবার খেয়েছে, তারই স্বামীকে মাত্র এক ঘণ্টার নোটিশে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনন্তের পথিক করে ছেড়েছে। আমি শুধু মনে মনে হেসেছি, ওর সঙ্গেও হেসে হেসে কথা বলেছি, মেয়েদের ওপর যথাকর্তব্য করেছি এবং সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছি। প্যারিসে একটা সুযোগ পাওয়া গেল, কিন্তু ও বেঁচে গেল। আমরা সারাইউরোপে ঝড়ের মতো এদিক-ওদিক করে বেড়ালাম যাতে কেউ পিছু নিতে না-পারে। তারপর ফিরে এলাম এখানে। ইংলন্ডে এসেই এই বাড়িটা নিয়েছিল ডন মুরিলো।

একটু থেমে ফের বলতে শুরু করল মিস বার্নেট : কিন্তু এখানেও ওত পেতে ছিল বিচারকর্তারা। সান পেদ্রোর একজন উচ্চপদস্থ মান্যগণ্য ব্যক্তির ছেলে গারসিয়া দুজন একান্ত অনুগত অনুচরকে নিয়ে তৈরি হয়েছিল ওকে বধ করার জন্যে। এই দুজনের জীবনেও কিন্তু সর্বনাশের আগুন জ্বালিয়েছে ডন মুরিলো। তাই প্রতিহিংসার আগুন ধিকিধিকি জ্বলছিল তিনজনেরই বুকে। কিন্তু দিনের বেলায় ওরা সুবিধে করে উঠতে পারছিল না ডন মুরিলো কখনো একা বেরোয় না বলে, অতীতের দুষ্কর্মের সঙ্গী লুকাস বা লোপেজ সবসময়ে থাকত সঙ্গে। রাতে কিন্তু একা ঘুমোত, ওকে নিঃশেষ করার মোক্ষম সময় তখনই। ধড়িবাজ ডন মুরিলো কিন্তু পর পর দু-রাত এক ঘরে শুত না, রোজই ঘর পালটাত। একদিন রাতে শোয়ার ব্যবস্থা আমার বন্ধুদের জানিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। ঠিক করলাম, দরজা খুলে রাখব, অবস্থা অনুকূল থাকলে জানলায় সবুজ আর সাদা আলোর সংকেত দেখাব। সেই সংকেত দেখা না-গেলে গারসিয়া যেন না-আসে। কিন্তু গেল সব ভণ্ডুল হয়ে। কী কারণে জানি না, সেক্রেটারি লোপেজ সন্দেহ করেছিল

আমাকে। চিঠিটা সবে লেখা শেষ করেছি, এমন সময়ে পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর। তারপর শুরু হল অমানুষিক অত্যাচার। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু। ডন মুরিলো তখনই ছুরি বসাত আমার বুকে, কিন্তু দুজনে মিলে শলাপরামর্শ করে ঠিক করলে, গারসিয়াকে আগে খতম করা দরকার। ডন মুরিলো আমার হাত পেছনে নিয়ে গিয়ে এমন মোচড় দিলে যে নামটা না-বলে পারিনি। তখন অবশ্য জানতাম না, গারসিয়াকে খুন করার জন্যেই নাম জানতে চাইছে। জানলে কখনোই বলতাম না, হাত ভেঙে গেলেও বলতাম না। চিঠিখানা খামে ভরে ঠিকানা লিখল সেক্রেটারি সিলমোহর করল আস্তিনের কাফলিং দিয়ে। গারসিয়ার বাড়ি পাঠিয়ে দিল চাকর জোসির হাতে। লোপেজ আমার পাহারায় ছিল বলেই আমার বিশ্বাস, গারসিয়াকে নিজের হাতে খুন করেছে ডন মুরিলো। বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে খুন করেনি পাছে তদন্তের সময়ে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে যায় এই ভয়ে। কিন্তু ঝোঁপের মধ্যে গারসিয়ার মৃতদেহ পড়ে থাকলে পুলিশ কিছুই আঁচ করতে পারবে না, অথচ গারসিয়ার স্যাঙাতরা ভয় পেয়ে ডন মুরিলোর পিছু নেওয়া ছেড়ে দেবে। তারপর থেকে এই পাঁচদিন অকথ্য অত্যাচার চলেছে আমার ওপর. পেট ভরে খেতে দেওয়া হয়নি, পিঠে ছোরা দিয়ে খোঁচানো হয়েছে, দু-হাত দেখুন ক্ষতবিক্ষত করে ছেড়েছে, জানলা দিয়ে একবার চেঁচাতে গিয়েছিলাম বলে মুখের মধ্যে ন্যাকড়া ঠেসে দিয়েছে। আমার মনোবল ভেঙে দেওয়ার জন্যে যতরকম উপায় আছে, কোনোটাই বাকি রাখেনি। আজকে দুপুরে পেট ভরে হঠাৎ খেতে দেয়। খাবার পরেই বুঝলাম, আফিং মেশানো ছিল খাবারে। বেহুঁশ অবস্থায় মনে হল, যেন হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কোথাও। গাড়িতে ওঠানোর পর সম্বিৎ ফিরল। দেখলাম এই শেষ সুযোগ, নইলে ইহজীবনে আর মুক্তি পাব না। ধস্তাধস্তি করলাম, ঠিকরে বেরিয়ে এলাম! তখন এই লোকটি দয়া করে আমাকে টানতে টানতে ওদের খপ্পর থেকে নিয়ে গাড়িতে

চাপিয়ে এখানে এনে ফেললেন। ভগবান বাঁচিয়েছেন। ওদের ক্ষমতা নেই আর আমার ক্ষতি করার।

নীরবে শুনলাম অত্যাশ্চর্য এই কাহিনি। নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করল হোমস। মাথা নেড়ে বললে, ঝামেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। পুলিশের কাজ মিটল বটে, শুরু হল আইনের কাজ।

তা ঠিক। বললাম আমি, যত দুষ্কর্ম করে থাকুক না কেন ডন মুরিলো, এই দুষ্কর্মের সাজা তাকে পেতেই হবে। ভালো আইনজ্ঞের হাতে কেস পড়লে মামলা ঠিক সাজিয়ে ফেলবে। বোঝাবে, ডন মুরিলো যা কিছু করেছে, আত্মরক্ষার জন্যে করেছে।

প্রসন্নকণ্ঠে বেনেজ বললে, আরে রাখুন, আইন জিনিসটা আমিও ভালো বুঝি। আত্মরক্ষা এক জিনিস, আর ঠান্ডা মাথায় একজনকে ভুলিয়ে এনে খুন করা আর এক জিনিস, তা সে যত বিপজ্জনক লোকই হোক না কেন। হাইগেবলের ভাড়াটে ভদ্রলোককে কাঠগড়ায় না দাঁড় করানো পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই জানবেন।

কিন্তু আবার পুলিশ চরের চোখে ধুলো দিল মহাপাপিষ্ঠ জন মুরিলো। এডমন স্ট্রিটের একটা বাড়িতে ঢুকে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল কার্জন স্কোয়ারে। তারপর থেকে বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেল মুরিলো পরিবার, নাম পর্যন্ত আর শোনা গেল না ইংলন্ডে। ছ-মাস পরে মাদ্রিদের এসকুরিয়াল হোটেলে খুন হয়ে গেল মনটালভার মারকুইস আর তার সেক্রেটারি সিগনর রুলি। খুনিরা ধরা পড়ল না। লোকে বললে, নিহিলিস্টদের কুকর্ম। নিহতদের ছাপা। ছবি নিয়ে বেকার স্ট্রিটে এল ইনস্পেকটর বেনেজ। চুম্বকের মতো

কালো চোখ, কর্তৃত্বব্যঞ্জক আকৃতি আর ঝোঁপের মতো ভুরু দেখেই চেনা গেল ডন মুরিলোকে। সেক্রেটারির কালচে মুখ। দেখেও চিনতে অসুবিধে হল না মোটেই। বুঝলাম, দেরিতে হলেও এতদিনে শেষ হল গুপ্তবিচার সমিতির একমাত্র কাজ।

সন্ধের দিকে পাইপ খেতে খেতে হোমস বললে, ভায়া ওয়াটসন, কেসটা সত্যিই জবরজং টাইপের। দু-দিকে দুটো দেশ, দু-দেশে রহস্যজনক দুটো দল। মাঝে স্কট ইক্লিসের মতো নিরীহ ইংরেজ আর এই হুঁশিয়ার গারসিয়া। এখনও যদি কিছু বোঝার থাকে, তো বলল, বুঝিয়ে দিই।

মুলাটো পাঁচক ফিরে এল কেন?

রান্নাঘরে পাওয়া ওই অদ্ভুত মূর্তিটার জন্যে। লোকটা সত্যিই বর্বর, সান পেদ্রোর জঙ্গলের মানুষ। মূর্তিটাকে ও দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। তাড়াহুড়ো করে পালানোর সময়ে ওর সঙ্গী ওকে নিতে দেয়নি প্রাণপ্রিয় আরাধ্য দেবতাকে। তাই কুসংস্কারের তাগিদে ফিরে এসেছিল পরের দিন। জানলা দিয়ে ওয়াটসনকে দেখে পালিয়েছে। তিন দিন পরে আবার এসে ধরা পড়েছে। বেনেজ বুঝেছিল, সে আসবে, তাই আমি বোঝবার আগেই ফাঁদ পেতে তাকে ধরেছে শুধু ডন মুরিলোকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে। আর কিছু?

টুকরো টুকরো করে ছেড়া পাখি, গামলাভরতি রক্ত, বারকোশ-ভরতি পোড়া হাড়, রান্নাঘরে অদ্ভুত এই জিনিসগুলো গেল কেন?

মৃদু হেসে নোটবই খুলল হোমস। বলল, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে এ নিয়ে পড়াশুনা করেছি। নিগ্রোদের ধর্ম আর ডাকিনীবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্র, ঝাড়ফুঁক সম্বন্ধে একারম্যানের বই থেকে এই ক-টা লাইন লিখে এনেছি। শোনো : নোংরা দেবতাদের উপাসনা করার জন্যে ভুডু অর্থাৎ ডাকিনীবিদরা কিছু-না-কিছু বলি দেবেই। নরবলি পর্যন্ত দেওয়া হয়, তারপর মহামাংস নিয়ে ভোজোৎসব হয়। সবচেয়ে বেশি বলি হয় সাদা মোরগ জ্যান্ত ছিঁড়ে ফেলে। কালো ছাগল জবাই করে আগুনে পুড়িয়ে বলি দেওয়ার প্রথাও আছে এদের মধ্যে। তাহলেই দেখ, বর্বর পাঁচক অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজোআচ্চা করে গেছে রান্নাঘরে। আমাদের কাছে তা কিম্ভুতকিমাকার মনে হয়েছিল ঠিকই, এখন দেখলে তো, কিম্ভুতকিমাকার শব্দটার সঙ্গে ভয়ংকর শব্দটার তফাত খুব সামান্যই। আগেও তোমাকে এ নিয়ে বলেছি, তাই নয় কি?

————

টীকা

উইসটেরিয়া লজের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি : ১৯০৮-এর পনেরোই অগাস্ট তারিখের কোলিয়ার্স ম্যাগাজিনে এই গল্পটি প্রকাশিত হয় দ্য সিঙ্গুলার এক্সপিরিয়েন্স অব মি. জে. স্কট একেলস নামে। আবার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর ১৯০৮ দুটি সংখ্যায় দুটি কিস্তিতে প্রকাশিত এই গল্পের নাম দেওয়া হয়েছিল দ্য রেমিনিসেন্স অব মি. শার্লক হোমস। প্রথম কিস্তির শিরোনাম ছিল দ্য সিঙ্গুলার এক্সপিরিয়েন্স অব মি. জে. স্কট

একেলস এবং দ্বিতীয় কিস্তির শিরোনাম দ্য টাইগার অব সান পেদো। পরে, গ্রন্থাকারে সংকলনকালে গল্পটির নামকরণ করা হয় দি অ্যাডভেঞ্চার অব উইসটেরিয়া লজ।

১৮৯২ সালের মার্চ মাস : তারিখটি সর্বৈব ভুল। কারণ ১৮৯১-এর এপ্রিল থেকে ১৮৯৪-এর এপ্রিল পর্যন্ত হোমস ছিলেন নিরুদ্দেশ। দ্য রিটার্ন অব শার্লক হোমস গ্রন্থের প্রথম গল্প দ্রষ্টব্য।

পোস্ট অফিস, শেরিং ক্রস : হোমসের সমকালে মর্লেজ হোটেলের একতলায় অবস্থিত শেরিং ক্রস পোস্ট অফিস ইংলন্ডের একটি প্রাচীনতম পোস্ট অফিস। এটি সেই সময়ে রাতদিন খোলা থাকত।

পুরুষ না মহিলা : কেউ ভাবতে পারেন স্কট পুরুষের নাম। আবার পদবিও হয়। এক্ষেত্রে নাম স্কট, পদবি একেলস (বা ইক্লিস)। কিন্তু ইংরেজ ওয়াটসন বুঝেছিলেন নামের আদ্যক্ষর জে পদবি স্কট একেলস, যেমন রায়চৌধুরি বা বসু মল্লিক বা ঘঘাষ দস্তিদার হয়ে থাকেন, সেইরকম।

কর্নেল ক্যারুথার্স : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সলিটারি সাইক্লিস্ট গল্পে শার্লক হোমস খাঁচায় পুরেছিলেন বব কারুথার্সকে। তবে সে কর্নেল নয়।

ইনস্পেকটর গ্রেগসন : এই গল্পে ছাড়া গ্রেগসনকে আর দেখা যায় আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে এবং দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার গল্পে।

রাত একটা বাজে : অতিথির ঘুম ভাঙিয়ে গারসিয়া যখন সময় জানাল, তখন স্কট-একেলস নিজের ঘড়ি দেখলে কিন্তু গারসিয়ার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেত।

রেসের কথা মনে করিয়ে দেয় : রেসের ঘোড়সওয়ার বা জকিদের পোশাকের রঙের কথা মাথায় রেখে সম্ভবতএই উক্তি করা হয়েছে।

মুলাটো : যার বাবা এবং মায়ের মধ্যে একজন নিগ্রো এবং অপরজন শ্বেতাঙ্গ, তাদের মুলাটো (Mulato) বলা হয়। মুলাটো এবং শ্বেতাঙ্গর সন্তানকে বলা হয় কোয়াড্রন (Quadroon) এবং কোয়াড্রন এবং শ্বেতাঙ্গর সন্তান অক্টোরুন (Octoroon) নামে পরিচিত।

ডন : সমাজের উঁচুস্তরের মানুষদের নামের আগে ব্যবহৃত স্প্যানিশ অভিধা।

মধ্য আমেরিকায় : অধিকাংশ গবেষকের মতে সান পেড্রো হল ব্রাজিল এবং ডন মুরিলো ব্রাজিলের শেষ সম্রাট দ্বিতীয় পেড্রো বা ডম পেড্রো দে আলকান্তারা। রাজত্বকাল ১৮৩১ থেকে ১৮৮৯। ১৮৮৯-এ এক সামরিক অভ্যুত্থানে গদিচ্যুত হয়ে ইউরোপে পালিয়ে আসেন।

বলদর্পী একনায়ক : ব্রাজিলের সম্রাট দ্বিতীয় পেড্রো কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের যথেষ্টই প্রিয় ছিলেন।

প্যারিস, নোম, মাদ্রিদ, বার্সিলোনা : ফ্রান্সে রাজধানী প্যারিস বা পারী, ইতালির রাজধানী রোম, স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ এবং স্পেনের বড়ো শহর বার্সিলোনা, কোনোটাই বন্দর নগরী নয়, যেখানে জাহাজ যেতে পারে।

সিগনোরা : সিগনোরা ব্যবহৃত হয় ইতালীয় মহিলাদের নামের প্রারম্ভে; স্পেনীয় মহিলাদের নামের আগে বলা হয় সেনোরা।

মারকুইস : একজন মারকুইস সম্মানে ডিউকের থেকে নীচুতে এবং আর্ল-এর ওপরে।

সিগনর রুলি : এক্ষেত্রে, স্পেনীয় রুলির নামের আগে সিগনর নয়, সেনর থাকবার কথা। আবার, রুলি নামের কোনো স্পেনীয় পদবি দেখা যায় না বলে জানিয়েছেন কয়েকজন গবেষক।

নিহিলিস্ট : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য গোল্ডেন প্যাসনে গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যান]

১৮৯৫ সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে গাঢ় হলদে কুয়াশায় ছেয়ে গিয়েছিল সারা লন্ডন শহর। সোমবার থেকে বেস্পতিবার পর্যন্ত বেকার স্ট্রিটের ঘরের জানলা দিয়ে রাস্তার ওপারের বাড়ি পর্যন্ত দেখা যায়নি। প্রথম দিনটা হোমস ঘরে বসে কাটাল বিরাট একটা খাতায় রকমারি খবর আঠা দিয়ে সেঁটে সূচিপত্র তৈরি করার কাজ নিয়ে; দ্বিতীয় আর তৃতীয় দিনটা কাটল মধ্যযুগীয় সংগীত নিয়ে এটা ওর সাম্প্রতিক শখ; কিন্তু চতুর্থ দিনেও প্রাতরাশ খেয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ানোর পর যখন দেখা গেল চটচটে ভারী বাদামি কুয়াশাবর্ত তখনও রাস্তা দিয়ে ভেসে চলেছে এবং তেলের মতো ফোঁটা ফোঁটা আকারে শার্সির কাচে জমছে, তখন শক্তি আর উদ্যমে ঠাসা শার্লক হোমসের মেজাজ ঠিক রাখা গেল না। অবদমিত এনার্জি যেন ফেটে পড়ল অসহিষ্ণু কথাবার্তায়, বসবার ঘরে অস্থির পদচারণায়। নখ কামড়ে ফার্নিচারে টরে টক্কা বাজনা বাজিয়ে সে এক কাণ্ড করে বসল বন্ধুবর।

আমাকে বলল, ওয়াটসন, খবরের কাগজে ইন্টারেস্টিং খবর-টবর আছে?

আমি তো জানি ইন্টারেস্টিং খবর মানে হোমস বোঝে কেবল অপরাধ সম্পর্কিত খবর। অনেক খবরই আছে খবরের কাগজে; যুদ্ধ লাগল বলে, সরকারের পতন ঘটতে পারে, এক জায়গায় বিপ্লবের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে কিন্তু এসব খবরের কোনো আগ্রহই নেই

বন্ধুবরের। তাই ফের অধীরভাবে গজগজ করতে করতে ঘরময় পা ঠুকেঠুকে বেড়াতে লাগল বেচারা।

স্পোর্টসম্যান যদি খেলার সুযোগ না-পায়, তার যা অবস্থা হয়–হোমসের অবস্থা এখন তাই। বকবক করতে লাগল আপন মনে, লন্ডন শহরটা দেখছি একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। কুয়াশায় ঢাকা এমন শহরেই তো দাপাদাপি করে বেড়ানো উচিত চোরডাকাত বদমাশদের। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে কাজ সেরেই লম্বা দেবে–কেউ টের পাবে না।

ছিঁচকে চুরি এন্তার হচ্ছে অবশ্য।

অবজ্ঞায় নাসিকাধ্বনি করে হোমস বললে, আরে ভায়া সমাজের কপাল ভালো আমি নিজে একটা ক্রিমিনাল নই। বিরাট এই স্টেজ সাজানো রয়েছে কি ছিঁচকে চুরির জন্যে? আরও বিরাট অপরাধের উপযুক্ত ক্ষেত্র কি এটা নয়? অপরাধীদের সুবর্ণ সুযোগ তো এখনই।

তা যা বলেছ।

ওয়াটসন, একঘেয়েমি কাটতে চলেছে মনে হচ্ছে।

টেলিগ্রাম নিয়ে ঘরে ঢুকল ঝি। খাম ছিঁড়ে অট্টহাসি হাসল হোমস।

আরে সর্বনাশ! শেষকালে মাইক্রফট দাদা আসছে ছোটো ভাইয়ের আস্তানায়।

এমনভাবে বলছ যেন তার আসাটা একটা আশ্চর্য ব্যাপার।

বন্ধু, ট্রাম যদি বড়োরাস্তায় বাঁধা লাইন ছেড়ে হঠাৎ গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে, অবাক হবে তো? আমার এই দাদাটিরও বাঁধা লাইনে হল পলমল আস্তানা, ডায়োজিনিস ক্লাব আর হোয়াইট হল। এই লাইনেই চক্রবৎ সে ঘোরে–বেলাইন কখনো হয় না। জীবনে একবারই সে এসেছিল এখানে। আজ হঠাৎ লাইন ছেড়ে বেরিয়ে গেল কেন ভাবতে পারছি না।

টেলিগ্রামে তা লেখেনি?

টেলিগ্রামটা বাড়িয়ে দিল হোমস। আমি পড়লাম :

ক্যাডোগেনের ব্যাপারে এখুনি দেখা করব। মাইক্রফট।

ক্যাডোগেন ওয়েস্ট নামটা কিন্তু শুনেছি।

কিন্তু আমার কিছুই মনে পড়ছে না। অবাক হচ্ছি দাদার বেলাইন হওয়া দেখে। কক্ষপথ থেকে গ্রহ ছিটকে যাওয়া আর মাইক্রফট দাদার অন্য পথ পরিক্রমা করা একই ব্যাপার! ভালো কথা, মাইক্রফট কি চিজ তা জান তো?

গ্রিক দোভাষীর মামলা হাতে এলে সামান্য কিছু শুনেছি সরকারি চাকুরে, এই পর্যন্ত জানি!

খুকখুক করে হেসে উঠল, তখন তোমাকে ততটা চিনিনি বলে খুলে বলিনি। মাইক্রফট ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করে ঠিকই কিন্তু মাঝে মাঝে ও নিজেই ব্রিটিশ সরকার হয়ে যায়।

কী আবোল-তাবোল বকছ ভায়া!

জানতাম অবাক হয়ে যাবে। মাইক্রফট বছরে মাইনে পায় মাত্র সাড়ে চারশো পাউন্ড। চিরকালই অন্যের অধীনে খেটে এসেছে, জীবনে কোনোরকম উচ্চাশা নেই, সম্মান বা উপাধি কখনোই পাবে না। তা সত্ত্বেও তাকে ছাড়া মাঝে মাঝে এদেশের চলে না–চলবে না।

কীভাবে শুনি?

ও-রকম একটা সাজানো ঝকঝকে তকতকে ব্রেন আর দুটি নেই বলে। ফলে নিজেই নিজেকে এমন একটা অবস্থায় এনে ফেলেছে যে পাল্লা দেওয়ার মতো দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নেই। মগজের মধ্যে অজস্র ঘটনা ঠেসে রাখবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা জীবিত কোনো মানুষের মধ্যে দেখিনি। বিরাট যে ক্ষমতা আমি অপরাধী অন্বেষণে লাগিয়েছি, ও তা সরকারি কাজে লাগিয়েছে। বিপুল এই ক্ষমতার অধিকারী বলেই সব ডিপার্টমেন্ট থেকেই যেকোনো ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভারটা ছেড়ে দেওয়া হয় ওর ওপর। ও হল সেন্ট্রাল এক্সচেঞ্জ, ক্লিয়ারিং হাউস ওর মগজ থেকে যে সিদ্ধান্ত মেজেঘষে বেরিয়ে যাবে, তাতে সব দিক রক্ষে হবেই। অন্যেরা শুধুই বিশেষজ্ঞ, ও কিন্তু সর্বজ্ঞ। ধরো কোনো মন্ত্রীমশায় কোনো একটা ব্যাপারে নৌবিভাগ, ভারতবর্ষ, কানাডা আর ধাতু সম্পর্কে পরামর্শ চান। এর জন্যে আলাদা দপ্তর আছে। সব দপ্তর থেকে আলাদাভাবে পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু মাইক্রফটের ব্রেনে সব দপ্তরই ঠাসা। ও একাই সমস্যাটার সবরকম সম্ভাবনা ভেবে নিতে পারে মাথার মধ্যে সব খবর ফোকাস করে নিয়ে একই সমস্যার কতরকম প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে, চট করে বলে দিতে পারে। আগে এইজন্যই শর্টকাট পরামর্শদাতা হিসেবে কাজে লাগানো হত মাইক্রফটকে–এখন তাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না। ওর ওই বিরাট ব্রেনে পায়রার খুপরির মতো ছোটো ছোটো খুপরিতে রাজ্যের খবর থরে থরে সাজানো থাকে বলেই চক্ষের নিমেষে ওর মতামত পেয়ে ব্রিটিশ সরকার বর্তে যায়। একাধিকবার জাতির নীতি নির্ধারিত হয়েছে ওর পরামর্শের ভিত্তিতে। এই নিয়েই আছে ও, এইসবই ওর ধ্যানধারণা, মানসিক ব্যায়ামের উপাদান। মাঝে মাঝে ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে আমি দ্বারস্থ হলে ছিটেফোঁটা বুদ্ধি বর্ষণ করেছে আমাকে কিন্তু আজকে যে দেখছি উলটো ব্যাপার। বিরাট বৃহস্পতি খুদে পৃথিবীর

কাছে আসছে। কে এই ক্যাডোগেন ওয়েস্ট? তাকে নিয়ে মাইক্রফটের হঠাৎ মাথাব্যথা কেন?

সোফার ওপর থেকে কাগজের তাড়া হাঁটকাতে হাঁটকাতে উত্তেজিতভাবে বললাম– পেয়েছি, পেয়েছি! গত মঙ্গলবার সকালে পাতালরেলে একটা ছোকরার মৃতদেহ পাওয়া গেছে–নাম তার ক্যাডোগেন ওয়েস্ট।

সিধে হয়ে বসল হোমস, পাইপটা ঠোঁট পর্যন্ত আর পৌঁছোল না।

ওয়াটসন, ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গুরুতর। সামান্য একটা মৃত্যু নিয়ে বেলাইনে চলার পাত্র নয় আমার এই দাদাটি। যদ্দূর মনে পড়ছে ছোকরা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে। পকেট মারা যায়নি, কেউ ঠেলেও ফেলে দেয়নি–মারপিট বা চুরিডাকাতির নামগন্ধ নেই। এ-রকম একটা ভিজে ব্যাপারে মাইক্রফট মাথা ঘামাচ্ছে কেন? আশ্চর্য ব্যাপার তো!

তদন্তের ফলে বেশ কিছু আশ্চর্য খবর জানা গেছে। কেসটা কিন্তু অদ্ভুত।

নইলে আমার ভাই মাথা ঘামায়। আর্মচেয়ারে আড় হয়ে শুয়ে হোমস বললে, বলো ভায়া, আমি শুনছি।

ছোকরার বয়স সাতাশ, নাম আর্থার ক্যাডোগেন ওয়েস্ট, আইবুড়ো, উলউইচ আর্সেনালের কেরানি।

তার মানে সরকারি চাকুরে। মাইক্রফটের লাইনে এসে গেল দেখছি!

গত সোমবার রাত্রে হঠাৎ বেরিয়ে যায় উলউইচ থেকে। শেষ দেখেছে তার প্রণয়িনী মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবুরি সন্ধে সাড়ে সাতটার সময়ে তার কাছ থেকেও হঠাৎ বিদায় নেয় ছোকরা। কারণটা মেয়েটাও বুঝতে পারনি কেননা কোনোরকম ঝগড়াঝাটি হয়নি দুজনের মধ্যে। মৃতদেহটা পায় ম্যাসোন নামে একজন রেলকর্মচারী। লাইনে প্লেট বসায় সে। দেহটা পাওয়া যায় লন্ডন পাতালরেলের আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক বাইরে।

কখন?

মঙ্গলবার ভোর ছটায়। স্টেশনের কাছাকাছি রেললাইন যেখানে টানেলে ঢুকছে, সেইখানে পুবদিকে যেতে বাঁ-হাতি লাইনের বেশ খানিকটা তফাতে পড়েছিল দেহটা–মাথাটা এমনভাবে থেঁতলে গিয়েছে যে দেখলেই বোঝা যায় ট্রেন থেকে না-পড়লে লাইনের ধারে দেহটা ওভাবে পড়ে থাকতে পারে না। বাইরের রাস্তা থেকে ডেডবডি এনে ওখানে ফেলতে গেলে স্টেশনের টিকিট কালেক্টরের চোখে পড়ত।

বুঝলাম। জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় ট্রেন থেকে হয় নিজে পড়ে গেছে, না হয় ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। তারপর?

যে-লাইনের ধারে ডেডবডি পাওয়া গেছে, সেই লাইন দিয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে ট্রেন যায়। মাঝরাতে ছোকরা ট্রেন থেকে পড়ে মারা গেছে কিন্তু ট্রেনে উঠেছিল কখন ধরা যাচ্ছে না।

টিকিটটা দেখলেই তো ধরা যায়।

টিকিট-ফিকিট কিছুই পাওয়া যায়নি পকেটে।

টিকিট পাওয়া যায়নি! ওয়াটসন, এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি জানি টিকিট না-দেখিয়ে মেট্রোপলিটান ট্রেনের প্ল্যাটফর্মেই ঢোকা যায় না। টিকিটটা কি তাহলে পকেট থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে পাছে টিকিট দেখে বোঝা যায় কোন স্টেশন থেকে উঠেছে বলে? খুবই সম্ভব। নাকি কামরার মধ্যে নিজেই ফেলে দিয়েছে? সেটাও সম্ভব। পয়েন্টটা কিন্তু রীতিমতো অদ্ভুত। চুরিডাকাতির নামগন্ধ তো নেই, তাই না?

সেইরকমই দেখা যাচ্ছে। পকেটে যা পাওয়া গেছে, তার ফর্দটা শোনো। দু-পাউন্ড পনেরো শিলিং ছিল মানিব্যাগে; ক্যাপিটাল অ্যান্ড কাউন্টিজ ব্যাঙ্কের একটা চেকবই–উলউইচ ব্রাঞ্চের; এই চেকবই থেকেই লোকটার ঠিকুজিকুষ্ঠি জানা যাবে। উলউইচ থিয়েটারের দুটো ড্রেস-সার্কল টিকিটও ছিল পকেটে–তারিখ ওই দিনের। ইভনিং শোয়ের টিকিট। আর ছোটো এক প্যাকেট টেকনিক্যাল কাগজপত্র।

খুশি হল হোমস দেখলে তো ওয়াটসন পর পর সব মিলে যাচ্ছে! ব্রিটিশ সরকার–উলউইচ অস্ত্রাগার টেকনিক্যাল কাগজপত্র–মাইক্রফট দাদা। ওই তো এসে গেছে মাইক্রফট।

ঘরে ঢুকলেন মাইক্রফট হোমস। দিব্য লম্বা-চওড়া চেহারা। বিরাট চেহারার মধ্যে শারীরিক শক্তি যেন একটু বেশিভাবে প্রকট অথচ ধড়ের বুদ্ধিসমুজ্জ্বল মুণ্ডখানা দেখলে ধড়ের কথা আর মনে থাকে না। ইস্পাত-ধূসর কোটরে বসানো ধারালো চোখ, কাঠের দৃঢ় ঠোঁট এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক ললাট–সব মিলিয়ে চেয়ে থাকার মতো। ধড়টার কথা ভুলে যেতে হয়–বিরাট ওই মস্তকের মধ্যে শক্তিশালী পর্দাটার কথাই কেবল মনে জেগে থাকে।

পেছনে পেছনে এল লেসট্রেড–স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। ওভারকোট খুলে আর্মচেয়ারে বসলেন মাইক্রফট হোমস।

বললেন, শার্লক, কেসটা অতি যাচ্ছেতাই। রোজকার অভ্যেস পালটানো আমার ধাতে সয়! কিন্তু না-এসেও পারলাম না। শ্যাম দেশের অমন জরুরি সমস্যা ফেলে চলে আসতে হল প্রধানমন্ত্রীর ছটফটানি দেখে –নৌবিভাগের প্রশাসন দপ্তরে গেলে শুনবি যেন চাকভাঙা বোলতা গুনগুন করছে–উত্তেজনায় কেউ আর স্থির নেই। কাগজ পড়েছিস তো?

এইমাত্র পড়লাম। টেকনিক্যাল কাগজপত্রগুলো কীসের?

এই রে, ঠিক পয়েন্টে এসে গেলি দেখছি! কপাল ভালো কাগজে ওটা বেরোয়নি–বেরোলে ঢি ঢি পড়ে যেত। ছোকরার পকেটে পাওয়া গেছে ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিনের নকশা। নামটা শুনেছিস নিশ্চয়?

শুধু নামই শুনেছি–তার বেশি নয়।

নকশাটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত রাখার সবরকম চেষ্টাই করেছিল সরকার। ব্রুস-পার্টিংটন সাবমেরিন জলে নামলে সে-তল্লাটে কোনো যুদ্ধজাহাজকেই আর যুদ্ধ করতে হবে না। তিরিশটা আলাদা পেটেন্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে গোটা নকশাটা–প্রত্যেকটা পেটেন্ট সমান গুরুত্বপূর্ণ–কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না, দিলে প্ল্যান কেঁচে যাবে। প্ল্যানটা গুপ্ত রাখার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি হয়নি। অস্ত্রাগারের লাগোয়া গোপন চেম্বারে সিন্দুকের মধ্যে রাখা হয়েছে এবং সে-ঘরের দরজা জানলায় এমন ব্যবস্থা করা আছে যে চোর ডাকাতের চোদ্দোপুরুষের ক্ষমতা নেই ভেতরে ঢোকার। অফিস থেকে এ-নকশা বেরিয়ে যাওয়ার কোনোরকম সম্ভাবনা কল্পনাও করা যায় না। নৌবিভাগের চিফ কনট্রাক্টর যদি ইচ্ছে করেন নকশাটা দেখবেন, তাহলে তাঁকেও আসতে হবে ওই ঘরের মধ্যে। উলউইচ অফিসে। তা সত্ত্বেও লন্ডনের বুকে একজন জুনিয়ার ক্লার্কের মৃতদেহের পকেটে পাওয়া গেল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ সাংঘাতিক গোপনীয় এই প্ল্যান। সমস্ত সরকারি মহল তাই এখন থরহরি কম্প এই ব্যাপার নিয়ে।

কিন্তু প্ল্যান তো পেয়ে গেছ?

না, শার্লক না! দশটা কাগজ সরানো হয়েছিল উলউইচ থেকে। তার মধ্যে সবচেয়ে দরকারি তিনটে কাগজ একদম বেপাত্তা–সাতটা পাওয়া গেছে ছোকরার পকেটে। বাকি তিনটে তাহলে গেল কোথায়? পুলিশ আদালতের ওইসব ছিঁচকে মামলা শিকেয় তুলে আদা জল খেয়ে লেগে পড়–দেশের কাজ কর–ইংলন্ড কৃতজ্ঞ থাকবে তোর কাছে। সমস্যাটা আন্তর্জাতিক, খেয়াল থাকে যেন ছিঁচকে কেস নয়। কাগজপত্র ক্যাডোগেন ওয়েস্ট সরাতে গেল কেন, তিনটে কাগজ এখন কোন চুলোয়, ক্যাডোগেন পরলোকে গেল কীভাবে, রেললাইনের ধারেই-বা নশ্বর দেহটা পৌঁছোল কী করে, শয়তানি চক্র ফাঁস করা যায় কীভাবে এতগুলো প্রশ্নের জবাব তোকে বার করতে হবে।

দাদা, তোমার চোখ আমার মতোই ধারালো। তুমি নিজে দেখছ না কেন।

তথ্য এনে দে–চেয়ারে বসে মাথা খাঁটিয়ে সমাধান বাতলে দেব। কিন্তু ছুটোছুটি করা আমার পোষায় না। রেলগার্ডকে গিয়ে জেরা করা, কি উপুড় হয়ে লেন্স নিয়ে মাটি পরীক্ষা করা–ওসব আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। কাজটা তোর। বড়ো রকমের খেতাব-টেতাব পাওয়ার ইচ্ছে যদি থাকে তো—

হেসে উঠল শার্লক হোমস।

মাথা নেড়ে বললে, আমি খেলি, খেলতে ভালোবাসি বলে। কেসটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। কিন্তু আরও কিছু ঘটনা চাই যে।

এই কাগজটা রাখ–এতে দরকারি পয়েন্ট আর কিছুঠিকানা লিখে এনেছি। কাগজপত্র রাখার মূল দায়িত্ব স্যার জেমস ওয়ালটারের। ভদ্রলোকের মাথার চুল পেকেছে সরকারি কাজে, অসীম শ্রদ্ধা আর বিশ্বাসের পাত্র, ডিগ্রি লিখতে গেলে দু-লাইনেও ধরে না—এর দেশাত্মবোধ নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সিন্দুকের দুটো চাবির একটা থাকে এঁর কাছে। সোমবার অফিস টাইমে কাগজগুলো সিন্দুকেই ছিল। চাবি নিয়ে স্যার জেমস তিনটে নাগাদ লন্ডন রওনা হন। সন্ধের দিকে এ-ঘটনা যখন ঘটে উনি তখন বারক্রে স্কোয়ারে–অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ারের বাড়িতে বসে।

খবরটা যাচাই করা হয়েছে তো?

হয়েছে। স্যার জেমসের ভাই কর্নেল ভ্যালেনটাইন ওয়ালটার বলেছেন উলউইচ থেকে কখন বেরিয়ে গিয়েছিলেন স্যার জেমস। অ্যাডমিরাল সিনক্লেয়ার বলেছেন উনি লন্ডনে ছিলেন কখন। কাজেই এদিক দিয়ে স্যার জেমসকে ধাঁধা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় চাবিটা কার কাছে থাকে?

মিস্টার সিডনি জনসনের কাছে একধারে সিনিয়র ক্লার্ক আর নকশা আঁকিয়ে লোকটা বিমর্ষ টাইপের, বয়স চল্লিশ, বিয়ে করেছে, ছেলে-মেয়ে পাঁচটি। কম কথা বলে, খাটে খুব, কাজের রেকর্ড ভালো, কিন্তু সহকর্মীদের কাছে অপ্রিয়। তার বউ বলেছে, সোমবার

সন্ধেটা বাড়িতেই ছিল সিডনি জনসন–ঘড়ির চেনে ঝোলানো চাবি কাছছাড়া হয়নি এক সেকেন্ডের জন্যেও।

ক্যাডোগেন সম্বন্ধে এবার বলো।

ছোকরা চাকরিতে এসেছে বছর দশেক। মাথা গরম, কাজ ভালো, সোজা চরিত্রের লোক। ওর বিরুদ্ধে আমাদের বলার কিছু নেই। অফিসে সিডনি জনসনের ঠিক পরেই ওর স্থান। কাজের খাতিরে রোজই প্ল্যান নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। প্ল্যানে হাত দেওয়ার সুযোেগ আর কারো নেই।

রাত্রে প্ল্যান সিন্দুকে তুলেছিল কে?

সিনিয়র ক্লার্ক মিস্টার সিডনি জনসন।

জুনিয়ার ক্লার্ক ক্যাডোগেন ওয়েস্টের পকেটে যখন প্ল্যান পাওয়া গেছে, তখন চুরিটা সে-ই করেছে–এ নিয়ে দ্বিমত আছে কি?

নেই। কিন্তু শার্লক, জট তো তাতে পরিষ্কার হচ্ছে না বরং বাড়ছে। যেমন, কাগজপত্র ও নিতে গেল কেন?

বিনিময়ে টাকা পেত নিশ্চয়?

কয়েক হাজার পাউন্ড তো পেতই।

বিক্রি করার উদ্দেশ্য ছাড়া লন্ডনে কাগজ নিয়ে যাওয়ার আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি?

আমার মাথায় তো আসছে না।

তাহলে কাজ শুরু করার জন্যে এই উদ্দেশ্যটা ধরে এগোনো যাক। ওয়েস্ট ছোকরা কাগজ নিয়েছে নকল চাবি দিয়ে—

একটা নকল চাবিতে হত না, শার্লক। কয়েকটা লাগবে। সদর দরজা খুলতে হবে, ঘরের দরজা খুলতে হবে।

বেশ তো, বেশ কয়েকটা নকল চাবি নিয়ে কাগজ সরাল ছোকরা। লন্ডনে গেল বিক্রি করতে। মতলব ছিল ভোরের আগেই ফিরে সিন্দুকে ঢুকিয়ে রাখবে আসল প্ল্যান। কিন্তু লন্ডনে হাতে হাতে ফল পেল বিশ্বাসঘাতকতার।

কীভাবে?

উলউইচে ফেরার সময়ে ট্রেনেই তাকে খুন করা হয়–লাশ ফেলে দেওয়া হয় লাইনের ধারে।

লাশ পাওয়া গেছে আল্ডগেট স্টেশনের কাছে। স্টেশনটা লন্ডন ব্রিজ পেরিয়ে–উলউইচ যাওয়ার রাস্তায়।

লন্ডন ব্রিজ পেরিয়ে যাওয়ার কারণও নিশ্চয় আছে। কামরায় এমন কেউ ছিল যার সঙ্গে তন্ময় হয়ে কথা বলছিল ছোকরা। কথার শেষে বচসা, হাতাহাতি, খুন। অথবা হয়তো কামরা থেকেই নিজেই লাফিয়ে বাঁচতে গিয়ে মারা গেছে। সঙ্গে যে ছিল, দরজা বন্ধ করে ছিল। ঘন কুয়াশায় কেউ জানতেও পারল না কী ঘটে গেল।

কিন্তু তোর নিজের যুক্তিতেই ফাঁক থেকে যাচ্ছে, শার্লক। প্ল্যান বিক্রি করলেও যে-লোক সন্ধে নাগাদ লন্ডন যাবে, সে উলউইচ থিয়েটারে সন্ধের শোয়ের টিকিট কাটতে যাবে কেন? প্রণয়িনীকে মাঝপথে ফেলে লম্বা দেবে কেন?

লেসট্রেড এতক্ষণ ছটফট করছিল কথার যুদ্ধ শুনতে শুনতে। এবার দুম করে বলে উঠল, ধোঁকা দেওয়ার জন্যে।

খুবই অসাধারণ ধোঁকা সন্দেহ নেই। এই গেল ধোঁকা-তত্ত্বে আমার প্রথম আপত্তি। দ্বিতীয় আপত্তি হল এই : ভোরের আগেই কাগজ দশটা ফিরিয়ে না-আনলে কিন্তু চুরি ফাঁস হয়ে যাবে জেনেও সে পকেটে করে মাত্র সাতটা কাগজ নিয়ে ফিরছিল কেন? বাকি তিনটে গেল কোন মুলুকে? তা ছাড়া এত কাঠখড় পুড়িয়ে নকশা বেচতে যে লন্ডন গেল, নকশা-বেচার টাকাটা পকেটে না-নিয়েই-বা সে ফিরছিল কেন?

লেসট্রেড তৈরি হয়েই ছিল জবাব দেওয়ার জন্যে। বলে উঠল, এ আর এমন কী কঠিন ব্যাপার। বেচবে বলেই নিয়ে গিয়েছিল লন্ডনে। কিন্তু দরে পোষাল না বলে ফিরছিল যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে দেবে বলে। শত্রুর চর ছাড়বে কেন, পেছন পেছন এল, ট্রেনের মধ্যে খুন করল, সবচেয়ে দরকারি নকশা তিনটে পকেটস্থ করল, লাশ বাইরে ফেলে দিল, ল্যাটা চুকে গেল। কেমন? সব সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলেন কি না?

কাছে টিকিট ছিল না কেন?

কোন স্টেশনের কাছে শত্রুর চর থাকে, পাছে তা ফাঁস হয়ে যায়, তাই খুনি নিজেই টিকিটটা সরিয়েছে পকেট থেকে।

তাহলে আর এত ঝঞ্ঝাট কেন? বিশ্বাসঘাতক প্রাণ দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছে, সাবমেরিনের নকশাও এতক্ষণে শত্রুর দেশে চলে গেছে। তাহলে আর খামোকা মাথা ঘামিয়ে দরকারটা কী?

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে উঠলেন মাইক্রফট-গা তোল, শার্লক, গা তোল! আমার মন বলছে তোদের এ সব অনুমানই ভুল–গোড়া থেকেই ভুল। উঠে পড়ে কাজে লেগে যা, অকুস্থলে হানা দে, সংশ্লিষ্ট লোকজনদের

ধরে জেরা করে নাস্তানাবুদ করে ছাড়। সাধ্যমতো যা করতে পারিস–কোনোটা বাকি রাখিসনি। দেশকে এভাবে সেবা করার এত বড়ো সুযোগ জীবনে তুই পাসনি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখি কী করা যায়! ওয়াটসন, উঠে পড়ো। লেসট্রেড, চলো আমার সঙ্গে আল্ডগেট স্টেশনে। মাইক্রফট, ঘরের ছেলে ঘরে যাও। সন্ধের মধ্যেই খবর দোব। তবে খুব একটা কিছু আশা করে থেকো না।

একঘণ্টা পরে আল্ডগেট স্টেশনের ঠিক আগে টানেল থেকে বেরিয়ে আসা পাতালরেলের ধারে এসে দাঁড়ালাম আমি, হোমস আর লেসট্রেড। রেল কোম্পানির তরফ থেকে একজন সদাশয় লালমুখো বৃদ্ধ ভদ্রলোক এলেন সঙ্গে।

লাইন থেকে ফুট তিনেক তফাতে একটা জায়গা দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, লাশ পড়েছিল এইখানে। দেখলেই বুঝবেন ওপর থেকে পড়া সম্ভব নয়–ট্রেনের ভেতর থেকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। যদ্দূর খবর পেয়েছি, সোমবার মাঝরাতে যে-ট্রেনটা গেছে এখান দিয়ে লাশ ফেলা হয়েছে সেই ট্রেন থেকেই।

কামরাগুলো পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে? মারপিটের চিহ্ন পাওয়া গেছে?

সে-রকম চিহ্ন বা টিকিট কিছুই পাওয়া যায়নি।

কোনো দরজা খোলা ছিল কি?

না।

লেসট্রেড বললে, আমরা অবশ্য একটা খবর পেয়েছি। আল্ডগেট স্টেশনে ট্রেন ঢোকবার ঠিক আগে সোমবার এগারোটা চল্লিশ নাগাদ ধপাস করে একটা ভারী জিনিস পড়ার আওয়াজ পায় একজন যাত্রী–ঘন কুয়াশার জন্যে কিছু দেখা যায়নি। আরে, আরে, মি. হোমস, ওটা কী করছেন?

নিঃসীম আগ্রহে উদ্দীপ্ত মুখে ইস্পাতের রেললাইনের পানে নিমেষহীন নয়নে চেয়ে ছিল শার্লক হোমস। রেললাইন যেখানে বেঁকে বেরিয়ে এসেছে টানেলের মধ্যে থেকে চেয়ে আছে ঠিক সেইদিকে। আল্ডগেট একটা জংশন স্টেশন, অনেক রেললাইনের কাটাকাটি চলেছে সেখানে হোমসের সাগ্রহ চাহনি নিবদ্ধ এইসব লাইনের কাটাকুটির দিকে। এ চেহারা, এ চাহনি–আমি চিনি। থিরথির করে কাপছে নাকের পাটা, বেঁকে শক্ত হয়ে গিয়েছে পাতলা ঠোঁট, বঙ্কিম চেহারা নিয়েছে ভুরু জোড়া।

বিড়বিড় করে বলল আপন মনে, পয়েন্টস!

কী বলছেন বলুন তো?

রেললাইনের এত পয়েন্ট আর কোথাও নেই, তাই না?

না।

সেইসঙ্গে একটা বাঁক। লাইনে লাইনে কাটাকুটি আর একটা বাঁক! আহারে, তাই যদি হত!

কী হত মি. হোমস? সূত্র পেয়েছেন মনে হচ্ছে?

একটা আইডিয়া পেয়েছি বলতে পার–অন্ধকারে একটা নিশানা দেখা যাচ্ছে যেন। সেটা ক্রমশই আরও বেশি ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে। লাইনে তেমন রক্ত পড়েনি দেখছি।

কিন্তু চোটটা জবর রকমের তাই না?

হাড় গুঁড়িয়ে গিয়েছিল–বাইরে চোট খুব একটা লাগেনি।

তা সত্ত্বেও রক্তপাতটা সবাই আশা করে। কুয়াশার মধ্যে যে-ট্রেন থেকে ভারী জিনিস পড়বার ধপাস আওয়াজ পাওয়া গিয়েছিল, সে-ট্রেনটা পরীক্ষা করার সুযোগ হবে?

সম্ভব নয়, মি. হোমস। কামরাগুলো সব খুলে ফেলে অন্য ট্রেনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষণে।

লেসট্রেড বললে, আমি নিজে সব কামরা দেখেছি। কিন্তু চোখে পড়েনি।

হোমসের চরিত্রে একটা দুর্বলতা আছে। কারো ভোতা বুদ্ধি একদম সইতে পারে না–ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তিরিক্ষে গলায় বললে, কিন্তু আমি কামরা পরীক্ষা করার জন্যে ট্রেনটা দেখতে চাইনি। ওয়াটসন, চলো, এখানে আর কিছু দেখবার নেই। লেসট্রেড, তোমাদের আর কষ্ট দেব না। এবার উলউইচে গিয়ে তদন্ত আরম্ভ করতে হবে দেখছি।

লন্ডন ব্রিজ থেকে ভাইকে একটা টেলিগ্রাম পাঠাল হোমস :

অন্ধকারে আলোর নিশানা পাচ্ছি। তবে নিভে যেতে পারে যেকোনো মুহূর্তে। লোক মারফত বেকার স্ট্রিটের বাসায় বিদেশি স্পাই আন্তর্জাতিক গুপ্তচরদের লিস্ট পাঠিয়ে দাও–ইংলন্ডে যারা আছে সবার নাম আর ঠিকানা চাই–লোকটা যেন আমি না-ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, শার্লক।

উলউইচের ট্রেনে উঠে বসে হোমস, এতেই কাজ হবে। এইরকম একটা অতি আশ্চর্য কেসে নাক গলানোর সুযোগ দিয়ে মাইক্রফট যথেষ্ট উপকার করল আমার।

নিশ্চয় একটা অদ্ভুত রক্ত-চনমন করা চিন্তা ঢুকেছে হোমসের মগজে। চাপা, তীব্র প্রাণশক্তি যেন ফুটে ফুটে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ-মুখ থেকে। খাঁচায় বন্ধ ল্যাজঝোলা কানঝোলা ফক্স হাউন্ডের চেহারা একেবারে পালটে যায় শিকারের গন্ধ

পেলে। অবিকল সেই পরিবর্তন দেখা দিয়েছে শার্লক হোমসের মধ্যে। মাত্র ক-ঘণ্টা আগে এই মানুষটাই কুয়াশা-পিঞ্জরে বন্দি অবস্থায় ঘরের মধ্যে ইঁদুর-রাঙা ড্রেসিং গাউন পরে অস্থির চরণে যেন লেংচে লেংচে পায়চারি করেছে দীর্ঘতনু নিয়ে কিন্তু এখন সে আর এক মানুষ।

শুধু বলল, উপাদান পাওয়া গেছে, ওয়াটসন। সুযোগ এখনও রয়েছে। আস্ত গাধা আমি তাই, সম্ভাবনাটা আগে বুঝিনি।

আমার কাছে কিন্তু এখনও সব অন্ধকার।

শেষটা এখনও অন্ধকার আমার কাছেও। তবে কি জান, একটা আইডিয়া মাথায় এলে তা থেকে আর একটা আইডিয়ায় যাওয়া যায়। ছোকরা মারা গেছে অন্য কোথাও, লাশটা রাখা হয়েছিল ট্রেনের ছাদে।

ছাদ!

ভায়া, লাশটা এমন একটা জায়গায় ঠিকরে পড়েছে যেখানে রেললাইনের কাটাকুটি থাকার দরুন আর বাঁক থাকার দরুন প্রত্যেকটা কামরাকে হেলেদুলে যেতে হবেই। কামরা যখন দুলতে থাকে ডাইনে বাঁয়ে, কামরার ভেতর থেকে কিছুই ছিটকে পড়ে না কিন্তু ছাদে কোনো বস্তু থাকলে, তা গড়িয়ে পড়বেই। তারপর দেখ, ও-রকম একটা মারাত্মক জখম হওয়া সত্ত্বেও তেমন রক্ত পড়ে নেই জায়গাটায়। তার মানে কি এই নয়

যে ছোকরাকে পরলোকে পাঠানো হয়েছে অন্যত্র এবং লাশটাকে রেখে দেওয়া হয়েছিল ট্রেনের ছাদে? পয়েন্টস আর বাঁক পেরোনোর সময়ে আপনা থেকেই ঠিকরে পড়েছে লাইনের ধারে? পর পর দুটো অদ্ভুত ধাঁধার সমাধান দেখ এই একটা আইডিয়া থেকেই হয়ে গেল, তাই নয় কি?

শুধু কি তাই? পকেটে টিকিট না-থাকার কারণও তো স্পষ্ট হয়ে গেল! সোল্লাসে বললাম আমি।

ঠিক বলেছ। টিকিট কেন নেই, এবার তাও পরিষ্কার বোঝা গেল। সব সমস্যার সমাধান দেখ একে-একে পাওয়া যাচ্ছে, সঠিক আইডিয়াটি মাথায় আনতে পেরেছি বলে।

কিন্তু ভাই, রহস্য যে আরও গভীর হল এই আইডিয়ার ফলে।

হয়তো, বলে চিন্তাসাগরে ডুব দিল শার্লক হোমস–ট্রেন উলউইচে পৌঁছোনোর আগে আর একটি কথাও বলল না। প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে একটা ছ্যাকড়াগাড়িতে উঠে বসে পকেট থেকে বার করল মাইক্রফটের দেওয়া কাগজখানা।

বললে, সারাবিকেলটা বেশ কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে কাটাতে হবে। প্রথমেই যাব স্যার জেমস ওয়ালটারকে দর্শন করতে।

টেমসের ধারে বিখ্যাত ব্যক্তিটির সাজানো ভিলায় যখন পৌঁছোলাম, তখন কুয়াশা ফিকে হয়ে আসছে, আর্দ্র রোদ্র উঁকি দিচ্ছে। ঘণ্টা বাজাতেই খাস চাকর এসে দাঁড়াল দোরগোড়ায়।

বললে গম্ভীর মুখে, স্যার জেমসকে খুঁজছেন। তিনি আজ সকালে দেহ রেখেছেন।

সেকী কথা! আঁতকে উঠল হোমস, মারা গেছেন! কীভাবে?

ভেতরে আসুন। ওঁর ভাই কর্নেল ভ্যালেন্টাইনের সঙ্গে কথা বলে যান।

চলো।

বসবার ঘরে গেলাম। একটু পরেই উধ্বশ্বাসে এলেন একজন দীর্ঘকায় সুশ্রী ব্যক্তি। গালে হালকা রঙের দাড়ি। বয়স বছর পঞ্চাশ। চুল উশকোখুশকো। চোখ উল্লান্ত। সদ্য শোকের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কথা পর্যন্ত বলতে পারছেন না–জড়িয়ে যাচ্ছে।

বললেন, বিশ্রী এই কেলেঙ্কারির ধাক্কা উনি সইতে পারলেন না। জীবনে যাঁকে কলঙ্ক স্পর্শ করতে পারেনি, বীভৎস এই ব্যাপারে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল–তাই চলে গেলেন সবাইকে ছেড়ে।

ওঁকে কলঙ্ক মুক্ত করার জন্যেই এসেছিলাম। ওঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনলে রহস্য পরিষ্কার করতে পারতাম।

যা বলবার পুলিশকে উনি বলে গেছেন। ওঁর বিশ্বাস ক্যাডোগেন ওয়েস্ট ছোকরাই যত নষ্টের মূল। বাকিটুকু আরও গোলমেলে।

আপনার কী মনে হয়?

খবরের কাগজে যা পড়েছি আর দাদার মুখে যা শুনেছি তার বেশি কিছুই জানি না। মি. হোমস, যদিও ব্যাপারটা অভব্য দেখাচ্ছে তবুও বলি–এইরকম মানসিক অবস্থায় আপনি যত তাড়াতাড়ি কথা শেষ করে বিদায় নেন, ততই ভালো।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসে হোমস বললে, এ-রকম একটা ঘটনা ঘটবে ভাবতেই পারিনি। আত্মহত্যা না হার্টফেল–সেটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। কর্তব্যে অবহেলা করার গ্লানি সইতে না-পেরে নিজেই নিজের জীবন শেষ করে দিলেন কি? পরে তা নিয়ে ভাবা যাবে। এখন যাওয়া যাক ক্যাডোগেন ওয়েস্টের বাড়ি।

শহরের প্রান্তে ছোটো একটা সাজানো বাড়িতে দেখা হল নিহত ছোকরার শোকবিহ্বল মায়ের সঙ্গে। তার কাছ থেকে বিশেষ কথা বার করা গেল না। তবে ছোকরার প্রণয়িনী মিস ভায়োলেট ওয়েস্টবুরি অনেক কথা বললে। মেয়েটির মুখ সাদা সোমবার রাত্রে শেষবার ক্যাডোগেনকে সে-ই দেখেছে।

বললে, মি. হোমস, দিনরাত কেবলই ভাবছি, ভাবছি আর ভাবছি–ঘুমাতেও পারছি না– কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না এ কী করে সম্ভব। আর্থার দেশকে ভালোবাসত প্রাণ দিয়ে। দেশের যাতে সর্বনাশ হয়, এমন কোনো কাজ ওকে দিয়ে সম্ভব নয়। নিজের হাত এক কোপে কাটতে রাজি সে, কিন্তু গুপ্ত কাগজ দেশের বাইরে সেই হাত দিয়ে পাচার করার পাত্র সে নয়। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য আর্থারকে যারা জানে তারা কেউই বিশ্বাস করবে না।

কিন্তু ঘটনা যে অন্য কথা বলছে, মিস ওয়েস্টবুরি?

জানি, জানি, তাই তো সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

টাকার দরকার হয়েছিল কি আর্থারের?

না। ওর চাহিদা কম, রোজগার ভালো। কয়েকশো পাউন্ড জমিয়েছিল। নতুন বছরেই বিয়ে হয়ে যেত দুজনের।

কোনোরকম মানসিক উত্তেজনা লক্ষ করেছিলেন কি? বলুন, মিস ওয়েস্টবুরি, আমাদের কাছে প্রাণ খুলে কথা বলুন।

মেয়েটির চোখ-মুখের চকিত পরিবর্তন হোমসের ধারালো নজরে ধরা পড়েছে। লাল হয়ে গেল মিস ওয়েস্টবুরি–দ্বিধায় পড়ল।

তারপর বললে, করেছিলাম। বুঝেছিলাম কী যেন ঘুরঘুর করছে ওর মনের মধ্যে।

অনেক দিন ধরেই কি তা লক্ষ করেছিলেন?

গত হপ্তায় লক্ষ করেছিলাম। সবসময়ে কী যেন ভাবত, যেন একটা উদবেগে পেয়ে বসেছিল। একবার চেপে ধরেছিলাম—কীসের এত ভাবনা বলার জন্যে। ও বললে—ব্যাপারটা অফিস সংক্রান্ত। অত্যন্ত গোপনীয়। আমাকেও বলা যাবে না।

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

মিস ওয়েস্টবুরি, থামবেন না। আর্থার জড়িয়ে পড়তে পারে এমন কথাও যদি জানেন–তাও বলুন। বলা যায় না কী থেকে কী বেরিয়ে যায়।

নিশ্চয় বলব। বারদুয়েক বলি বলি করেও কী যেন চেপে গেছে। একবার শুধু বলেছিল, বিষয়টা অত্যন্ত গোপনীয় বিদেশি গুপ্তচররা দেদার টাকা ঢালবে যদি সন্ধান পায়।

আরও গম্ভীর হয়ে গেল হোমস।

আর কিছু?

আমরা নাকি বড়ো ঢিলে কড়াকড়ি মোটেই নেই–বিশ্বাসঘাতকের পক্ষে প্ল্যান হাতানো অত্যন্ত সোজা।

এ-কথা সম্প্রতি বলেছিল–না আগেও বলেছিল?

এই তো সেদিনের কথা আগে কক্ষনো বলেনি?

শেষ সন্ধের ব্যাপারটা বলুন।

থিয়েটারে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। কুয়াশায় হেঁটে যাচ্ছিলাম। অফিসের কাছাকাছি এসে সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল কুয়াশার মধ্যে।

কোনো কথা না-বলে?

খুব অবাক হয়ে একবার চেঁচিয়ে উঠেছিল–তার বেশি নয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ও ফিরল না। বাড়ি চলে এলাম। পরের দিন সকালে অফিস খুলতে পুলিশ এল খোঁজ নিতে। দুপুর বারোটা নাগাদ শুনলাম ভয়ংকর খবরটা। মি. হোমস, মি. হোমস, কলঙ্কের হাত থেকে ওকে বাঁচান।

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল হোমস।

বললে, এসো ওয়াটসন, এবার যাওয়া যাক অফিসে কাগজ হারিয়েছে যেখান থেকে।

গাড়ি চলতেই বললৈ, তদন্ত হাতে নিয়ে দেখেছিলাম ছোকরার কপাল মন্দ, এখন দেখছি একেবারেই জঘন্য। আসন্ন বিয়ের জন্যে টাকার দরকার হয়েছিল বলেই ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে পর্যন্ত প্ল্যান হাতানোর প্ল্যান বলে তাকেও দুষ্কর্মের সঙ্গিনী করতে গিয়েছিল।

কিন্তু চরিত্র বলে জিনিসটা কি একেবারে ফেলনা? তা ছাড়া ভাবী জীবনসঙ্গিনীকে দুম করে রাস্তায় ফেলে পালাবে কেন?

তা ঠিক, তা ঠিক। কেসটা বড়ো ভয়ংকর হে, এ-রকম খটকা লেগে থাকবেই।

সিনিয়র ক্লার্ক সিডনি জনসন অফিসেই ছিল। সসম্মানে অভ্যর্থনা জানাল হোমসকে। চশমাপরা মাঝবয়েসি, পাতলা চেহারার মানুষ। গাল আর আঙুল থিরথির করে কাঁপছে স্নায়ুর ওপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায়।

কী সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন তো মি. হোমস? স্যার জেমসের মৃত্যুর খবর শুনেছেন?

সেখান থেকেই আসছি।

সোমবার সন্ধ্যাতেও কত নিখুঁত ছিল এই অফিস আর আজ? চিফ নেই, ক্যাডোগেন ওয়েস্ট খতম, নকশা উধাও। কী ভীষণ! কী ভীষণ! সব চাইতে ভীষণ হল ক্যাডোগেন ওয়েস্টের রাতারাতি চোর বনে যাওয়া।

আপনি ঠিক জানেন ক্যাডোগেন ওয়েস্ট চোর?

সে ছাড়া কে চুরি করবে বলুন? উঃ ভাবা যায় না!

সোমবার কখন বন্ধ হয়েছিল অফিস?

পাঁচটায়।

আপনি বন্ধ করেছিলেন?

আমিই সবশেষে অফিস ছেড়ে বেরোই।

নকশা ছিল কোথায়?

ওই সিন্দুকে। আমি নিজে রাখি ওখানে।

এ-বাড়ি পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে?

একজন বুড়ো যুদ্ধফেরত সৈন্য পাহারা দেয়। কিন্তু অন্যান্য অফিসও দেখতে হয় তাকে। লোকটা দারুণ বিশ্বাসী। সেদিন অবশ্য কুয়াশাও পড়েছিল প্রচণ্ড।

পাঁচটার পর এ-বাড়ি ঢুকতে গেলে নিশ্চয় তিনটে চাবির দরকার হত ক্যাডোগেন ওয়েস্টের?

তা হত। বাইরের দরজার চাবি, এই অফিসের দরজার চাবি, সিন্দুকের চাবি।

চাবি থাকত শুধু আপনার কাছে আর স্যার জেমস ওয়ালটারের কাছে?

আমার কাছে শুধু সিন্দুকের চাবি থাকে–দরজার নয়।

স্যার জেমস কি গুছোননা স্বভাবের মানুষ?

অত্যন্ত, তিনটে চাবিই একটা রিংয়ে রাখেন–আমি নিজে দেখেছি।

রিংটা নিয়েই লন্ডন গিয়েছিলেন?

তাই তো বলেছেন।

আপনার চাবি কাছছাড়া হয়নি তো?

কখনোই না।

অথচ ক্যাডোগোন ওয়েস্টের পকেটে নকল চাবিও পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া, কোনো ক্লার্ক যদি নকশা বিক্রির ফন্দি এঁটে থাকে, সে তা কপি করে নেয়–আসল নকশা লোপাট করতে যায় না। ঠিক কিনা?

নকশাগুলো এত টেকনিক্যাল, এত জটিল যে কপি করা মুশকিল।

কিন্তু আমি তো জানি আপনার, স্যার জেমসের আর ক্যাডোগেন ওয়েস্টের এ-ধরনের টেকনিক্যাল বিদ্যে আছে।

তা আছে। কিন্তু দোহাই আপনার, আমাকে এর মধ্যে টানবেন না–বিশেষ করে নকশা

যখন পাওয়া গেছে ওয়েস্টেরই পকেটে।

কিন্তু কপি করলেই যখন ঝঞ্ঝাট চুকে যেত, আসল নকশা নেওয়ার ঝুঁকি নিতে গেল কেন?

খুবই আশ্চর্য সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও নিয়েছে।

এ-কেস অনেক ব্যাপারেই এমনি আশ্চর্য। যে কাগজ তিনটে এখনও নিখোঁজ, শুনলাম সেই তিনটেই নাকি গোটা নকশার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ?

তা ঠিক।

অন্য কাগজ হাতে না-রেখে এই তিনটে কাগজের সাহায্য নিয়ে ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিন তৈরি সম্ভব?

আগে সেইরকমই রিপোর্ট করেছিলাম অ্যাডমিরালটিকে। কিন্তু আজকে কাগজপত্র ফের দেখলাম। যে কাগজে ডবল ভালভের অটোমেটিক ব্যবস্থা আঁকা আছে, সেটা ফেরত এসেছে। এ জিনিস বিদেশিদের নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে–নইলে সাবমেরিন বানানো যাবে না। অবশ্য এ-অসুবিধে দু-দিনেই কাটিয়ে উঠবে ওরা।

কিন্তু নিখোঁজ কাগজ তিনটেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

নিঃসন্দেহে।

বাড়িটা এক চক্কর ঘুরে দেখতে চাই।

সিন্দুকের তালা, ঘরের দরজা আর জানলার লৌহকপাট খুঁটিয়ে দেখল হোমস। বাইরে এসে উত্তেজিত হল একটা লরেল ঝোপ দেখে। ডাল ভাঙা, পাতা ছেড়া–যেন তার ওপর হাঁটাচলা হয়েছে। লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করল মাটির চেহারা। অস্পষ্ট পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে। সিনিয়র ক্লার্ককে বললে ভেতর থেকে জানলার লৌহকপাট বন্ধ করতে। করার পর বাইরে দেখা গেল, কপাট পুরো বন্ধ হচ্ছে না–বাইরে থেকে কী ভেতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

বললে, তিন দিনে সব চিহ্ন মুছে গেছে। চলো ওয়াটসন, লন্ডনে যাওয়া যাক–উলউইচে আর কিছু পাব বলে মনে হয় না।

স্টেশনে গিয়ে কিন্তু একটা মনের মতো খবর পাওয়া গেল। টিকিট বিক্রেতা কেরানিটি বললে সোমবার রাতে ক্যাডোগেন ওয়েস্টের কম্পমান মূর্তি তার বেশ মনে আছে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল–থার্ড ক্লাসের একটা টিকিট কেটে খুচরো পর্যন্ত তুলতে পারছিল না। খুব সম্ভব সোয়া আটটার ট্রেনে চেপেছিল–কেননা প্রণয়িনীর কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল সাড়ে সাতটা নাগাদ।

ওয়াটসন, বলল হোমস, ঘটনাগুলো এবার পর পর সাজানো যাক। উলউইচে তদন্ত করে মনে হয়েছিল, ওয়েস্ট নিজে হাতে সরিয়েছে নকশা। এখন দেখা যাচ্ছে, কোনো বিদেশি স্পাই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কুয়াশা ঢাকা রাতে বান্ধবীকে নিয়ে থিয়েটার যাওয়ার সময়ে হঠাৎ সে দেখলে সেই স্পাইটি অফিসের দিকে যাচ্ছে। অবাক হয়ে তাই সে চেঁচিয়ে উঠেছে–তার বেশি বলতে পারেনি। কর্তব্য তার কাছে সবার ওপরে সিদ্ধান্তও

নেয় ঝট করে। তাই প্রণয়িনীকে ফেলে দৌড়েছে লোকটার পেছনে, নিজের চোখে দেখেছে জানলার ফাঁক দিয়ে কীভাবে সাবমেরিনের নকশা নিয়ে বেরিয়ে এল সেই গুপ্তচর। এইজন্যেই নকশা নকল করা হয়নি–আসল নকশা খোয়া গেছে। এ-ধাঁধার এভাবে ছাড়া অন্য সমাধান আর হয় না।

তারপর?

তারপরেই একটু অসুবিধেয় পড়ছি। কেননা, চোখের সামনে গোপন দলিল লোপাট হতে দেখে বাধা দেওয়া উচিত ছিল ওয়েস্টের–কেন দেয়নি? ওপরওলা কাউকে দেখেছিল বলে কি? হয়তো তাই। নাকি, চোর মহাপ্রভু কুয়াশায় গা-ঢাকা দেওয়ায় পাগলের মতো তার বাড়ি থেকেই নকশা উদ্ধারের জন্যে দৌড়েছিল ওয়েস্ট? হাতে একদম সময় না-থাকায় প্রণয়িনীকেও কিছু বলে যেতে পারেনি? এইখানেই সব গুলিয়ে যাচ্ছে। মাইক্রফটের পাঠানো গুপ্তচরদের নাম-ঠিকানা হাতে এলে আবার উলটোদিক থেকে ভাবনা শুরু করব।

বেকার স্ট্রিটে গিয়ে পেলাম মাইক্রফটের চিঠি–একজন সরকারি কর্মচারীর হাতে পাঠিয়েছে। চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল হোমস।

চুনোপুঁটি অনেকেই আছে। কিন্তু এ ধরনের বৃহৎ ব্যাপারে নাক গলানোর মতো বুকের পাটা আছে যে তিনটি রাঘব বোয়ালের, তাদের নাম-ঠিকানা দিচ্ছি। অ্যাডলফ মেয়ার, তেরো নম্বর, গ্রেট জর্জ স্ট্রিট, ওয়েস্ট মিনিস্টার; লুই লা রোথিয়েরে, ক্যামডেন ম্যানসন্স,

নটিংহিলং হুগা ওবারস্টিন, তেরো নম্বর, কলফিল্ড গার্ডেন্স, কেনসিংটন। এদের মধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি সোমবার পর্যন্ত শহরে ছিল–তারপর কোথায় গেছে। অন্ধকারে আলো দেখতে পেয়েছিস শুনে খুশি হলাম। মন্ত্রীপার্ষদ উদবিগ্ন সুখবর শোনবার প্রতীক্ষায়। জরুরি তলব এসেছে আরও ওপরমহল থেকে। দেশের সমস্ত বাহিনী দরকার হলে তোর পেছনে গিয়ে দাঁড়াবে।–মাইক্রফট।

হোমস ততক্ষণে লন্ডনের একটা ম্যাপ বিছিয়ে বসে আপন মনে বকর বকর করে চলেছে। কারোরই নাকি তর সইছে না এতবড়ো একটা জটিল সমস্যায়। তারপরেই আচমকা চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে।

পেয়েছি, ওয়াটসন, পেয়েছি, এবার ঠিক দিক ধরতে পেরেছি। বন্ধু, তুমি গাড়িতে বসে খাতা কলম নিয়ে লিখতে আরম্ভ করে দাও কীভাবে দেশসেবায় বুদ্ধি ব্যয় করেছি দুজনে। আমি চললাম একটু দেখেশুনে আসতে। ভয় নেই, আসল কাজে আমার জীবনীকার আর কমরেড পাশেই থাকবে। বলে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে মহাউল্লাসে প্রায় নাচতে নাচতে উধাও হল বন্ধুবর।

হোমসকে আমি চিনি। চাপা প্রকৃতির মানুষ অকারণে এত উল্লাস দেখায় না। তাই বেশ ফুর্তি এল মনে। রাত ন-টার পর লোক মারফত পেলাম ওর ছোট্ট চিরকুট :

কেনসিংটনে গ্লসেস্টার রোড গোলডিনির রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার খাব। তুমিও এসো। সঙ্গে একটা সিধকাঠি, একটা বাটালি, একটা চোরা লণ্ঠন আর একটা রিভলভার আনবে। শা. হো.।

কুয়াশা ঢাকা রাস্তায় এই ধরনের বস্তু নিয়ে কোনো ভদ্রলোক হাঁটে না। ওভারকোটের তলায় জিনিসগুলো লুকিয়ে নির্দিষ্ট ঠিকানায় গিয়ে দেখলাম দরজার কাছে একটা গোলটেবিলের পাশে গ্যাঁট হয়ে বসে আমার বন্ধুটি।

খাবে কিছু? তাহলে কফি আর চুরুট খাও। যন্ত্রপাতি এনেছ?

ওভারকোটের পকেটে আছে।

চমৎকার। ওয়াটসন, সব ঘটনা শুনলে বুঝবে ক্যাডোগেন ছোকরাকে ট্রেনের ছাদেই রাখা হয়েছিল ওইজন্যেই ট্রেনটা আমি দেখতে চেয়েছিলাম–কামরা পরীক্ষা করতে চাইনি।

ব্রিজ থেকেও তো পড়তে পারে?

অসম্ভব। ট্রেনের ছাদে রেলিং থাকে না গড়ানে ঢালু ছাদে কিছু থাকলে দুলুনি ঝাঁকুনির সময়ে তা ঠিকরে পড়বেই। ক্যাডোগেন ওয়েস্টকেও ছাদে রাখা হয়েছিল।

কিন্তু রাখা হল কেমন করে?

সম্ভাবনা একটাই আছে। তুমি তো জান ওয়েস্ট এন্ডের কাছাকাছি পাতালরেল টানেল থেকে। সোজা বেরিয়ে এসেছে? আবছা মনে পড়ছে, টানেল থেকে বেরোনোর সময়ে মাথার ওপরে যেন বাড়ির জানলা দেখেছি। ধরো কোনো ট্রেন যদি এইসব জানলার তলায় দাঁড়িয়ে যায়, লাশটা ছাদে রেখে দেওয়া এমন কিছু কি কঠিন?

খুব সম্ভব।

তাহলে তোমাকে আমার একটা পুরানো তত্ত্ব ফের মনে করিয়ে দিই। সব পথ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন সব চাইতে অসম্ভব পথটাই আসল পথ বলে ধরে নিতে হবে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সব লাইনের তদন্ত করে নাকের জলে চোখের জলে হওয়ার পর যখন ম্যাপ খুলে দেখলাম একজন আন্তর্জাতিক গুপ্তচর পাতালরেলের ধারের একটা বাড়িতে থাকে, তখন আর খুশি চাপতে পারিনি। আমার উল্লাস দেখে তুমিও ভড়কে গিয়েছিলে।

এইজন্যেই নাচতে নাচতে ছুটেছিলে?

আরে হ্যাঁ। তেরো নম্বর কলফিল্ড গার্ডেন্সের সুধীব্যক্তি হুগো ওবারস্টিনকে টার্গেট করে বেরিয়ে পড়লাম নাচতে নাচতে। রেলকর্মচারীদের নিয়ে প্রথমে গেলাম গ্লসেস্টার রোড স্টেশনে। লাইনের ধার বরাবর হাঁটলাম। কর্মচারীরাই দেখিয়ে দিলে তেরো নম্বর বাড়িটার পেছনের দরজা লাইনের ঠিক পাশেই আর দুটো বড়ো রেললাইন সেখানে

কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার ফলে হামেশাই পাতালরেলের ট্রেনে বেচারিদের মিনিট কয়েক ঠিক ওই জায়গাটিতে থেমে থাকতে হয়।

দারুণ আবিষ্কার হোমস! সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!

ভায়া ওয়াটসন, আবিষ্কারের এখনও অনেক দেরি—এই তো সবে খেলা শুরু গোলপোস্ট এখনও অনেক দূরে। বাড়ির পেছনটা দেখবার পর এলাম সামনের দিকে। দেখেই বুঝলাম পাখি উড়েছে। আসবাবপত্র খুবই কম। একজনমাত্র চাকরকে নিয়ে ওপরতলায় থাকে ওবারস্টিন নিঃসন্দেহে চাকরটি তার অপকর্মের দোসর। ওবারস্টিন কিন্তু পালায়নি–সে জানে তার নামে শমন বেরোনোর কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাই চোরাই নকশা নিয়ে গেছে মহাদেশের বিভিন্ন দেশে খদ্দের খুঁজতে। এই সুযোগে তার ঘরদোর দেখে আসব ঠিক করেছি।

শমন বার করে ব্যাপারটা আইনসংগত করে নিলে হত না?

প্রমাণ কোথায় যে শমন বার করব?

কীসের আশায় তাহলে যাচ্ছ?

কত রকমের চিঠিপত্র পেতে পারি আগে থেকে কি বলা যায়?

হোমস, আমার কিন্তু এসব ভালো লাগছে না।

ভায়া, তুমি পাহারা দেবে রাস্তায়, অপকর্মটা করব আমি। এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ভাববার সময় এটা নয়। নৌদপ্তরের কথা ভাবো, চিন্তা করো কী দারুণ উদবেগে অপেক্ষা করছেন মন্ত্রীপার্ষদ, মাইক্রফটের চিঠিখানা মনে করো–যেতে আমাদের হবেই।

জবাবে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত ধরে জোর ঝাঁকুনি দিল হোমস।

আমি জানতাম, শেষ মুহূর্তে কেঁচোর মতো গুটিয়ে যাওয়ার পাত্র তুমি নও, মুহূর্তের জন্যে চোখের তারায় দেখলাম প্রীতি স্নিগ্ধ কোমল প্রতিচ্ছবি–পরমুহূর্তেই আবার ফিরে এল কর্তৃত্বময় বাস্তব-অনুগত নীরস সত্তা।

বললে, আধমাইল যেতে হবে। চলো হেঁটে যাই–তাড়াতাড়ির দরকার নেই। যন্ত্রপাতিগুলো যেন হাত ফসকে মাটিতে না পড়ে যায়–সিঁধেল চোর সন্দেহে তুমি গ্রেপ্তার হলে আমার পরিতাপের শেষ থাকবে না!

লন্ডনের ওয়েস্ট-এন্ডে চেপটামুখো থামওলা বারান্দা-ঝোলা সারি সারি বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলাম ভিক্টোরীয় যুগের সুশোভিত বাড়িগুলির একটিতে বাচ্চাদের পার্টি

জমেছে কচিগলায় হুল্লোড় আর পিয়ানোর বাজনা শোনা যাচ্ছে। ঘন কুয়াশার মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে একটা প্রকাণ্ড দরজার সামনে তুলে ধরল হোমস।

বললে, আরে সর্বনাশ! এ দেখছি কঠিন ব্যাপার। তালা আর খিল–দুটো খুলতে হবে। তার চাইতে চলো উঠোনে ঢুকে পড়ি পাশের খিলেন দিয়ে ঢোকা যাবে।

পাঁচিল টপকে উঠোনে ঢুকতে-না-ঢুকতেই মাথার ওপর কুয়াশার মধ্যে টহলদার চৌকিদারের ভারী বুটের আওয়াজ শুনলাম। ধীর ছন্দের পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। যন্ত্রপাতি নিয়ে হেঁট হয়ে দরজার সামনে বসল হোমস। কসরত করল কিছুক্ষণ। কটাং করে আওয়াজ হল একটা। পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল ও পেছনে আমি। লণ্ঠন জ্বালিয়ে কার্পেটহীন সিঁড়ি বেয়ে এসে দাঁড়ালাম একটা নীচু জানলার সামনে।

ওয়াটসন, এই সেই জানলা,বলে দু-হাট করে খুলে দিল পাল্লা। ঠিক তখনই চাপা গুমগুম ঝনঝন আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল ছুটন্ত যন্ত্রযানের বিকট আওয়াজ উল্কাবেগে জানলার ঠিক নীচ দিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল একটা ট্রেন। গোবরাটে লণ্ঠন রেখে জানলার ফ্রেম খুঁটিয়ে দেখল হোমস। ধোঁয়ার ভুসো লেগে কালো হয়ে গেলেও জায়গায় জায়গায় ঘষা লেগে ভুসো উঠে গেছে।

ওয়াটসন, এখন বুঝলে তো, লাশটা রাখা হয়েছিল এই জানলায়। আরে, আরে, এ যে রক্তের দাগ! কাঠের ফ্রেমের এক জায়গায় এক বিবর্ণ দাগ দেখিয়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল হোমস। এই দেখ, সিঁড়ির পাথরের ওপর রক্তের দাগ। যাক, অনুমানটা হাতেনাতে

প্রমাণ হয়ে গেল। এবার একটা ট্রেন জানলার তলায় না-দাঁড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। টানেলের মধ্যে থেকে গুড়গুড় গুমগুম শব্দে নক্ষত্রবেগে একটা ট্রেন বেরিয়ে এসেই গতি মন্থর করে দিলে এবং ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল জানলার নীচে। একটা কামরার ছাদ রইল জানলার ঠিক চার ফুট দূরে। আস্তে করে পাল্লা বন্ধ করে দিল হোমস।

ওয়াটসন, অভিযান তাহলে ব্যর্থ হল না বল?

দারুণ কাজ করলে! বুদ্ধি যুক্তির এতবড়ো চমক এর আগে কখনো দেখাওনি। আগের সব কীর্তি আজ তুমি ছাড়িয়ে গেলে!

উঁহু, ওই ব্যাপারটিতে এক মত হতে পারলাম না তোমার সঙ্গে। ওই লাশ ট্রেনের ছাদে ছিল, এই ধারণাটা মাথায় আনার পর থেকে বাকিটুকু ছবির মতো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল চোখের সামনে–তবে আসল কাজের এখনও বাকি। এসো।

রান্নাঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম ওপরতলায়। খাবার ঘরটা ন্যাড়া বললেই চলে। আসবাবপত্র বিশেষ নেই। শোবার ঘরও তথৈবচ। পাশের ঘরটা পড়াশুনার ঘর–

রাশিরাশি বই আর পত্রিকা ছড়ানো। হোমস ড্রয়ারের পর ড্রয়ার টেনে, কাগজপত্র হাঁটকে চলল এক মনে–একঘণ্টা পরে উঠে দাঁড়াল খালি হাতে।

বললে, পাক্কা শয়তান। চিঠিপত্র সব নষ্ট করে গেছে। এইটাই আমাদের শেষ ভরসা। লেখবার টেবিলে একটা ছোট্ট টিনের ক্যাশবাক্স তুলে নিয়ে বাটালির চড় মেরে খুলে ফেলল ডালাটা। কতকগুলো পাকানো কাগজ বেরোল ভেতর থেকে। কোনোটাতে লেখা জলের চাপ, কোনোটায় প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে জলের চাপ–নিঃসন্দেহে ডুবোজাহাজ সম্পর্কিত কাগজপত্র। অসহিষ্ণুভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিল হোমস। একদম তলায় পাওয়া গেল একটা খাম। ভেতরের বস্তুগুলো টেবিলের ওপর ছেড়ে ফেলতেই আশার আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল মুখখানা।

আরে, আরে, এ যে দেখছি হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ কলমে ছাপা কতকগুলো বিজ্ঞাপনের কাটিং। পর পর সাজানো–কিন্তু তারিখ নেই। ডেলি টেলিগ্রাফ কাগজ। পৃষ্ঠার ডান হাতি ওপরের কোণ। প্রথমটা এই :

শিগগিরই খবর শোনার আশায় রইলাম। শর্তে রাজি। কার্ডে লেখা ঠিকানায় বিশদ লিখুন।– পিয়েরট।

তারপর : বড়ো জটিল–বোঝা যাচ্ছে না। আরও ভোলা রিপোর্ট চাই। জিনিস পেলেই বিনিময়ে যা দেবার দেওয়া হবে। পিয়েরট।

এর পরে : পরিস্থিতি খুবই জরুরি। চুক্তি রক্ষে না হলে কথা ফিরিয়ে নেব। চিঠিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করুন। বিজ্ঞাপনে জানাব রাজি আছি–পিয়েরট।

সবশেষে : সোমবার রাত নটার পর। দু-বার টোকা। শুধু আমরা। সন্দিগ্ধ হবেন না। জিনিস পেলে নগদ টাকা। পিয়েরট।

বাঃ, রেকর্ড তো দেখছি শেষ পর্যন্তই আছে! সবার শেষে আসল আদমিটাকে ধরতে পারলেই মণিকাঞ্চন যোগ হয়। বলে টেবিলে টকটক করে আঙুলের বাদ্যি বাজিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল হোমস ঘাড় হেঁট করে। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললে–ঠিক আছে। খুব একটা মুশকিল হবে না। ওয়াটসন, ডেলি টেলিগ্রাফের অফিসে ছুঁ মেরে যাই।

পরের দিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে নেমন্তন্ন রাখতে এলেন মাইক্রফট হোমস আর লেসট্রেড। গতকালের অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি রসিয়ে রসিয়ে বর্ণনা করল শার্লক হোমস। চোরের মতো বাড়িতে ঢোকা হয়েছে শুনে ব্যাজার মুখে ঘাড় নাড়ল লেসট্রেড।

বললে, মি. হোমস, এইসব বেআইনি কাজ করেন বলেই টেক্কা মারেন আমাদের ওপর। একদিন কিন্তু আপনার এই বন্ধুটিকে নিয়ে ঝামেলায় পড়বেন বলে দিলাম।

কী হে ওয়াটসন? দেশের জন্যে না হয় শহিদই হওয়া গেল? মাইক্রফট তোমার কী মত?

চমৎকার কাজ করেছিস, শার্লক, অপূর্ব খেল দেখিয়েছিস। কিন্তু লাভটা কী হল?

টেবিল থেকে ডেলি টেলিগ্রাফটা তুলে নিয়ে হোমস বললে, আজকের কাগজে পিয়েরটের বিজ্ঞাপনটা দেখনি?

সেকী রে! আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছে?

এই তো : আজ রাতে। একই সময়। একই জায়গায় দু-বার টোকা। খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত। পিয়েরট।

লাফিয়ে উঠল লেসট্রেড, কেয়া বাত! এ-বিজ্ঞাপনের জবাবে শ্রীমান এলেই কাঁক করে ধরব আমি।

সেইজন্যেই তো বিজ্ঞাপনটা দিলাম খবরের কাগজে। তোমরা দুজনেই আজ রাত আটটায় এসো কলফিল্ড গার্ডেন্সে।

ভেবে যখন আর কোনো লাভ নেই, তখন ভাবনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনকে ছুটি করে দেওয়ার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে শার্লক হোমসের। তখন সে ব্যস্ত থাকে–কূট সমস্যার ছায়াপাতও ঘটতে দেয় না মনের মধ্যে। ঝট করে ওভাবে নির্লিপ্ত হওয়ার অসাধারণ মনো্বেল আমার নেই বলেই সমস্ত দিনটা অপরিসীম স্নায়বিক উত্তেজনায় ছটফট

করলাম আমি। রাত আটটার সময়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম গ্লসেস্টার রোড স্টেশনে লেসট্রেড আর মাইক্রফটের সঙ্গে একত্র হয়ে। ওবারস্টিনের উঠোনের দরজা খুলে রাখা হয়েছিল গতরাতে। কিন্তু রেলিং টপকে ঢুকতে কিছুতেই রাজি হলেন না মাইক্রফট–বাধ্য হয়ে আমি ভেতরে গিয়ে হল ঘরের দরজা খুলে দিলাম। ন-টা নাগাদ চার মূর্তিমান ওত পেতে রইলাম পড়বার ঘরে।

একটা একটা করে কাটল দুটো ঘণ্টা। রাত এগারোটার সময়ে মনে হল, বৃথা চেষ্টা। মিনিটে দু-বার করে ঘড়ি দেখছেন মাইক্রফট আর লেসট্রেড। নিষ্কম্প নির্বিকারভাবে আধবোজা চোখে বসে হোমস–অনুভূতি কিন্তু তন্দ্রাচ্ছন্ন নয়–অত্যন্ত প্রখর। আচমকা এক ঝটকায় সিধে করল মাথা।

বলল, আসছে।

পা টিপেটিপে কে যেন চলে গেল দরজার সামনে দিয়ে। ফিরে এল একটু পরে। খসখস শব্দ শুনলাম দরজার সামনে। তারপরেইদু-বার কড়া বাজানোরতীক্ষ্ণআওয়াজ ভেসে এল কানে। হোমস আমাদের নিরস্ত করে নিজেই উঠে এল। টিমটিম করে গ্যাসের বাতি জ্বলছিল হল ঘরে। দরজা খুলে দিতেই সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকল একটা কৃষ্ণমূর্তি দরজা বন্ধ করে দিল হোমস। শুনলাম চাপা গলায় বলছে, এদিকে। কৃষ্ণমূর্তি এসে দাঁড়াল আমাদের ঘরে পেছন পেছন ঘরে ঢুকেই ঝট করে দরজা বন্ধ করে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল হোমস। কৃষ্ণমূর্তি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠে পেছন ফিরে দাঁড়াতেই হোমস খপ করে তার কলার চেপে ধরে আসুরিক শক্তিবলে ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের মেঝেতে। লোকটা টলতে

টলতে উঠে দাঁড়িয়েই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। আছড়ে পড়ায় চওড়া কিনারা টুপি ঠিকরে গেল মাথা থেকে ঠোঁটের ওপর থেকে সরে গেল মাফলার। বেরিয়ে পড়ল একটা সুদর্শন মুখ—একগাল হালকা রঙের দাড়ি। কর্নেল ভ্যালেনটাইন ওয়ালটার।

বিস্ময়ে শিস দিয়ে উঠল শার্লক হোমস।

ওয়াটসন, কী গাধা আমি! এর কথা তো একদম ভাবিনি আমি।

কে এ? সাগ্রহে শুধোন মাইক্রফট।

সাবমেরিন ডিপার্টমেন্টের প্রধান কর্তা স্যার জেমস ওয়ালটারের ছোটোভাই। জ্ঞান ফিরে আসছে দেখছি। ওঁকে জেরা করার ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।

লম্ববান দেহটা তুলে নিয়ে শুইয়ে দিলাম একটা সোফায়। একটু পরেই উঠে বসলেন কর্নেল। ভয়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে এমনভাবে কপালে হাত দিলেন যেন স্বপ্ন দেখছেন কি না বুঝতে পারছেন না।

বললেন, এ আবার কী? আমি তো এসেছি মিস্টার ওবারস্টিনের সঙ্গে দেখা করতে।

হোমস বললেন, কর্নেল ওয়ালটার, হাটে হাঁড়ি ভেঙে গেছে আপনার। সব কীর্তিই আমরা জেনে ফেলেছি। একজন ইংরেজ ভদ্রলোক যে এত নীচে নামতে পারেন, ভাবাও যায়

না। ওবারস্টিনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী ধরনের এবং কী জাতীয় চিঠি লেখালেখি করেছিলেন, সব আমরা জানি। ক্যাডোগেন ওয়েস্ট ছোকরা মারা গেছে কী পরিস্থিতিতে, তাও অজানা নয়। এখন একটু প্রায়শ্চিত্ত করুন। কুকর্ম স্বীকার করুন। কয়েকটা কথা আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

গুঙিয়ে উঠে দু-হাতে মুখ ঢাকা দিলেন কর্নেল। কথা বললেন না। আমরা উন্মুখ হয়ে রইলাম।

হোমস বললে, কর্নেল ওয়ালটার, বিশ্বাস করুন, আমরা সব জানি। আমরা জানি আপনার টাকার দরকার হয়েছিল, দাদার চাবি নকল করেছিলেন, ওবারস্টিনের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করেছিলেন–ওবারস্টিন আপনার চিঠির জবাব দিত ডেলি টেলিগ্রাফে বিজ্ঞাপন দিয়ে। আমরা জানি সোমবার রাত্রে কুয়াশায় গা ঢেকে আপনি অফিসে গিয়েছিলেন, ক্যাডোগেন ওয়েস্ট আপনাকে দেখে ফেলেছিল–কোনো কারণে আপনাকে আগে থেকেই ও সন্দেহ করেছিল। আমরা জানি, ও আপনাকে নকশা চুরি করতে দেখেছে কিন্তু বাধা দেয়নি খাঁটি ভদ্রলোকের মতোই এই ভেবে যে নকশা নিয়ে আপনি হয়তো লন্ডনে দাদার কাছে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনার পেছন ছাড়েনি। আপনি যখন এ-বাড়িতে ঢুকলেন–তখন সে বাগড়া দিয়েছে। কর্নেল ওয়ালটার, তখন আর শুধু বিশ্বাসঘাতকতা নয়–আরও একটা বড়ো অপরাধে আপনি জড়িয়ে পড়লেন নররক্তে হাত রাঙালেন।

আমি না! আমি না। বিশ্বাস করুন আমি খুন করিনি! ককিয়ে উঠলেন কর্নেল।

তাহলে ক্যাডোগেনের লাশ ট্রেনের ছাদে শুইয়ে দেওয়ার আগে তাকে খুন করা হয়েছিল কীভাবে?

নিশ্চয় বলব। সব বলব। স্টক এক্সচেঞ্জের দেনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। ওবারস্টিন আমাকে পাঁচ হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছিল। কিন্তু খুনটা আমি করিনি।

তাহলে?

ক্যাডোগেন আমাকে আগে থেকেই কেন জানি না সন্দেহ করে বসেছিল। ও যে আমার পেছন পেছন এ-বাড়ি এসেছে। আমি জানতামই না। দরজায় দু-বার টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই পেছন পেছন ঝড়ের মতো ক্যাডোগেন ঢুকে পড়ল—ভীষণ চেঁচামেচি জুড়ে দিল হল ঘরে। ওবারস্টিনের কাছে একটা পিস্তল থাকত। সেই পিস্তল দিয়ে ওর মাথায় মারতেই আছড়ে পড়ল মেঝেতে মারা গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দুজনে। তারপর বুদ্ধিটা এল ওবারস্টিনের মাথায়। বললে, ট্রেনের মাথায় লাশ ফেলে দেব। তার আগে দেখে নিই কী-কী নকশা এনেছেন! দশটা নকশার মধ্যে তিনটে রেখে দিলে। বললে, বড্ড টেকনিক্যাল–কপি করা যাবে না। আমি বললাম, তা হবে না। আজ রাতেই সব কাগজ ফেরত দিতে হবে। নইলে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। ও বললে, কপি করা অসম্ভব। আমি বললাম, তাহলে দশটা কাগজই ফেরত নিয়ে যাব। ও তখন বললে, তার চাইতে এক কাজ করা যাক। সাতটা কাগজ এই ছোকরার পকেটে পুরে ট্রেনের ছাদে লাশ ফেলে দেওয়া যাক। পুলিশ জানবে ছোকরাই

নকশা সরিয়েছে। রাজি হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। একটা ট্রেন দাঁড়াল জানলার তলায়। দারুণ কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না। ক্যাডোগেনের লাশ শুইয়ে দিলাম একটা কামরার ছাদে। এ-ব্যাপারে এর বেশি আমি আর জানি না।

আপনার দাদা?

একটা কথাও বলেনি। তবে চাবি নেওয়ার সময়ে একবার আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলেছিল। সন্দেহ করত তখন থেকেই। চোখ দেখে বুঝেছি এ ব্যাপারে ও আমাকে সন্দেহ করেছে। তাই আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি!

ঘর নিস্তব্ধ। তারপর মাইক্রফট হোমস বললেন, ক্ষতিপূরণ করুন। শাস্তির বহর কমে যাবে।

কী ক্ষতিপূরণ করতে হবে বলেন?

ওবারস্টিন নকশা নিয়ে এখন কোথায়?

জানি না।

ঠিকানা দেয়নি?

বলেছিল প্যারিসের হোটেল দ্য লুভরে চিঠি লিখলেই ওর কাছে পৌঁছে যাবে।

শার্লক হোমস বললে, ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ তাহলে এখনও পাবেন।

যা করতে বলবেন, তাই করব। লোকটার ওপর আমার তিলমাত্র মমতা নেই। ওর জন্যেই আমার আজ এই অবস্থা।

বসুন এখানে। এই নিন কাগজ কলম। যা বলছি লিখে যান। খামের ওপর যে-ঠিকানা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, সেই ঠিকানা লিখুন। ঠিক আছে। এবার লিখুন চিঠি, মহাশয় নিশ্চয় লক্ষ করেছেন, কাগজপত্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল নেই। আমার কাছে নকলটা আছে। প্ল্যানটা নইলে সম্পূর্ণ হবে না। এর জন্যে নতুন ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাই আরও পাঁচ হাজার দিতে হবে। ডাকযোগে নকশা পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না– টাকাটা নোট বা গিনিতে নেব চেক নয়। এ সময়ে এদেশ ছেড়ে আপনার কাছে গেলে লোকের সন্দেহ হবে। তাই, শনিবার দুপুরে শেরিংক্রস হোটেলের ধূমপান করার ঘরে আপনার জন্যে বসে থাকব। ইংলিশ নোট বা গিনি নেব। অন্য দেশের নয়। ঠিক আছে, ওতেই হবে। এরপরেও যদি শয়তানটা না-আসে তো খুবই অবাক হব।

সত্যিই কাজ হল! সে এক ঐতিহাসিক কাণ্ড–গুপ্ত ইতিহাস যদিও। নকশা সম্পূর্ণ করার লোভে ফাঁদে পা দিলে ওবারস্টিন–এখন পনেরো বছরের মেয়াদে ঘানি ঘোরাচ্ছে ব্রিটিশ জেলখানায়। তার ট্রাঙ্কে পাওয়া গেছে ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যান ইউরোপের নানান দেশের নৌদপ্তরের কর্তাদের নিলাম ডেকে বিক্রি করবে বলে তুলে রেখেছিল।

কর্নেল ওয়ালটারকেও জেলে যেতে হয়েছিল–তবে বছর দুয়েক পরে জেলেই মারা যান। হোমস আবার তন্ময় হল প্রবন্ধ লেখা নিয়ে। মাঝে একটা দিন কাটিয়ে এল উইন্ডসরে। ফিরে এল একটা ভারি সুন্দর পান্না বসানো টাই-পিন নিয়ে। জিজ্ঞেস করতে মুচকি হেসে বললে, এক ভদ্রমহিলা দিয়েছেন তার নাকি একটা উপকার করেছে হোমস। এর বেশি কিছু না-বললেও ভদ্রমহিলার নামটা আঁচ করতে কষ্ট হয়নি আমার। এও জানি যে ওই টাই-পিন দেখলেই ব্রুস-পার্টিংটন নকশাঘটিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি জাগ্রত হবে বন্ধুবর শার্লক হোমসের স্মৃতিপটে চিরকালের জন্য।

————

টীকা

নিখোঁজ নকশার নারকীয় নাটক : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্রুস-পার্টিংটন প্ল্যানস স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় এবং কলিয়ার্স উইকলির ১২ ডিসেম্বর ১৯০৮ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

ট্রাম : সেকালের ট্রাম ঘোড়ায় টানত।

জীবনে একবারই সে এসেছিল : সে-ঘটনা দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার গল্পের। তা ছাড়াও দ্য এমটি হাউজ গল্পের বর্ণনাতে মাইক্রফটের বেকার স্ট্রিটে হোমসের বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের খবর পাওয়া যায়।

উলউইচ আর্সেনাল : উলউইচের রয়্যাল আর্সেনাল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০৫ সালে। রয়্যাল মিলিটারি অ্যাকাডেমি এবং রয়্যাল আর্টিলারি হল আর্সেনালের অংশ। আর্সেনালে বন্দুক, কার্তুজ, অন্যান্য ক্ষেপণাস্ত্র ছাড়া গান-ক্যারেজ এবং ওয়াগন নির্মিত হত।

কামরার মধ্যে নিজেই ফেলে দিয়েছে : হতেই পারে না। কারণ তৎকালীন নিয়মে যাত্রাশেষে যাত্রীকে টিকিট দেখাতে হত, জানিয়েছেন লেসলি ক্লিংগার এবং অন্য কয়েকজন।

ড্রেস-সার্কল : থিয়েটারে সর্বনিম্ন ব্যালকনির এই আসনের দর্শকদের সান্ধ্য-পোশাক পরিধান সেকালে বাধ্যতামূলক ছিল।

শ্যাম দেশ : সিয়াম-বা বর্তমান থাইল্যান্ড হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র দেশ যেখানে কোনো ইউরোপীয় উপনিবেশ কায়েম হয়নি।

প্রধানমন্ত্রীর ছটফটানি দেখে : ১৮৯৫-এ লর্ড সলসবেরি ছিলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী।

সাবমেরিন : প্রথম সাবমেরিন নির্মিত হয় ১৬২০ সালে ইংলন্ডে। নির্মাতা এক ওলন্দাজ ব্যক্তি। এই জলযানকে আরও উন্নত রূপ দেন রবার্ট ফুলটন। ১৮৮০ সালে রবার্ট ডবলু, গ্যারেট নামে এক ইংরেজ কয়লার বয়লারের সাহায্যে চালিত সাবমেরিন তৈরি করেন। ইলেকট্রিক মোটরচালিত জলের নীচে চলবার যান নির্মিত হয় ১৮৮৬-তে। অ্যান্ড্রু ক্যাম্পবেল এবং জেমস অ্যাশ নামক দুই ইংরেজের নকশা মোতাবেক। ১৮৯৫ নাগাদ জন পি. হল্যান্ডের নকশায় প্লাঞ্জার নামক সাবমেরিন নির্মাণের পরিকল্পনা হলেও সেই নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি। যেমন হয়নি ব্রুস-পার্টিংটনের নকশায় কোনো ডুবোজাহাজের নির্মাণ।

সমস্যাটা আন্তর্জাতিক : কয়েকজন গবেষক জানিয়েছেন ১৮৯০-এ জার্মান চ্যান্সেলর অটো ফন বিসমার্ককে বরখাস্ত করে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়মের জার্মানির নৌশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে ব্রুস-পার্টিংটন নকশা চুরি যাওয়ার কিছু সম্পর্ক থাকতে পারে।

লা রোথিয়েরে : রোথিয়েরে এবং ওবেরস্টিনের উল্লেখ পাওয়া যায় দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য সেকেন্ড স্টেন গল্পে।

পর পর সাজানো : ডেলি টেলিগ্রাফের কাটিংগুলো রেখে দেওয়ার কোনো দরকার ছিল না ওবেরস্টিনের। তাহলে সে ওগুলো ওভাবে সাজিয়ে রাখল কি শার্লক হোমসের সুবিধার জন্য? প্রশ্ন তুলেছেন হোমস-গবেষক ডি মার্টিন ডেকিন।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

পনেরো বছরের মেয়াদে : নৃশংস খুন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাজা মাত্র পনেরো বছর হতেই পারে না বলে মত প্রকাশ করেছেন কয়েকজন বিশেষজ্ঞ।

বিদায় নিলেন শার্লক হোমস

[হিজ লাস্ট বাও]

শার্লক হোমস নাটকের শেষ অঙ্ক

দোসরা অগাস্ট রাত নটা–পৃথিবীর ইতিহাসে এহেন কালান্তক অগাস্ট আর আসেনি–ভয়ংকরের ঘনঘটা এভাবে কখনো দেখা দেয়নি। স্বয়ং ঈশ্বর বুঝি কুপিত হয়েছিলেন–বদ্ধ গুমোট বাতাস তাই বুঝি থমথম করছিল তারই চূড়ান্ত অভিশাপের অশনিসংকেত রূপে। সূর্য ডুবে গেছে কোনকালে–তবুও সুদূর পশ্চিমের আকাশে রক্তরাঙা ক্ষতচিহ্নের মতো দগদগ করছে একটা লাল তির্যক আভা। মাথার ওপর আকাশে ঝিলমিল করছে অগুনতি জাহাজের রোশনাই। বাগানের পাথুরে পথে ধীরপদে পায়চারি করছে দুজন জার্মান, ঠিক পেছনেই লাল পাথর গাঁথা পাথরের নীচু প্যাটার্নের বাড়ি। পায়ের নীচে এবড়োখেবড়ো চকখড়ি পাহাড়ের সানুদেশে সমুদ্রসৈকত। চার বছর আগে এই পাহাড় আর বাড়িতে আস্তানা গেড়েছে ভন বর্ক–দিক-দিগন্তে টহল দেওয়ার জন্যেই যেন জায়গা খুঁজে নিয়েছে প্রকাণ্ড একটা ইগল। দুই মাথা এক করে গোপনে ফিসফাস করছে দুই মূর্তি–যেন ঘোর ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠেছে–দুজনের কথায়। মুখে জ্বলন্ত চুরুট। নীচে থেকে চুরুটের আগুন দেখে মনে হবে যেন দূরায়ত কোনো পিশাচ ধূমায়িত গনগনে চোখ মেলে কটমট করে দেখছে অন্ধকারের দৃশ্য।

কাইজারের অগুনতি অনুরক্ত গুপ্তচরের মধ্যে অতুলনীয় এই ভন বর্ক লোকটা অনন্য প্রতিভার দৌলতেই ইংরেজদের সর্বনাশ করার ভার পেয়েছিল প্রথমে এবং এই কুচক্রী ধীশক্তির প্রসাদেই আজ সে অদ্বিতীয় গুপ্তচর হতে পেরেছে। এই পৃথিবীর অন্তত জনাছয়েক ব্যক্তি যারা ভেতরের খবর রাখে–তারা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি ভন বর্ক কী চিজ। কী বিপুল তার অধ্যবসায় এবং কী পরিমাণ সূক্ষ্ম তার কূট বুদ্ধি। এই ছ-জনের একজন এই মুহূর্তে তার পাশেই দাঁড়িয়ে। এঁর নাম ব্যারন ভন হালিং। জার্মান কূটনৈতিক রাষ্ট্র-প্রতিনিধির চিফ সেক্রেটারি। অদূরে সরু রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে তাঁর এক-শো হর্সপাওয়ারের সুবৃহৎ বেঞ্জগাড়ি–কথা শেষ হলেই এই গাড়ি চেপে তিনি ফিরে যাবেন লন্ডনে।

চিফ সেক্রেটারি বলছিলেন, ঘটনাস্রোত দেখে মনে হচ্ছে এই হপ্তার শেষ নাগাদ তুমি বার্লিন ফিরে যাবে। অভ্যর্থনার বহর দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেশের জন্যে যা করেছ, তা নাড়া জাগিয়েছে খুব উঁচুমহলে। এদেশের উঁচুমহলও তোমাকে তো মাথায় তুলে রেখেছে। ব্যারন ভদ্রলোক কথা বলেন খুব মন্থর ভঙ্গিমায় টেনে টেনে কূটনৈতিক জীবনে শুধু এই বাচনভঙ্গিকে সম্বল করেই আজ তিনি এত ঊর্ধ্বে উঠেছেন। বিরাট চেহারা। কপাটের মতো চ্যাটালো বুক। মাথায় বেশ লম্বা।

হেসে উঠল ভন বর্ক।

ওদের ঠকানো এমন কিছু কঠিন নয়, ব্যারন। বড়ো সাদাসিদে, সরল। ঘোরপ্যাঁচ একদম বোঝে না।

তা অবশ্য বলতে পারব না, চিন্তাচ্ছন্ন সুরে বললেন ব্যারন। এদের ব্যাপারস্যাপার বড়ো অদ্ভুত–দেখে শেখার মতো। বাইরে থেকে গোবেচারা মনে হয় বটে কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই ফাঁদেই পড়তে হয় নতুন লোককে ঠকে যায় বাইরের সরল ব্যাপার দেখে। প্রথমটা দেখে মনে হয় না জানি কী নরম ধাত। তারপরেই আচমকা এমন একটা শক্ত জায়গায় হোঁচট খেতে হয় যে উচিৎ শিক্ষা দিয়ে ছাড়ে। এদের এই সনাতনী রূপটা দেখে ভুল ধারণা করা কিন্তু ঠিক নয়। যেমন ধরো, এদের সনাতনী কাষ্ঠলৌকিকতা। যত আড়ষ্টই হোক না কেন, অশ্রদ্ধা করা উচিত নয়।

তা আর বলতে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভন বক–যেন অভিজ্ঞতাটা তারও খুব কম নয়।

আমি নিজে একটা বিরাট ভুল করেছিলাম আমার অনেক সফল কীর্তি যখন তুমি জান, বিফল কীর্তিটাও জেনে রাখো। এদেশে এসেই নেমন্তন্ন পেলাম একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রীর বাগানবাড়িতে। কথাবার্তা হল অত্যন্ত অবিবেচকের মতো।

জানি। আমিও ছিলাম সেখানে, শুকনো গলায় বললেন ভন বর্ক।

রিপোর্ট পাঠালাম বার্লিনে। চ্যান্সেলর বড়ো কড়া লোক। এমন একটা মন্তব্য করলেন যে বুঝলাম তিনি ধরে ফেলেছেন আমি সব গুবলেট করে বসেছি। দু-দুটো বছর এই ভুলের মাশুল গুনতে হয়েছে। বাইরে থেকে যাঁকে খুব নরম ভেবেছিলাম, এই ঘটনার পর সেই

ইংরেজ গৃহস্বামীর অন্য মূর্তি দেখলাম–সে-মূর্তি আর যাই হোক নরম নয় মোটেই। আমার যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে, এখন তুমি এসেছ স্পোর্টসম্যানের ভেক নিয়ে।

ভেক বলছেন কেন–ভেক মানে তো মিথ্যে, নকল। আমি তা নই। স্পোর্টস আমার শিরায় উপশিরায়। সারাজীবন খেলাধুলা নিয়েই তো কাটালাম।

সেইজন্যেই অভিনয়টা আরও ভালো হচ্ছে–ওষুধ ধরছে–কাজ হচ্ছে। একই সঙ্গে নৌকা চালাও, শিকারে বেরোও, পোলো খেলো, সব খেলাতেই নেমে পড়, অলিম্পিয়ায় গিয়ে প্রাইজ পর্যন্ত নিয়ে আসো। শুনলাম ছোকরা অফিসারদের সঙ্গে বক্সিংও লড়ছ। ফলে নিজের মতো করেই তোমাকে নিয়েছে সবাই। খেলাধুলা-পাগল জার্মান হিসেবে খ্যাতির শ্রদ্ধা, সম্মান পেয়েছ সর্বত্র। নাইট ক্লাবে যাও, টেনে মদ খাও, শহর জুড়ে দাপিয়ে বেড়াও বেপরোয়া জীবনযাপন দেখে ওরা হাসে তোমাকে আরও কাছে টেনে নেয়। কেউ জানতেও পারে না, পাহাড়ের ওপর ছোট্ট এই বাড়িটায় ইংলন্ডের অর্ধেক দুষ্কর্মের ঘাঁটি আগলে বসে রয়েছ তুমি নাটের গুরু হয়ে কল্পনাও করতে পারে না জার্মান হয়েও খেলা-পাগল বলে যাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না তার চেয়ে স্টুদে গুপ্তচর সারাইংলন্ডে আর নেই। ভায়া ভন বর্ক–সত্যিই তুমি একটা জিনিয়াস!

খুব যে খোশামোদ করছেন দেখছি। তবে হ্যাঁ, এই চারটে বছর বৃথা কাটাইনি এদেশে। আমার ভাড়ার কখনো দেখাইনি আপনাকে আসুন না ভেতরে।

পড়ার ঘরে ঢুকল ভন বর্ক। আলো জ্বেলে জানলার পর্দা টেনে দিল ভালো করে। তারপর রোদে-পোড়া বাজপাখির মতো মুখ ঘুরিয়ে তাকাল বিরাটকায় ব্যারনের পানে।

বললে, গতকাল স্ত্রী কিছু জিনিসপত্র নিয়ে গেছে ফ্লাসিং-এ। তবে আসল কাগজপত্র আমার কাছে। দূতাবাস যেন আমাকে সাহায্য করে।

করবে। তোমার মালপত্র আগলাবার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। তবে আমাদের ইংলন্ড ছেড়ে যাওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না আমার। ফ্রান্সের কপালে যা আছে তা ঘটবেই—ইংলন্ড আটকাতে পারবে না। দু-দেশের মধ্যে সন্ধিপত্রও সই হয়নি।

বেলজিয়ামের কী হবে?

বেলজিয়ামকে ডুবতে হবে।

কিন্তু তা কী করে হয়? সন্ধিপত্র সই করা আছে যে। হেনস্থা সইবার পাত্র ওরা নয়।

কিছুদিনের জন্যে শান্তিতে থাকব–তারপর যা হবার তা হবে।

কিন্তু মাথা হেঁট হয়ে যাবে না?

আরে রাখো ওসব ঘেঁদো কথা! যুগটাই হল জনহিতকর ন্যায়সংগত মতবাদের যুগ। সম্মান শব্দটা সেকালে চলত এখন চলে না। তা ছাড়া, ইংলন্ড এখনও তৈরি নয়। খুবই অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি। টাইমস পত্রিকার প্রথম পাতায় যখন খবর বেরোল, আমরা বিশেষ যুদ্ধ কর বাবদ পাঁচ কোটি টাকা সংগ্রহ করছি–তখনই তো টনক নড়া উচিত ছিল কিন্তু ঘুম এখনও ভাঙেনি–অথচ সে-খরচটা আমার আসল মতলবের বিরাট বিজ্ঞাপন বললেই চলে। মাঝে মাঝে এক আধটা প্রশ্ন কানে আসে আমার কাজ মনের মতো জবাব বানিয়ে বলে যাওয়া। মাঝেমধ্যে কেউ খেপে যায়–আমি তাদের ঠান্ডা করি। এর বেশি আসল প্রস্তুতি কোথাও হচ্ছে না। সাবমেরিন আক্রমণ আটকানোর প্রস্তুতি, গোলাবারুদ গুদোমজাত করা, আরও বড়ো রকমের বিস্ফোরণ বানানো কোনো ব্যাপারেই এরা এক পাও এগোয়নি–বিশ্বাস করো, কোথাও কোনো প্রস্তুতি নেই। উলটে আমরাই আইরিশ গৃহযুদ্ধের মতো নানারকম সমস্যা সৃষ্টি করে এদের মন অন্যদিকে আটকে রেখেছি–প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা কারো খেয়ালই নেই!

কিন্তু খেয়াল করা তো দরকার–ভবিষ্যৎ নিয়ে সজাগ হওয়া দরকার।

সেটা ওদের ব্যাপার আমাদের নয়। ভবিষ্যতে আমরা কী করব ইংলন্ডকে নিয়ে, তা ঠিক করাই রয়েছে তোমার আনা খবর-টবরগুলো তখন কাজে লাগবে। সেটা আজকে কি কালকে–তা কিন্তু ঠিক করবেন জন বুল মশাই। উনি যদি মনে করেন টক্কর লাগুক আজকেই আমরা তৈরি। আর যদি লড়াই বাধাতে হয় দু-দিন পরে আমরা আরও একটু বেশি তৈরি হব–এই যা তফাত। আমার কী মনে হয় জান–একলা লড়বার সাহস ওদের হবে না–মিত্রপক্ষর সাহায্য নেবে। এই সপ্তাহেই বোঝা যাবে নিয়তি ওদের কোনদিকে

নিয়ে যায়। যাক সে-কথা, কাগজপত্র দেখাবে বলছিলে দেখাও। আর্মচেয়ারে বসে মৌজ করে চুরুট টানতে লাগলেন ব্যারন–আলোয় চিকমিক করতে লাগল চওড়া টাকখানা।

বইয়ের তাকের সামনে পর্দা ঝুলছিল। এককোণে ওককাঠের টানা লম্বা প্যানেল। পর্দা টেনে সরাল ভন বর্ক। দেখা গেল তামার পাত দিয়ে মজবুত একটা প্রকাণ্ড সিন্দুক। পকেট থেকে চাবি বার করে বেশ কিছুক্ষণ কসরত করবার পর তালা খুলে ভারী পাল্লা টেনে দু-হাট করল ভন বর্ক।

বলল, দেখুন।

খোলা সিন্দুকের গর্ভে আলো পড়ায় স্পষ্ট দেখা গেল সারি সারি অনেকগুলো খুপরি। প্রত্যেকটা খুপরিতে কাগজের লেবেল সাঁটা। লেবেলে লেখা—ফোর্ডস, বন্দর–প্রতিরক্ষা, এরোপ্লেন, আয়ারল্যান্ড, মিশর, পোর্টসমাউথ কেল্লা, চ্যানেল, রোসিথ ইত্যাদি। প্রত্যেকটা খুপরির মধ্যে থরে থরে সাজানো দলিল আর নকশা।

দারুণ! মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে মোটাসোটা দুই হাত এক করে আনন্দে উথলে উঠলেন ব্যারন।

আমার চার বছরের কাজ, ব্যারন। গাঁইয়া জমিদারের ছদ্মবেশে কাজটা খারাপ নয়, তাই না? মদ খাওয়া আর খেলাধুলো নিয়ে মেতে থেকেছি কিন্তু কাজও করেছি। তবে সব

সেরা বস্তুটি এখুনি এসে পৌঁছোবে, বলে একটা খুপরি দেখাল ভন বর্ক–খুপরির ওপরকার লেবেলে লেখা নৌদপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন।

কিন্তু এ-সম্বন্ধে কাগজপত্র সব খরচ তো তোমার নেওয়া হয়ে গেছে।

এখন তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে হবে। নৌবিভাগ কীভাবে জানি না সন্দেহ করেছিল খবর পাচার হচ্ছে রাতারাতি সব সাংকেতিক চিহ্ন পালটে দিয়েছে। এত বছর কাজ করছি শেষ মুহূর্তে এমন চোট কখনো খাইনি। তবে আমার এই চেকবুকের দৌলতে সে বাধাও পেরিয়েছি। আজ রাতেই আলটামন্ট আসছে সব খবর নিয়ে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠলেন ব্যারন।

আরে সর্বনাশ? এখুনি যেতে হবে আমাকে। কার্লটন টেরেসে এই মুহূর্তে এখন কী ঘটছে, তা তুমিও জান। কাজেই যে-যার ঘাঁটি আগলানো দরকার। আলটামন্ট কখন আসবে বলেছে?

একটা টেলিগ্রাম এগিয়ে দিল ভন বর্ক।

আজ রাতে–সঙ্গে আনবে নতুন স্পার্কিং প্লাগ।

স্পার্কিং প্লাগ?

আলটামন্ট মোটর এক্সপার্টের ভেক নিয়েছে। আমার গ্যারেজে গাড়িও তো অনেক। এক-একটা স্পেয়ার পার্টসের নামে পাঠায় এক-একটা গোপন খবর। র‍্যাডিয়েটর নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠালে বুঝে নিতে হবে যুদ্ধজাহাজের কথা বলছে, অয়েল পাম্প মানে ক্রুজার, এইরকম আর কি। স্পার্কিং প্লাগ মানে নৌ দপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন।

টেলিগ্রামটা নিজের মনেই পড়লেন সেক্রেটারি আজই আসছি পোর্টসমাউথ থেকে! ভালো কথা ওকে কত টাকা দিচ্ছ?

শুধু এই কাজের জন্যে পাঁচশো পাউন্ড–এ ছাড়াও মাস-মাইনে তো আছেই। টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতক হতে এদের আটকায় না। সব ভালো, কিন্তু এত টাকা শুষে নেয় যে বলবার নয়!

আলটামন্টকে টাকা দিয়ে আমি কিন্তু কখনো পস্তাইনি। একহাতে টাকা নেয়, আর এক হাতে কাজ দেয়। তা ছাড়া, ওকে বিশ্বাসঘাতক বলা যায় না। আইরিশ-আমেরিকানরা ইংলন্ডকে যতখানি ঘৃণা করে, ততখানি আমরা জার্মানরাও করি না।

তাই নাকি? আলটামন্ট আইরিশ-আমেরিকান?

কথা শুনলেই বুঝবেন। ওর সব কথা বুঝতেই পারি না–এমন উচ্চারণ। রাজার ইংরিজি আর ইংরেজ রাজা–এই দুইয়ের বিরুদ্ধেই যেন যুদ্ধঘোষণা করেছে একই সাথে। চললেন নাকি? আর একটু বসে গেলে দেখা হয়ে যেত।

না হে, এমনিতেই অনেকক্ষণ আছি–আর নয়। কাল সকালে তোমার আশায় থাকব। নৌ দপ্তরের সাংকেতিক চিহ্ন তোমার হাতে এলেই ইংলন্ডের সব খবর নেওয়া শেষ হল বুঝব। আরে! টোকে নাকি! ধুলোঢাকা একটা বোতল দেখিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন ব্যারন।

দেব এক গেলাস?

আর না? কিন্তু খুব হইহল্লা হবে মনে হচ্ছে!

মদ জিনিসটা আলামন্টের খুব পছন্দ–ভালো জিনিস পেলে তারিফ করতে জানে। টোকে ওর মনে ধরেছে। ছোটোখাটো ব্যাপারেও ত্রুটি থাকলে ওর আবার আঁতে লেগে যায়–তাই বোতলটা তৈরি রেখেছি।

কথা বলতে বলতে দুই মূর্তি বেরিয়ে এল উঠোনে। অদূরে দাঁড়িয়ে সুবিশাল গাড়িটা। ব্যারনের ড্রাইভারের আঙুলের ছোঁয়ায় চাপা শব্দে গর্জে উঠল ইঞ্জিন।

কোটটা গায়ে দিয়ে ব্যারন বললেন, চারদিক কী শান্ত, কী সুন্দর। কয়েক হপ্তার মধ্যেই ছুটে যাবে এই শান্তি–ইংলন্ডের উপকূল বরাবর আগুন জ্বালিয়ে ছাড়ব আমরা। শুধু সমুদ্র কেন, আকাশেও আগুন জ্বলবে যদি জেপেলিন বাহিনী ঠিকমতো ভেলকি দেখাতে পারে। আরে বুড়িটা কে?

একটিমাত্র জানলায় আলো জ্বলছে পেছনে। একটা ল্যাম্প। ল্যাম্পের সামনে টেবিলে বসে গাঁইয়া টুপি মাথায় লালমুখো এক বুড়ি। হেঁট হয়ে উল বুনছে, আর মাঝে মাঝে পাশের টুলে বসা একটা বিরাট কালো বেড়ালের মাথায় হাত বুলোচ্ছে।

মার্থা–আমার ঝি। আর সবাইকে ছেড়ে দিয়েছি শুধু ওকে রেখেছি।

নীরস হাসি হাসলেন সেক্রেটারি।

শান্ত ইংলন্ডের মূর্ত প্রতীক ওই বুড়ি। নিশ্চিন্তভাবে বসে দিন কাটাচ্ছে পরম আরামে। জানেও না কী ঘটতে চলেছে আর কয়েক হপ্তার মধ্যে। ঠিক আছে, ভন বর্ক। চললাম! হাত নেড়ে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন ব্যারন। একজোড়া হেডলাইটের জোরালো আলো অন্ধকার ছিঁড়েখুঁড়ে ধেয়ে গেল সামনে। ধাবমান গাড়ির পেছনে নরম কুশনে হৃষ্টচিত্তে বসে সুখকর চিন্তায় নিমগ্ন থাকার দরুন ব্যারন মশায় খেয়াল করলেন না গাঁয়ের রাস্তার মোড় ফেরার সময়ে উলটো দিক থেকে একটা ছোট্ট ফোর্ড গাড়ি বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে।

মোটর ল্যাম্পের শেষ দীপ্তি বহুদূর মিলিয়ে যেতেই ধীরপদে পড়ার ঘরে ফিরে এল ভন বর্ক। যাওয়ার সময়ে দেখল বুড়ি ঝি ল্যাম্প নিভিয়ে শুতে গিয়েছে। এতবড়ো নিঝুম বাড়িতে এভাবে একলা কখনো থাকেনি ভন বক–এতদিন বাড়ি গমগম করত লোকজন থাকায়। একদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গিয়েছে নিরাপদ জায়গায় পাচার করা গিয়েছে ফ্যামিলির প্রত্যেককে। বিরাট এই বাড়ির রান্নাঘরে ওই এক বুড়ি ছাড়া কেউ আর নেই! যাওয়ার আগে পড়ার ঘরে বেশ কিছু জিনিস সাফ করতে হবে। সেই কাজেই ডুবে গেল ভন বর্ক। কাগজ পোড়াতে পোড়াতে আগুনের তাতে লাল হয়ে গেল সুশ্রী শানিত মুখটা। সিন্দুক থেকে মহামূল্যবান দলিল আর নকশা নামিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগে থরে থরে সাজাতে লাগল। আচমকা কানে ভেসে এল দূরায়ত মোটর ইঞ্জিনের আওয়াজ। সোল্লাসে চেঁচিয়ে লাফিয়ে উঠল ভন বর্ক। চামড়ার ব্যাগ বন্ধ করল, সিন্দুকের পাল্লায় তালা দিল। বেরিয়ে এল বাইরে। ঠিক সেই সময়ে অদূরে এসে দাঁড়াল একটা ছোট্ট গাড়ি। লাফিয়ে নামল এক চটপটে ব্যক্তি। ইঞ্জিন বন্ধ করে হেলান দিয়ে বসল ড্রাইভার ভারী চেহারা লোকটার, বয়স্ক, ধূসর গোঁফ ঝুলছে নাকের নীচে। এমনভাবে বসল গা এলিয়ে যেন বসতে হবে অনেকক্ষণ।

দৌড়ে গিয়ে ভন বর্ক বললে, এনেছেন?

ব্রাউন পেপারে মোড়া একটা প্যাকেট বিজয়-গৌরবে মাথার ওপর তুলে ধরল দর্শনার্থী লোকটা।

বলল, সব নিশানা এর মধ্যে।

সিগন্যাল তো?

সমস্ত–যতরকম সংকেত আছে নৌদপ্তরে–সমস্ত। ল্যাম্পের গুপ্ত সংকেত, দূরে সংকেত জানানোর যন্ত্র, মার্কনি বেতার সংকেত–সমস্ত। কপি করে এনেছি কিন্তু মূল দলিল আনা খুবই বিপজ্জনক।বলেই সশব্দে চাষাড়ে ভঙ্গিমায় পিঠ চাপড়ে দিল ভন বর্কের। চোখ টিপে সহ্য করল ভন বর্ক।

বলল, ভেতরে আসুন। কেউ নেই বাড়িতে আমি একা। কপি করে এনে ভালোই করেছেন–আসলের চাইতে ভালো। আসলটা খোয়া গেছে জানাজানি হয়ে গেলে সমস্ত পালটে নতুন করে করতে পারে। কপিটা ঠিকমতো হলেই হল।

ভেতরে এসে আর্মচেয়ারে লম্বা হাত-পা ছড়িয়ে বসল আইরিশ আমেরিকান আগন্তুক। লোকটা তালট্যাঙা। কৃশ। বয়স প্রায় ষাট, চোখ-মুখ ধারালো, ছাগুলে দাড়ির জন্যে আঙ্কল স্যামের কৌতুকচিত্রের মতো দেখতে লাগছে। ঠোঁটের কোণ থেকে ঝুলছে একটা আধপোড়া থুথুভেজা চুরুট। দেশলাই ধরিয়ে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল চেয়ারে বসবার পর। চারদিক দেখে নিয়ে বললে, ওড়বার মতলবে আছেন দেখছি। সিন্দুকের ওপর চোখ পড়তেই চমকে উঠে বললে, আরে সর্বনাশ, কাগজপত্র ওর মধ্যে রাখেন নাকি?

রাখলে ক্ষতি কী?

আরে, এ-রকম খোলাখুলিভাবে রাখেন এত গোপন কাগজপত্র! আপনি না স্পাই? টিন কাটা যন্ত্র দিয়ে যেকোনো ইয়াঙ্কি বদমাশ চক্ষের নিমেষে কেটে খুলে ফেলবে ওই সিন্দুক। ওর মধ্যে আমার চিঠি রাখেন জানতে পারলে একটা চিঠিও আপনাকে লিখতাম ভেবেছেন?

ও-সিন্দুক কাটবার ক্ষমতা কোনো চোর বদমাশের নেই কোনো যন্ত্র দিয়ে এ-সিন্দুকের ধাতু কাটা যায় না।

কিন্তু তালাটা?

ডবল কম্বিনেশন তালা। মানেটা বুঝেছেন নিশ্চয়?

খুলে বলুন।

প্রথমে একটা শব্দ আর কয়েকটা সংখ্যা দরকার হবে। নইলে তালা খুলবে না।উঠে দাঁড়াল ভন বর্ক। চাবির ফোকরের চারধারে বেড় দেওয়া দুটো চাকতি দেখাল। বাইরের চাকতিটা শব্দের অক্ষরের, ভেতরেরটা সংখ্যার।

চমৎকার!

তাই বলছিলাম, যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। চার বছর আগে বানিয়েছিলাম এই সিন্দুক। জানেন তখন কী শব্দ আর কী সংখ্যা রেখেছিলাম?

কী করে বলব বলুন।

অগাস্ট আর ১৯১৪।

বিস্ময় আর প্রশংসা যুগপৎ ফুটে ওঠে আমেরিকান ভদ্রলোকের চোখে-মুখে।

দারুণ ব্যাপার করেছেন দেখছি! এক্কেবারে নিখুঁত।

তারিখটা পর্যন্ত আমাদের কেউ কেউ আঁচ করে নিতে পারবে। কাল সকালেই লম্বা দিচ্ছি দলিল দস্তাবেজ নিয়ে।

আমিও সরে পড়ব হপ্তাখানেকের মধ্যে। একলা এদেশে থেকে মরব নাকি? সাগর পার থেকে দেখব কীভাবে ল্যাংচায় বেটা জন বুল।

আপনি পালাতে যাবেন কেন? আপনি তো আমেরিকার নাগরিক।

ব্রিটিশ আইনে আমেরিকান নাগরিক হলেই যে সাতখুন মাপ হয়ে যাবে, তার কোনো মানে নেই। যেদেশে যে নিয়ম–অপরাধ করলে শাস্তি পেতেই হবে। যেমন পাচ্ছে জ্যাক

জেমস পচে মরছে পোর্টল্যান্ড জেলে। ভালো কথা, আপনারা কিন্তু নিজের লোকদের বিপদ থেকে মোটেই বাঁচান না।

কী বলতে চান? তেড়ে ওঠে ভন বর্ক।

আপনার হয়ে যারা কাজ করেছে তাদের বিপদে-আপদে রক্ষা করা আপনাদের কর্তব্য। কিন্তু আপনারা পিছলে বেরিয়ে যান। যেমন ধরুন জেমস

জেমস মরেছে নিজের দোষে। আপনি তা জানেন। নিজের মতে চলতে গেলে অমন হবেই।

জেমস না হয় মাথামোটা। কিন্তু হোলিসকে বাঁচালেন না কেন?

ও তো একটা পাগল!

সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত একনাগাড়ে অভিনয় করলে আর অষ্টপ্রহর শ-খানেক পুলিশচর লেগে থাকলে পাগল প্রত্যেকেই হয়। কিন্তু স্টিনারের কেসটা—

চমকে ওঠেন ভন বর্ক, কী হয়েছে স্টিনারের?

ধরা পড়েছে। কাল রাতে দোকানে হানা দিয়েছিল পুলিশ। কাগজপত্র সমেত স্টিনার এখন পোর্টল্যান্ডে। ফাঁসির দড়ি এড়াতে পারবে কি না সন্দেহ। এইসব কারণেই আমি সাগরপারে যেতে চাই যত তাড়াতাড়ি পারি।

ভন বর্কের মনের জোর নেহাত কম নয়। নিজেকে সামলাতে সে জানে। কিন্তু খবরটায় বিলক্ষণ বিচলিত হয়েছে দেখা গেল–ফ্যাকাশে হয়ে গেল লালচে মুখ।

বিড়বিড় করে বললে, স্টিনারকে ওরা পাকড়াও করল কী করে?

আমি বেঁচে গেছি অল্পের জন্যে।

কী বলতে চান?

বাড়িউলির কাছে আমার খোঁজ নিতে এসেছিল একজন। শুনেই বুঝেছি এবার আমার পালা। এত তাড়াহুড়ো করছি সেই কারণেই। কিন্তু পুলিশ এত খবর পাচ্ছে কী করে? স্টিনারকে নিয়ে পাঁচ জনকে ওরা ধরল–ষষ্ঠজন কে হবে আঁচ করতে পেরেই আমি সটকান দেব ঠিক করেছি। কিন্তু আপনার হয়ে যারা খাটছে, একে-একে তারা ধরা পড়ছে কেন? কীভাবে?

মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেল ভন বর্কের।

আপনার সাহস তো কম নয়!

মিস্টার, সাহস আছে বলেই আপনার সেবা করতে এসেছি–নইলে আমাকে পেতেন না। যা বলব মুখের ওপর বলব। শুনেছি আপনারা জার্মানরা কাজ মিটে গেলেই ছেড়া ন্যাকড়ার মতো ফেলে দেন কাজের লোককে।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ভন বর্ক।

তার মানে আপনি বলতে চান আমিই ধরিয়ে দিয়েছি আমার এজেন্টদের?

আমি তা বলতে চাই না। তবে কোথাও কেউ কলকাঠি নাড়ছে। সেইজন্যেই হল্যান্ডে না-যাওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।

রাগ সামলে নিল ভন বর্ক।

অ্যাদ্দিন একসঙ্গে কাজ করার পর শেষকালে আর ঝগড়া করতে চাই না। আপনি হল্যান্ডে যান রাটারডাম থেকে জাহাজে নিউইয়র্ক চলে যান। এক সপ্তাহ পর থেকে আর কোনো জাহাজ লাইন নিরাপদ থাকবে না। বইটা দিন–প্যাক করে ফেলি।

হাতের পার্সেলটা হাতেই রেখে দিল আমেরিকান বাড়িয়ে দিল না ভন বর্কের দিকে।

টাকাটা?

আবার কীসের টাকা?

আরও পাঁচশো পাউন্ড বাড়তি খরচ করতে হয়েছে। সেটা এখুনি দিতে হবে।

তেঁতো হেসে ভন বর্ক বললে, আপনি আমাকে অসম্মান করছেন। বই দেওয়ার আগেই টাকা চাইছেন।

কারবার করতে এসে অত ভাবলে চলে না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে, টেবিলে গিয়ে বসল ভন বর্ক। খসখস করে লিখল একটা চেক। চেক রাখল টেবিলের ওপর। ঘাড় ফিরিয়ে বললে, আমাদের সম্পর্কটা যখন অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে শেষ হতে চলেছে, তখন চেক নেওয়ার আগে বইটা আমাকে দেখাবেন।

নিরুত্তরে প্যাকেট এগিয়ে দিল আমেরিকান। মোড়ক খুলে স্তম্ভিত চোখে নীলরঙের ছোট্ট বইটার দিকে চেয়ে রইল ভন বর্ক। মলাটে লেখা মৌ-চাষের হাতেকলমে বিদ্যে। জ্বলন্ত চোখ তোলবার আগেই পেছন থেকে সাঁড়াশির মতো কয়েকটা আঙুল চেপে বসল গলার ওপর এবং ক্লোরোফর্ম ভিজোননা তুলো এসে পড়ল নাকের ওপর।

ওয়াটসন, নাও আর এক গেলাস!ইম্পিরিয়েল টোকের বোতল বাড়িয়ে দিয়ে বলল শার্লক হোমস।

টেবিলের পাশে আসীন হৃষ্টপুষ্ট ড্রাইভার সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল বোতলটার দিকে।

খাসা মদ, হোমস।

অত্যাশ্চর্য বলতে পার। সোফায় শুয়ে ওই যে ঘুমোচ্ছে আমাদের প্রাণের বন্ধুটি, ওর মুখেই শুনেছি, সসানবার্ন প্যালেসের বিশেষ মদের কুঠরি থেকে আনা হয়েছে এই বোতল। জানলাটা খুলে দাও–ক্লোরোফর্মের গন্ধে মনের মেজাজ চলে যায়।

সিন্দুকের পাল্লা দু-হাট করে খুলে দাঁড়িয়ে আছে শার্লক হোমস। ভেতর থেকে নামাচ্ছে গুপ্ত দলিল আর নকশা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে সাজিয়ে রাখছে ভন বর্কের চমড়ার ব্যাগে। সোফায় শুয়ে নাক ডাকছে জার্মান গুপ্তচর হাত আর পা চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা।

তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, ওয়াটসন। কেউ নেই বাড়িতে মার্থা ছাড়া। ওর সাহায্য–পেলে এত সহজে কিস্তিমাত করতে পারতাম না। ঘণ্টা বাজাও–মার্থা আসবে। ওই তো এসে গেছে!

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে সেই বৃদ্ধা পরিচারিকা–মুখে মৃদু হাসি। সোফায় শায়িত জার্মানকে দেখে ঈষৎ উদবিগ্ন হয়েছে মনে হল।

হোমস বললে, ঘাবড়াও মাৎ, মার্থা। চোট লাগেনি ঘুমোচ্ছে।

বাঁচলাম। মনিব হিসেবে ভদ্রলোক খুব ভালো। উনি চেয়েছিলেন গতকাল ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে জার্মানি চলে যাই–তাতে আপনার প্ল্যান ভণ্ডুল হয়ে যেত, তাই না?

ঠিক কথা। তুমি এখানে ছিলে বলেই তো এত নিশ্চিন্ত ছিলাম আমি। আজ রাতে অবশ্য তোমার সিগন্যালের জন্যে অনেকক্ষণ দাঁড়াতে হয়েছে।

কী করি বলুন। সেক্রেটারি না-যাওয়া পর্যন্ত সিগন্যাল দিতে পারিনি!

জানি, জানি, আমাদের পাশ দিয়েই গাড়ি নিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

যেতে কি আর চায়, খুব চিন্তায় পড়েছিলাম।

তোমার ল্যাম্প নিভতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। কালকে ক্ল্যারিজ হোটেলে দেখা করো, কেমন?

ঠিক আছে স্যার।

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা আছে তো?

আছে। আজ উনি সাতটা চিঠি লিখেছেন। একই ঠিকানায়।

কাল সকালে দেখবখন। গুড নাইট, বিদেয় হল মার্থা। ওয়াটসনকে বললে হোমস, এ-কাগজগুলো খুব একটা কাজে লাগবে না–বেশির ভাগ খবরই জার্মানিতে পৌঁছে গেছে। কিন্তু এই মূল দলিলগুলো দেশের বাইরে যেতে দেব না।

অন্য কাগজগুলো তাহলে আর কাজে লাগবে না?

এর বেশির ভাগ আমিই পাঠিয়েছিলাম। ঠিক যেখানে যেখানে জলে মাইন ডোবানো আছে, সেই সেই জায়গা দিয়ে জার্মান জাহাজ যখন যাবে আমার পাঠানো নকশা অনুযায়ী, তখন যে-কাণ্ডটা ঘটবে, তা দেখে শেষ জীবনটা আমার ভালোভাবেই কাটবে ওয়াটসন। কিন্তু তোমাকে তো এখনও ভালো করে আলোয় দেখিনি। এতগুলো বছর কাটল কীরকম বল? ঠিক আগের মতোই ছোকরা আছ দেখছি।

বিশ বছর বয়স কমে গেছে হোমস তোমার টেলিগ্রাম পেয়ে। সঙ্গেসঙ্গে হাজির হয়েছি হারউইচে গাড়ি নিয়ে। তুমিও খুব একটা পালটাওনি–বিকট ওই ছাগুলে দাড়িটাই কেবল চোখে লাগছে।

কাল থেকে এ-দাড়ি একটা বিকট স্মৃতি হয়েই থাকবে, ওয়াটসন। দেশের জন্যে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করতে হয়–দাড়িটা তার মধ্যে একটা। ক্ল্যারিজ হোটেলে দাড়ি কামিয়ে চুল কেটে ঠিক আগের চেহারায় ফিরে যাব ঠিকই কিন্তু আমেরিকান বুকনি রপ্ত করতে গিয়ে আমার চোস্ত ইংরিজিটাকে জন্মের মতো জখম করে ফেলেছি মনে হচ্ছে।

কিন্তু তুমি তো শুনেছিলাম অবসর নিয়েছ। মৌমাছির চাষ আর বই লেখা নিয়ে সাউথ ডাউন্সে সন্ন্যাসীর মতো দিন কাটাচ্ছ।

শুনেছ ঠিকই ওয়াটসন। এই তো আমার পরবর্তী জীবনের পরিশ্রমের ফল! টেবিল থেকে বইটা তুলে নিয়ে পুরো নামটা পড়ে শোনাল হোমস। মৌ-চাষের হাতেকলমে বিদ্যে–বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রানি মক্ষিকাকে পর্যবেক্ষণ। একাই করেছি ওয়াটসন। দিনরাত একনাগাড়ে মেহনতি দলবলের ওপর চোখ রাখতে গিয়ে মনে হয়েছে যেন লন্ডনের ক্রিমিনাল দুনিয়ার ওপর নজর রাখছি।

কিন্তু ফের কাজে নামলে কেন?

সে এক কাহিনি। বৈদেশিক মন্ত্রী পর্যন্ত ঠেকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু যখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এই দীনের কুটিরে পায়ের ধুলো দিলেন–। ওয়াটসন, অত্যন্ত ভালো মানুষ সেজে অনেক দিন ধরে দেশের সর্বনাশ করে ছাড়ছিল সোফায় শোয়া এই লোকটা। দীর্ঘদিন ধরে লটঘট ব্যাপার চলছে, বিস্তর স্পাই ধরা পড়ছে, কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল মধ্যমণির নাগাল ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। আমার ওপর বেজায় চাপ পড়ল পালের গোদাকে খুঁজে

বার করার জন্যে। দুবছর সেই খোঁজেই কাটিয়েছি ওয়াটসন, সময়টা খুব খারাপ কাটেনি–প্রতি মুহূর্তে পেয়েছি আশ্চর্য উত্তেজনা। হাতেখড়ি হল শিকাগোতে, বাফেলোর আইরিশ গুপ্ত সমিতি থেকে বেরিয়ে পাক্কা গুপ্তচরের শিক্ষা নিয়ে, স্কিবেরিনের পুলিশ মহল নাকের জলে চোখের জলে হল আমার জ্বালায় ফলে চোখে পড়লাম ভন বর্কের এক স্যাঙাতের। তার সুপারিশ নিয়ে এলাম পালের গোদার কাছে সেই থেকেই ভন বর্ককে গোপন খবর জুগিয়ে আসছি আমি। ফলে, ওদের, সব প্ল্যান ভন্ডুল হয়েছে পাঁচজন সেরা স্পাই জেলে পচছে। পাঁচজনের কাজ কারবার লক্ষ করতাম–সময় হলেই টুপ করে জেলে ঢুকিয়ে দিতাম। মশায়, আপনাকেও সেই দলে ঢুকতে হবে!

শেষ কথাটা বলা হল ভন বর্ককে। চুপচাপ শুয়ে চোখ পিটপিট করতে হোমসের কথা শুনছিল এতক্ষণ। জার্মান গালাগালির ফুলঝুরি ঝরতে লাগল এখন রাগের চোটে বেঁকে গেল মুখখানা। কান দিল না হোমস, চটপট চোখ বুলিয়ে নিতে লাগল দলিল দস্তাবেজের ওপর।

কিছুক্ষণ পরেই দম ফুরিয়ে গেল ভন বর্কের। হোমস বললে, জার্মান ভাষাটা কাঠখোট্টা হলে কী হবে, মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত। আরে! আরে! আর একটা বড়ো পাখিকে পাওয়া গেছে। অনেক দিন ধরে চোখ রেখেছিলাম এর ওপরে–কিন্তু এত বড়ো রাসকেল জানা ছিল না তো! সিন্দুকের কোণে খরখরে চোখে তাকিয়ে হোমস ফেটে পড়ল প্রচণ্ড উল্লাসে। মিস্টার ভন বর্ক, তোমাকে অনেক কিছুর জন্যেই জবাবদিহি করতে হবে দেখছি।

অতি কষ্টে সোফার ওপর বসে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে হোমসের পানে চেয়েছিল ভন বর্ক। এবার ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠে বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, অ্যালটামন্ট, এ-জীবনে তোমার রেহাই নেই!

এর আগেও ও-হুমকি অনেকবার শুনেছি। প্রফেসর মরিয়ার্টি শুনিয়েছে জীবদ্দশায়, শুনেছি কর্নেল সিবাসটিয়ান মোরানের মুখেও। কিন্তু এখনও বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি সাউথ ডাউন্সে মৌমাছিদের নিয়ে।

বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! জ্বলন্ত চোখে বাঁধন ছেড়ার চেষ্টা করতে করতে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল ভন বর্ক।

আরে ছ্যাঃ! অতটা বদ আমি নই। আমার কথা শুনে বুঝছ না কেন শিকাগোর অ্যালামন্ট কাজ শেষ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

কে তুমি?

জেনে আর লাভ আছে কী? তাহলেও তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করব। মিস্টার ভন বর্ক, তোমার দেশের লোক এর আগেও আমার নাম শুনেছে–তুমিও শুনে থাকতে পারো।

তোমার খুড়তুতো ভাই যখন রাজদূত, তখন আইরিন অ্যাডলার আর বোহেমিয়ার পরলোকগত রাজার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম আমিই। আমি না-থাকলে নিহিলিস্ট

কোপম্যানের হাতে নির্ঘাত খুন হয়ে যেতেন তোমার বড়োমামা কাউন্ট গ্রায়েন্সটাইন। আমার

জন্যেই–

সবিস্ময়ে সোজা হয়ে বসল ভন বর্ক।

সে-লোক তো একজনই আছে পৃথিবীতে!

হ্যাঁ, আমিই সেই লোক!

গুঙিয়ে উঠে সোফায় এলিয়ে পড়ল ভন বর্ক।

যা কিছু খবর জার্মানিতে পাঠিয়েছি, সমস্ত এসেছে আপনার মারফত! কী দাম সেই খবরের বলতে পারেন? এ আমি কী করলাম? নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলাম।

খুবই খারাপ কাজ করেছ। তোমার দেশ দু-দিন পরেই টের পাবে ফলটা। দেখবে এদেশের কামান বন্দুককে যতটা খাটো মনে করা হয়েছিল–তার চাইতে ঢের বেশি লম্বা। যুদ্ধজাহাজগুলোও এত জোর ছুটবে যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

নিঃসীম হতাশায় দু-হাতে নিজের টুঁটি টিপে ধরল ভন বর্ক।

হোমস বলল, আরও অনেক ব্যাপার শিগগিরই জানবে তোমার দেশের জন্যে আমি খেটেছি আমার দেশের জন্যে। অন্যায় কিছু কি? তুমি বেশি চালাকি করতে গিয়েছিলে বলেই নিজের জালে জড়িয়ে পড়েছ। ওয়াটসন, কাগজপত্র নেওয়া হয়ে গেছে। হাত লাগাও, কয়েদিকে নিয়ে লন্ডনে রওনা হওয়া যাক।

ভন বককে টেনে তুলতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল দুজনে। একে শক্তিমান, তায় বেপরোয়া। শেষকালে দু-দিক থেকে ধরে একরকম টেনে হিঁচড়েই রাস্তা দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হল গাড়ির পেছনের সিটে। কয়েক ঘণ্টা আগে এই রাস্তাতেই কিন্তু ভন বর্কের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন সুবিখ্যাত কূটনীতিবিদ ভদ্রলোক।

হোমস বললে, যদি অনুমতি দাও তো একটা চুরুট ধরিয়ে তোমার মুখে গুঁজে দিতে পারি।

আপ্যায়নটা পছন্দ হল না ভন বর্কের।

রক্তচোখে বললে, মিস্টার শার্লক হোমস আপনার এই কাজটা কিন্তু জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ করার শামিল আশা করি আপনার সরকার তা বুঝবে?

এই ব্যাগে যা নিয়ে যাচ্ছিলে, সেটাও তাই, বললে হোমস। তোমার দেশ নিশ্চয় তা বুঝবে।

আমাকে গ্রেপ্তার করার শমন আপনার নেই। আপনি সরকারি পুলিশ নন। কাজটা বেআইনি। বলা বাহুল্য। জার্মানকে কিডন্যাপ করার ফল কিন্তু সাংঘাতিক হবে। সেইসঙ্গে তার কাগজপত্র চুরি করার শাস্তি পেতে হবে! তাহলে যদি এখন গলা ফাটিয়ে চেঁচাই, আপনাদের দুজনের কী হাল হবে বুঝতে পারছেন?

ওহে ভন বর্ক, বোকামি করতে যেয়ো না। ইংরেজদের তুমি এখনও চেনো না। ছোট্ট এই গাঁয়ের লোক তোমার ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেবে যদি চেঁচাতে যাও। এরা কীরকম খেপে আছে জান না বলেই সাবধান করে দিলাম। চুপচাপ চলে এসো স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। ওয়াটসন, লন্ডনে গিয়ে তুমি রুগি দেখতে যাবে২৫–আর দেখা হবে না, তাই এসো শান্তিতে শেষ বারের মতো দুটো কথা বলে নিই।

দুই বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করল মিনিট কয়েক। গাড়ির মধ্যে ছটফট করতে লাগল জার্মান গুপ্তচর। গাড়ির দিকে পা বাড়ালে হোমস। আঙুল তুলে দেখাল চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের দিকে।

চিন্তাচ্ছন্নভাবে বললে, ওয়াটসন, পুবের ঝড় আসছে।

আরে না। বেশ তো গরম বাতাস বইছে।

সেই আগের মতোই রয়ে গেলে ওয়াটসন, একটুও পালটালে না। ঝড় কিন্তু আসছে। এ-রকম ঝড় এর আগে ইংলন্ডের ওপর কখনো বয়নি। হিমেল ঝড় আসবার আগেই আমাদের মতো অনেককেই বিদেয় নিতে হবে ধরাধাম থেকে২৬। স্বয়ং ঈশ্বর যে-ঝড় আনছেন তা আসবেই। ঝড় চলে গেলে আবার রোদ উঠবে, আরও বলিষ্ঠ, আরও পরিচ্ছন্ন, আরও ভালো ইংলন্ড জেগে উঠবে। চালাও, ওয়াটসন, সময় হয়েছে এবার রওনা হওয়া যাক। পাঁচশো পাউন্ডের চেকটা ঝটপট ভাঙাতে হবে–নইলে চেক যে দিয়েছে, ব্যাঙ্ককে সে বারণ করে দিতে পারে।

———-

টীকা

বিদায় নিলেন শার্লক হোমস : স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর ১৯১৭ সংখ্যায় এবং কেলিয়ার্স উইকলির ২২ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ তারিখের সংখ্যায় হিজ লাস্ট বাও প্রথম প্রকাশিত হয়।

শার্লক হোমস নাটকের শেষ অঙ্ক : অ্যান এপিলোগ অব শার্লক হোমস নামের এই সাব-টাইটেলের বদলে স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে লেখা হয়েছিল দ্য ওয়ার-সার্ভিস অব শার্লক হোমস।

কালান্তক অগাস্ট : ১৯১৪-র অগাস্ট মাসেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এক তারিখে এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিন তারিখে। তার ঠিক পরদিন, চার তারিখে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে গ্রেট ব্রিটেন। এরপর সারা মাস বিভিন্ন দেশ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে আরম্ভ করে।

কাইজার : ওই সময়ে জার্মানির সম্রাট বা কাইজার ছিলেন ফ্রিডরিশ উইলহেলম ভিক্টর অ্যালবার্ট (১৮৫৯-১৯৪১) বা দ্বিতীয় উইলিয়াম। দ্য সেকেন্ড স্টেন গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

বেঞ্জগাড়ি : জার্মান ইঞ্জিনিয়ার কার্ল বেঞ্জ-এর নকশায় নির্মিত মোটরগাড়ি। এই সংস্থার পত্তন হয় ১৮৮৬ সালে। পরে ডেইমলার কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১৯২৬-এ শুরু হয় মার্সিডিজ-বেঞ্জ নামক গাড়ির নির্মাণ।

চ্যান্সেলর : ১৯০৯ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন থিওবোল্ড ফন বেথম্যান-হললায়েগ (১৮৫৬-১৯২১)। অলিম্পিয়া : লন্ডনের কেনসিংটন অঞ্চলে অবস্থিত অলিম্পিয়া অ্যাম্পিথিয়েটারে নানারকম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সার্কাস, রোলার স্কেটিং, সংগীতানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। এখানে প্রায় দশ হাজার দর্শকের বসবার ব্যবস্থা ছিল।

ফ্লাসিং : ওলন্দাজ উচ্চারণে ব্লিসিজেন বা ফ্লাসিং হল্যান্ডের ভিল্যান্ড রাজ্যের অন্তর্গত ওয়ালসেরেন দ্বীপের দক্ষিণ তটে অবস্থিত শহর। নেপোলিয়নের সময়ে এই শহর ব্যবহৃত হয়েছিল নৌ-ঘাঁটি হিসেবে।

আইরিশ গৃহযুদ্ধ : আয়ারল্যান্ডের স্বাধীনতার যুদ্ধ। ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের কারণে আয়ারল্যান্ড সংক্রান্ত আইন পাশ করতে পারেনি বা করেনি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। সেই সময়ে আয়ারল্যান্ডের আলস্টার শহরে এবং অন্যত্র প্রবল আন্দোলন চলে আয়ারল্যান্ডের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে।

জন বুল মশাই : ভারতবর্ষের মানবরূপ যেমন ভারতমাতা, ব্রিটেনের তেমন হল জন বুল। মাঝবয়সি এবং ভারিক্কি চেহারার জন বুলকে প্রায়শই দেখা যায় ব্রিটেনের জাতীয় পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক দিয়ে তৈরি ওয়েস্টকোট পরিহিত অবস্থায়।

পোর্টসমাউথ কেল্লা : ইংলন্ডের প্রধান নৌঘাঁটি পোর্টসমাউথ। রোসিথ : স্কটল্যান্ডের ফার্থ বা ফোর্থ নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি। এডিনবরা শহরের সামান্য পশ্চিমে এর অবস্থান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এখানে জাহাজ সারানোর কারখানা নির্মিত হয়।

কার্লটন টেরেস : ওই বিশেষ সময়ে লন্ডনে জার্মানির রাষ্ট্রদূতের অফিসের ঠিকানা ছিল ৯, কার্লটন হাউস টেরেস।

টোকে : হাঙ্গেরির টোকে বা টোকায় (Tokaj) শহর-সন্নিহিত এলাকায়, কার্পাথিয়ান পর্বতমালার পাদদেশে তৈরি মদ।

জেপেলিন : জার্মান মিলিটারি অফিসার ফার্দিনান্দ ফন জেপেলিন (১৮৩৮-১৯১৭) সৈনিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজেকে নিযুক্ত করেন মোটরচালিত উড়োজাহাজ নির্মাণে। ১৯০৬ সালে জার্মানির ফ্রিডরিশ্যাফেনে প্রতিষ্ঠিত হয় জেপেলিন ফাউন্ডেশন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনী এক-শোর কিছু বেশি সংখ্যক জেপেলিন যুদ্ধে ব্যবহার করে।

ফোর্ড গাড়ি : হেনরি ফোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থা ফোর্ড মোটর কোম্পানি সংগঠিত হয় ১৯০৩-এর ১৬ জুন। তাদের তৈরি ছোটো গাড়ি আমেরিকা এবং ইংলন্ডে দারুণভাবে জনপ্রিয় হয় বাজারে আসবার সঙ্গেসঙ্গে।

মার্কনি : ইতালিয় পদার্থবিদ গুগলিয়েমমা মার্কনির বেতার সংকেত প্রেরণ করবার আগে অন্য কয়েকজন বিজ্ঞানী, যেমন জগদীশচন্দ্র বসু, তা করে থাকলেও আধুনিক রেডিয়োর জনক হিসাবে মার্কনিকেই চিহ্নিত করা হয়। মার্কনি এই কীর্তির পেটেন্ট গ্রহণ করেন ১৮৯৪ সালে এবং ১৮৯৭-এ নিজের ভাইয়ের আর্থিক সহায়তায় প্রতিষ্ঠা করেন ওয়্যারলেস টেলিগ্রাফ অ্যান্ড সিগন্যাল কোং লিমিটেডের। ১৯০৯ সালে তিনি নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

পোর্টল্যান্ড জেল : ইংলন্ডের ডেভনশায়ারের সমুদ্রতটের একটি উপদ্বীপ, আইল অব পোর্টল্যান্ড-এ ছিল ষোলোশো কয়েদি রাখবার মতো কারাগার এবং একট নৌঘাঁটি।

ইম্পিরিয়াল টোকে : একটি বিশেষ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষারস থেকে তৈরি ইম্পিরিয়াল টোকের উৎপাদন অনেকদিন হল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

সোনবার্ন প্যালেস : সনভ্রুন প্যালেস বা শ্লস সনন, ভিয়েনা শহরে অস্ট্রিয়ার রাজপরিবারের বাসস্থান। এই প্রাসাদের লাগোয়া বাগান এবং পশুশালা, যা সম্ভবত ইউরোপের প্রাচীনতম, তা সাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয় ১৭৭৯ সালে।

এতগুলো বছর কাটল কীরকম বলো : ১৯১৪-র ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এই গল্পে। এর ঠিক আগের ঘটনা ১৯০৩-এ। দ্য ক্রিপিং ম্যান গল্পে বলেছেন ড. ওয়াটসন।

প্রধানমন্ত্রী : আর্ল অব অক্সফোর্ড অ্যান্ড অ্যাসকুইথ, হার্বার্ট হেনরি অ্যাসকুইথ (১৮৫২-১৯২৮) ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত।

স্কিবেরিন : আয়ারল্যান্ডের কর্ক কাউন্টির একটি শহর।

বিচ্ছেদ ঘটিয়েছিলাম আমিই ভুল। আইরিন অ্যাডলার বোহেমিয়ার রাজাকে ত্যাগ করে নিজেই চলে গিয়েছিলেন তার সদ্য-বিবাহিত স্বামীর সঙ্গে।

তুমি রুগি দেখতে যাবে : রুগি দেখেছিলেন কি ওয়াটসন? এই ঘটনার এক মাস পরেই প্রকাশিত হয় দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার উপন্যাস। ওয়াটসন নিশ্চয়ই তার পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন করছিলেন তখন। অনুমান করেছেন গবেষক এডগার স্মিথ।

বিদেয় নিতে হবে ধরাধাম থেকে : বিদেয় নিতে হয়নি হোমস বা ওয়াটসনকে। হলে ১৯২৬ বা ১৯২৭ সালে প্রকাশিত গল্পগুলো আর লেখা হত না।

রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য রেড সার্কল]

বিরাট স্ক্র্যাপবুকে নিজের সাম্প্রতিক কীর্তিকাহিনি সাঁটতে সাঁটতে বিরক্ত মুখে শার্লক হোমস বললে, মিসেস ওয়ারেন, আমার সময়ের দাম আছে। খামোখা ভেবে মরছেন, আমাকেও ভাবাতে এসেছেন।

কিন্তু বাড়িউলি মিসেস ওয়ারেন হাজার হলেও মেয়েমানুষ। মেয়েলি ধূর্ততার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যি হোমসের নেই। ছিনেজোঁকের মতো ভদ্রমহিলা বললেন, গত বছর আমার এক ভাড়াটের ব্যাপার আপনি নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন। নাম তার মিস্টার ফেয়ারডেল হবস।

আরে, সে তো একটা সোজা কেস।

কিন্তু আপনার প্রশংসায় তিনি এখনও পঞ্চমুখ। মানুষ ধাঁধায় পড়লে কখনো তাকে বিমুখ করেন না। আমিও সেই ধাঁধা নিয়েই ছুটে এসেছি।

হোমস যেমন তোষামোদে গলে যায়, কারো কষ্ট দেখলেও তেমনি সইতে পারে না। ডবল দাওয়াইয়ে কাজ হল তৎক্ষণাৎ। হাতের কাজ ফেলে রেখে হেলান দিয়ে বসল চেয়ারে।

বলল, আপনার নতুন ভাড়াটের মুখ দেখতে পাচ্ছেন না বলে অস্বস্তিতে মরছেন, এই তো? আমি যদি আপনার ভাড়াটে হতাম, হপ্তার পর হপ্তা আমার মুখও আপনি দেখতে পেতেন না।

জানি স্যার জানি। কিন্তু সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত লোকটা ঘরের মধ্যে যদি সমানে পায়চারি করে, অথচ একবারও মুখ না-দেখায়, ভাবনা হয় না? এত ভয় কাকে? কী এমন কাণ্ড করেছে যে এভাবে লুকিয়ে থাকতে হচ্ছে? আমার স্বামী কাজ নিয়ে বাইরে থাকে, কিন্তু আমাকে তো দিনরাত বাড়িতে থেকে পায়ের আওয়াজ শুনতে হচ্ছে। স্বামী বেচারার ধাত ছেড়ে যাওয়ার

জোগাড় হয়েছে আমার অবস্থাও ভালো নয়।

ঝুঁকে পড়ে দীর্ঘ শীর্ণ আঙুল দিয়ে মিসেস ওয়ারেনের কাধ স্পর্শ করল হোমস উদবিগ্ন মানুষকে শান্ত করার অদ্ভুত একটা সম্মোহনী শক্তি ওর আছে–মিসেস ওয়ারেনও দেখতে দেখতে সহজ হয়ে এলেন। মুখ থেকে মিলিয়ে গেল ভয়ের রেখা সোজা হয়ে বসলেন চেয়ারে।

হোমস বললে, লোকটা আপনার কাছে দশ দিন আগে থাকা খাওয়া বাবদ পনেরো দিনের টাকা আগাম দিয়েছে বললেন না?

আজ্ঞে হ্যাঁ। উপরতলায় একটা বসবার ঘর আর শোবার ঘরের জন্যে কত দিতে হবে জানতে চাইল। আমি বললাম, হপ্তায় পঞ্চাশ শিলিং। ও বলল, হপ্তায় পাঁচ পাউন্ড দেব– কিন্তু আমার শর্ত মতো চলতে হবে। মিস্টার ওয়ারেনের আয় কম বুঝতেই পারছেন শর্তটা শুনতে চাইলাম। লোকটা একটা দশ পাউন্ডের নোট বাড়িয়ে দিয়ে বললে, পনেরো দিন অন্তর একখানা নোট পাবেন। কিন্তু বাড়ির চাবিটা আমার কাছে রাখতে হবে। শর্তটা এমন কিছু আশ্চর্য নয়, অনেক ভাড়াটেই চাবি কাছে রাখতে চায় কারোকে বিরক্ত করতে চায় না বলে।

তবে এখন এত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন?

হচ্ছি কি করে সাধে? এই দশ দিনে একবারমাত্র বাড়ির বাইরে গেছে–প্রথম রাতে। তারপর থেকে চৌপরদিন খালি ঘরে হাঁটছে। ঝি-টা সুদ্ধ তার চেহারা দেখেনি। এ আবার কী কাণ্ড?

প্রথম রাতে তাহলে বেরিয়েছিল।

হ্যাঁ, ফিরেছিল মাঝরাতে। আগে থেকে বলে রেখেছিল বলে দরজার খিল দেওয়া হয়নি। পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম ওপরে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

খাবারদাবার পৌঁছোয় কী করে? আগে থেকেই বলা আছে, ঘণ্টা বাজালে যেন খাবার দরজার সামনে চেয়ারে রেখে আসা হয়। আবার ঘণ্টা বাজালে এঁটো বাসন নিয়ে আসা

হয়। বিশেষ কিছু দরকার পড়লে বড়ো হাতের অক্ষরে এক টুকরো কাগজে লিখে জানিয়ে দেয়।

বড়ো হাতের অক্ষরে?

আজ্ঞে হ্যাঁ। পেনসিলে লেখে। শুধু শব্দটা তার বেশি নয়। কয়েকটা কাগজ এনেছি। আপনাকে দেখানোর জন্যে। এটা দেখুন : SOAP; এই দেখুন আর একটা–MATCH; এইটা প্রথম দিন সকালে পেয়েছি–DAILY GAZETTE; প্রত্যেক দিন সকালে ব্রেকফাস্টের সঙ্গে কাগজটা পাঠিয়ে দিই।

ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! ফুলসক্যাপ কাগজ ছেড়া স্লিপগুলো দেখতে দেখতে তাজ্জব হয়ে বললে হোমস। টানা হাতে লেখার একটা মানে বুঝি কিন্তু বড়ো হাতের অক্ষর বসিয়ে লেখা তো একটা ঝামেলা। নিরিবিলিতে থাকার না হয় একটা কারণ থাকতে পারে কিন্তু বড়ো হাতের অক্ষরে লেখার কারণটা তো বুঝছি না। এ তো বড়ো অস্বাভাবিক ব্যাপার। ওয়াটসন, কী বুঝছ?

হাতের লেখা লুকোতে চায়।

কিন্তু কেন? বাড়িউলি তার টানা হাতের লেখা দেখলে এমন কী মহাভারত অশুদ্ধ হবে? তার ওপর দেখ অল্প কথার হুকুমগুলোও এক-একটা হেঁয়ালি।

বুঝলাম না।

বেগনি রঙের শিস পেনসিলটার, মোটা ধ্যাবড়া মুখ। কাগজটা লেখবার পর এমনভাবে ছেড়া হয়েছে যে SOAP শব্দটার কিছুটা ছিঁড়ে গেছে। খুবই অর্থপূর্ণ ব্যাপার হে!

হুঁশিয়ার আদমি, এই তো?

এক্কেবারে ঠিক। নিশ্চয় আঙুলের ছাপ-টাপ এমন কিছু একটা পড়েছিল যা দেখলে শনাক্তকরণ সহজ হয়ে যেত। মিসেস ওয়ারেন, লোকটা মাঝবয়েসি, কালচে আর দাড়িওলা বললেন না? বয়স কত?

ছোকরার বয়স–তিরিশের বেশি নয়।

আর কিছু লক্ষণ দেখেছেন?

ইংরেজিটা ভালো বললেও উচ্চারণ শুনে বুঝেছি বিদেশি মানুষ।

জামাকাপড় পরিপাটি?

দারুণ। ভীষণ স্মার্ট।

নাম বলেছেন?

আজ্ঞে না।

চিঠিপত্র আসে? দেখা করতে কেউ আসে?

একদম না।

কিন্তু সকালের দিকে ঝাড়পোঁছ করার জন্যে ঝি ঘরে ঢোকে না?

সব কাজ নিজের হাতে করে।

কী আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! জিনিসপত্র কী আছে সঙ্গে?

একটা বাদামি ব্যাগ–মস্ত বড়ো–আর কিছু না।

ঘর থেকে কিছুই কি পাওয়া যায়নি?

ব্যাগ থেকে একটা খাম বার করে ঝাড়লেন মিসেস ওয়ারেন। বেরিয়ে এল দুটো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, একটা পোড়া সিগারেট।

আজ সকালে ট্রেতে পেয়েছি। শুনেছি ছোটোখাটো জিনিস দেখেও অনেক বড়ো ব্যাপার ধরতে পারেন–তাই নিয়ে এলাম দেখানোর জন্যে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হোমস বললে, তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। কাঠিগুলি অল্পই পুড়েছে–তার মানে সিগারেট ধরানো হয়েছে। পাইপ বা চুরুট ধরাতে গেলে অর্ধেক কাঠি পুড়ে যায়। কিন্তু, এ আবার কী ব্যাপার! ভারি আশ্চর্য তো! পোড়া সিগারেটটা দেখেছ ওয়াটসন? মিসেস ওয়ারেন, লোকটার দাড়িগোঁফ আছে বললেন না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

সব গুলিয়ে যাচ্ছে যে। সিগারেটের শেষ পর্যন্ত টানা হয়েছে–গোঁফ তো পুড়ে যাওয়ার কথা। আরে ওয়াটসন, তোমার এমন ছোট্ট গোঁফেও ছ্যাকা লাগত এইভাবে সিগারেটের শেষ পর্যন্ত ঠোঁটে রেখে দিলে। এভাবে সিগারেট খেতে পারে যার দাড়ি গোঁফ কামানো।

সিগারেট হোল্ডারে লাগিয়েছিল বোধ হয়? বললাম আমি।

না হে না, পিছনে থুথু লেগে রয়েছে। মিসেস ওয়ারেন, ঘরে দুজন লোক নেই তো?

আজ্ঞে না। লোকটা এমনিতে এত কম খায় যে বলবার নয়।

তাহলে আরও দু-দিন অপেক্ষা করা যাক। আপনার এত ধড়ফড় করারও দরকার নেই। আগাম টাকা পেয়েছেন, ভাড়াটে হিসাবেও লোকটা নচ্ছার নয়, একটু সৃষ্টিছাড়া হলেও বদ নয়। যতক্ষণ না তাকে কোনো কারণে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে, ততক্ষণ নিরিবিলি বসে বিঘ্ন ঘটাতে চাই না। তবে কেসটা হাতে রাখলাম, নতুন কিছু ঘটলেই এসে বলবেন।

বিদায় হলেন বাড়িউলি। হোমস বললে, ওয়াটসন, কেসটা ইন্টারেস্টিং। হয় কারো নিছক বাতিক, না হয় গভীর জলের ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে ঘরে অন্য কেউ থাকে–ঘরভাড়া যে নিয়েছে, সে নয়।

কেন এমন মনে হল?

সিগারেটের ব্যাপারটা ছাড়াও অনেক অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে যে। লোকটা ঘর ভাড়া নিয়েই বেরিয়ে গেল। ফিরল অনেক রাতে যখন কেউ নেই, কেউ তাকে দেখল না। যে-লোক বেরিয়ে গেল, সেই লোকই যে ফিরে এল তার কী প্রমাণ? নিশ্চয় তার বদলে এল একজন। প্রথম জন ইংরাজি চোস্ত বলে, দ্বিতীয় জন ইংরাজিতে কাঁচা বলেই MATCHES না-লিখে MATCH লেখে। কেন জান, MATCH শব্দটা ডিকশনারি দেখে লিখেছে বলে ডিকশনারিতে শব্দটার বিশেষ্য আছে, বহুবচন নেই। কাটছাঁট কথায় হুকুম চালানোর কারণটাই হল ইংরেজি ভাষায় দখল নেই। এইসব কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাড়াটে পালটে গিয়েছে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে!

উদ্দেশ্য?

সমস্যা তো সেইটাই। তদন্ত চালানোর লাইন এখন একটাই। বলতে বলতে তাক থেকে ইয়ামোটা একটা জাবদা খাতা নামাল হোমস। নানান কাগজ থেকে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের অদ্ভুত অদ্ভুত সব খবর কেটে দিনের পর দিন খাতায় সেঁটে রাখা ওর বরাবরের অভ্যেস। একটার পর একটা খবর পড়ে টিপ্পনী কেটে চলল হোমস। একটু পরেই চোখ আটকে গেল একটা খবরে।

বলল, ওয়াটসন, মনে হচ্ছে এই খবরই খুঁজছি। শোনো : ধৈর্য ধরো। যোগাযোগের কোনো উপায় বার করবই। তদ্দিন এইখানে চোখ রেখো–জি। রহস্যজনক ভাড়াটে মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে ওঠার দু-দিন পরের বিজ্ঞাপন। লোকটা তাহলে ইংরেজি ভালো লিখতে না-পারলেও পড়তে পারে। তিনদিন পরে দেখ আবার একটা বিজ্ঞাপন। কাজের ব্যবস্থা হচ্ছে। ধৈর্য ধরো। মেঘ কেটে যাবে।—জি। সাতদিন আর খবর নেই। তারপর এই বিজ্ঞাপনটা দেখছি অনেক স্পষ্ট–রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে। সুযোগ পেলে সংযোগ পেলে সংকেত করব। নিশানা-সংকেত মনে রেখো–একটা A, দুটো B, ইত্যাদি। শিগগিরই খবর দোব। জি। এটা হল গতকালের কাগজের বিজ্ঞাপন, আজ আর কোনো বিজ্ঞাপন নেই। ওয়াটসন, এবার সবুর করলেই ব্যাপারটা অনেকটা বোধগম্য হবে।

হলও তাই। সকাল বেলা দেখলাম আগুনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাকিয়ে সন্তোষ-উজ্জ্বল মুখে হাসিভরা চোখে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধুবর।

টেবিল থেকে সেইদিনের খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে বললে, ওয়াটসন, দেখ, দেখ, ঠিক যা ভেবেছিলাম। উঁচু লাল বাড়ি, সামনের দিকটা সাদা পাথর। চারতলা। দ্বিতীয় জানলা ছেড়ে। সন্ধের পর। জি। এবার তো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে জল কোনদিকে গড়াচ্ছে। প্রাতরাশ খেয়ে ভাবছি মিসেস ওয়ারেনের ভাড়াটের সঙ্গে একটু দেখা করে আসব। আরে, মিসেস ওয়ারেন যে! সাতসকালে কী খবর নিয়ে এলেন!

সাংঘাতিক নতুন কিছু একটা ঘটেছে মনে হল। বিপুল উদ্যমে ধূমকেতুর মতো সাঁ করে চলে এসেছেন মিসেস ওয়ারেন।

মি. হোমস! মি. হোমস! আপনার সঙ্গে পরামর্শ না-করে কিছু করব না বলেই ছুটে এলাম। কিন্তু এবার আমি পুলিশ ডাকব। আমার বুড়ো স্বামীকে যারা ছুঁড়ে ফেলে দেয়—

মিস্টার ওয়ারেনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে?

খুব খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তার সঙ্গে।

কে করেছে?

আজ সকালে সাতটা নাগাদ আমার কর্তা কাজে বেরিয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরোতে-বেরোতেই হঠাৎ রাস্তায় দুটো লোক পেছন থেকে এসে ঝপাং করে একটা কোর্ট মাথায় ছুঁড়ে দিয়ে সবসুদ্ধ জাপটে তুলে ফেলে পেছনের একটা গাড়িতে। ঘণ্টাখানেক পরে

ফেলে দেয় রাস্তায়। কর্তা তখন ঠক ঠক করে কাঁপছে। গাড়িটা পর্যন্ত দেখেনি। দেখে কী হ্যাম্পস্টেড হিদের ফুটপাতে পড়ে আছে। বাসে করে বাড়ি ফিরেছে। সোফায় শুয়ে এখনও কাপছে।

লোকগুলোর চেহারা দেখেছেন? কথা বলতে শুনেছেন?

না। ওঁর তখন মাথা ঘুরছিল। শুধু মনে আছে ঠিক যেন ম্যাজিক দেখানোর মতো তুলে নিয়ে গেল রাস্তা থেকে, আবার ম্যাজিক দেখানোর মতো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল রাস্তায়। দুজন কি তিনজন লোক ছিল বোধ হয়।

আপনার ধারণা এ-ব্যাপারে আপনার ভাড়াটে জড়িত?

তা ছাড়া আর কে? পনেরো বছর এ-বাড়িতে রয়েছি কখনো এমন কাণ্ড ঘটেনি। যথেষ্ট হয়েছে, আর না, টাকা না, টাকা সব নয়। আজকেই ওকে বিদেয় করব বাড়ি থেকে।

অত ধড়ফড় করবেন না মিসেস ওয়ারেন, ধৈর্য রাখুন। সকাল সাতটার কুয়াশায় আততায়ীরা ভুল করে আপনার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছে ভুল বুঝতে পেরে ফেলে দিয়ে গেছে। কাজেই আসল বিপদটা আপনার ভাড়াটের। ভুল যদি না হত, ভাড়াটের কী দশা হত ভেবে পাচ্ছি না।

তাহলে আমি কী করব, মি. হোমস?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মিসেস ওয়ারেন, আপনার এই ভাড়াটের মুখশ্রী দেখতে বড় ইচ্ছে হচ্ছে।

দরজা না-ভাঙলে ঢুকবেন কী করে? খাবারের ট্রে দরজার সামনে বসিয়ে সিঁড়ি বেয়ে যখন নেমে যাই, তালা খোলার আওয়াজ পাই তখন–তার আগে নয়।

ট্রে-টা ভেতরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে বাইরে আসতে হয় তো। তখনই দেখে নেব কিন্তু কোথাও লুকিয়ে থাকতে হবে আমাদের।

একটু ভেবে নিয়ে মিসেস ওয়ারেন বললেন, বেশ তো, সে-ব্যবস্থা হয়ে যাবে। দরজার উলটোদিকে একটা মাচা-ঘর আছে। আমি একটা আয়না বসিয়ে রাখব ভেতরে–আপনারা ঘাপটি মেরে থাকবেন দরজার আড়ালে।

চমৎকার! দুপুরের খাওয়া কখন খায় লোকটা?

একটা নাগাদ।

ওই সময়ে আসছি আমি আর ডাক্তার ওয়াটসন। আপাতত বিদায়।

সাড়ে বারোটার সময়ে পৌঁছালাম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কাছে গ্রেট ওরমে স্ট্রিটে। মিসেস ওয়ারেনের বাড়িটা বেশ উঁচু, হলদে ইট দিয়ে তৈরি। রাস্তার কোণে হোয়ে স্ট্রিটের

আবাসিক ফ্ল্যাটবাড়িগুলো চোখে পড়ার মতো। একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে খুকখুক করে হেসে উঠল হোমস। বাড়িটা অন্যান্য বাড়ি থেকে এমনভাবে ঠেলে সামনে এসেছে যে চোখে না-পড়লেই নয়।

বলল, ওয়াটসন দেখেছ! উঁচু লাল বাড়ি, সামনেটা পাথর দিয়ে তৈরি। সংকেত খবরের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। একটা জানলাতে ঘর ভাড়ার নোটিশও ঝুলছে দেখছি। অর্থাৎ একটা খালি ফ্ল্যাটে ঢোকবার ব্যবস্থা করে ফেলেছে স্যাঙাত। এই যে মিসেস ওয়ারেন, বলুন কোথায় যেতে হবে।

বুটজোড়া নীচের চাতালে খুলে রেখে ওপরে চলে আসুন। সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

লুকিয়ে দেখার পক্ষে জায়গাটা খাসা। আয়নাটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যে অন্ধকারে গা ঢেকে বসে থেকে উলটোদিকের দরজাটা স্পষ্ট দেখা যায়। আসন গ্রহণ করলাম, মিসেস ওয়ারেন বিদায় নিলেন এবং সঙ্গেসঙ্গে অনেক দূরে শুনলাম ঘণ্টাধ্বনির ক্ষীণ শব্দ–খাবার তলব করছে। রহস্যময় ভাড়াটে। একটু পরেই ট্রে নিয়ে উঠে এলেন মিসেস ওয়ারেন, দরজার সামনে চেয়ারের ওপর রেখে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। দরজার কোণে সেঁটে থেকে আয়নার মধ্যে দিয়ে চেয়ে রইলাম বন্ধ দরজার প্রতিবিম্বর দিকে। হঠাৎ শোনা গেল চাবি ঘোরানোর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ, ঘুরে গেল হাতল, ঈষৎ ফাঁক হল পাল্লা এবং একজোড়া সরু হাত ঝপ করে চেয়ার থেকে তুলে নিয়ে গেল ট্রে-টা। এক মুহূর্ত পরেই খালি ট্রে-টা বসিয়ে দেওয়া হল চেয়ারে এবং চকিতের জন্যে দেখলাম দরজার ফাঁক দিয়ে একটা সুন্দর কালচে ভয়ার্ত মুখ কটমট করে চেয়ে আছে মাচা-

ঘরের। অল্প ফাঁক করা দরজার পানে। পরমুহূর্তেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা, ঘুরে গেল চাবি এবং নিস্তব্ধ হল বাড়ি। আমার গা টিপে দিয়ে মাচাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল হোমস–পেছনে আমি।

নীচে নেমে মিসেস ওয়ারেনকে বললে, রাত্রে আসবখন। এসো ওয়াটসন, বাড়ি গিয়ে কেসটা নিয়ে কথা হবে।

বেকার স্ট্রিটে ফিরে ইজিচেয়ারে বসে বলল, ওয়াটসন, আমার অনুমানই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল। ভাড়াটে বদল হয়েছে বাড়িটায়। কিন্তু বদলি ভাড়াটে যে একজন মহিলা এবং নিতান্ত সাধারণ মহিলা নয়–সেটা আগে আঁচ করতে পারিনি।

মহিলাটি কিন্তু আমাদের দেখেছে।

আমাদের দেখেছে কি না বলতে পারব না–তবে আঁতকে ওঠার মতো কিছু একটা দেখেছে। ব্যাপারটা এবার বুঝেছ? সাংঘাতিক কোনো বিপদের ভয়ে লন্ডনে পালিয়ে এসেছে একটি দম্পতি। স্বামীটির অন্য কাজ আছে–দিনরাত বউকে আগলানো সম্ভব নয়। তাই তাকে নিজের জন্যে ঘরভাড়া করে লুকিয়ে রেখে দিলে এমনিভাবে রাখল যে বাড়িউলি পর্যন্ত জানল

কে রয়েছে বাড়িতে। দেখাসাক্ষাৎ সম্ভব নয় পাছে শত্রুরা পাছু নিয়ে বউকে ধরে ফেলে–সোজাসুজি চিঠি লেখাও সম্ভব নয়–তাই খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলম

মারফত খবর পাঠানো শুরু করল হুঁশিয়ার স্বামীটি। স্ত্রীটি মেয়েলি হাতের লেখা গোপন করার জন্যে কাগজের টুকরোয় বড়ো হাতের অক্ষরে চাহিদা লিখে রেখে দিতে লাগল বাইরের চেয়ারে।

কিন্তু এত লুকোচুরি কীসের জন্যে?

ওয়াটসন, তুমি চিরকালই বড়ো কাঠখোট্টাভাবে প্র্যাকটিক্যাল–আসল পয়েন্টে হাত দিয়েছ–ঠিক কথা, এত লুকোচুরি কীসের জন্যে? প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নিশ্চয়। সেইজনে ভুল করে মিস্টার ওয়ারেনের ওপর হামলা করা হয়েছে। কিন্তু মজা হচ্ছে এই যে মিস্টার ওয়ারেনকে যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারা নিজেরাও কিন্তু এখনও জানে না ভাড়াটে বদল হয়ে গিয়েছে ভদ্রলোকের বাড়িতে। ভারি জটিল, ভারি অদ্ভুত কেস।

কিন্তু এ-কেসে আর এগিয়ে তোমার কী লাভ?

ভায়া, ডাক্তারি শেখবার পর নতুন কেস পেলেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে কি দক্ষিণার আশায়?

মোটেই না। শেখবার জন্যে।

আমিও এ-কেসে লেগে থাকতে চাই শেখবার জন্যে। যশ চাই না, অর্থ চাই না–শুধু চাই শিখতে। এ-কেসে শেখবার মতো অনেক কিছু আছে।

সন্ধে হল। দুই বন্ধু হাজির হলাম মিসেস ওয়ারেনের বাড়িতে। অন্ধকার বসবার ঘরে বসে দেখলাম অনেক উঁচুতে ওপরতলার ফ্ল্যাটবাড়ির জানলায় টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো।

শার্সিতে শীর্ণ ব্যগ্র মুখ চেপে ফিসফিস করে হোমস বললে, ঘরে একজন পুরুষ রয়েছে। ছায়া দেখতে পাচ্ছি। ওই তো আবার দেখা যাচ্ছে! হাতে একটা মোমবাতি রয়েছে। জানলা দিয়ে দেখছে এ-বাড়ির ওপরতলায় ভদ্রমহিলা ওদিকে তাকিয়ে আছে কি না। এবার আলোর নিশানা শুরু করেছে। ওয়াটসন, বার্তাটা তুমিও লেখো–দুজনে মিলিয়ে দেখব পরে। একটা ফ্ল্যাশ মানে, A। আবার ফ্ল্যাশ হচ্ছে, কণ্ডার গুনলে? কুড়িবার। তার মানে T, AT–মানে বুঝলাম না। আরেকটা T; দ্বিতীয় শব্দ শুরু হচ্ছে নিশ্চয়। লেখা–TENTA। ব্যস আর ফ্ল্যাশ নেই। কী বুঝলে ওয়াটসন? ATTENTA শব্দের কোনো মানে হয়? আবার শুরু হয়েছে ফ্ল্যাশ। আরে, আরে একই শব্দ আবার ফ্ল্যাশ করছে–ATTENTA। ওয়াটসন, এ তো দেখছি ভারি অদ্ভুত ব্যাপার! ওই দেখো আবার সেই একই শব্দ–ATTENTA! পরপর তিনবার ATTENTA! আর ক-বার ATTENTA বলবে বুঝছি না। সরে গেল জানলা থেকে ওয়াটসন, কী বুঝলে বলো তো?

সাংকেতিক খবর।

হঠাৎ মানেটা মাথায় এসে গেল হোমসের! হেসে উঠলে খুক খুক করে। বলল, খুব একটা জটিল সংকেত নয়। ইটালিয়ান শব্দ। A লেখা হয়েছে স্ত্রীলোককে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে বলে। সাবধান! সাবধান! সাবধান! বুঝলে?

ঠিক ধরেছ মনে হচ্ছে।

খুব সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে বলেই পর পর তিনবার হুঁশিয়ার করা হল ভদ্রমহিলাকে। আরে গেল যা লোকটা যে আবার জানলায় এসেছে!

ঝুঁকে পড়ে জানলার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে একটি ছায়ামূর্তি–শিখা নেড়ে নেড়ে দ্রুত নিশানা করছে এ-বাড়ির মেয়েটিকে। খুব দ্রুত মোমবাতি নাড়ছে–লিখতেও সময় পাচ্ছি না।

পেরিকোলো–পেরিকোলো–সেটা আবার কী ওয়াটসন? বিপদ, বিপদ, তাই না? আরে হ্যাঁ, এ তো বিপদের সংকেত। আবার শুরু হয়েছে। পেরি–আরে গেল যা। নিভে গেল কেন?

আচমকা অন্ধকার হয়ে গেল আলোকিত জানলা–শব্দহীন আর্ত চিৎকারের যেন কণ্ঠরোধ করে দেওয়া হল মধ্যপথে। জানলার সামনে থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল হোমস।

ওয়াটসন, আর তো চুপচাপ এ-জিনিস দেখা যায় না। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে ওই ঘরে–নইলে আলোর সংকেত মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল কেন? চলো যাই স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। তার আগে নিজের চোখে দেখব কী ঘটেছে ও-ঘরে।

বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির ওপরতলার জানলায় একটি মেয়ের মুখ কাঠ হয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে আচমকা বন্ধ-হয়ে-যাওয়া আলোকবার্তা আবার দেখবার আশায় তাকিয়ে আছে সামনের বাড়ির দিকে। হোয়ে স্ট্রিটের ফ্ল্যাটবাড়ির দরজার সামনে আসতেই রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রেটকোট পরা মনুষ্যমূর্তিটি সবিস্ময়ে বলে উঠল, আরে হোমস যে!

গ্রেগসন নাকি! তুমি কী মনে করে?

আপনি কী মনে করে?

একই ধান্দায়। আমি দেখেছিলাম জানলায় আলোর সংকেত।

সংকেত?

ওই জানলাটায় আলো নেড়ে খবর পাঠানো হচ্ছিল এতক্ষণ হঠাৎ গেল থেমে। তাই দেখতে যাচ্ছিলাম ব্যাপারটা। কিন্তু তুমি যখন স্বয়ং হাজির

দাঁড়ান! দাঁড়ান! উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে গ্রেগসন। আপনি পাশে থাকলে মনে দারুণ বল পাই। কাজেই বাছাধন পালিয়ে যাবে কোথায়!

কার কথা বলছ?

তাহলেই দেখুন, আপনাকেও আমি টেক্কা মারতে পারি। বলেই ফুটপাতের পাথরে সজোরে ছুরি ঠুকল গ্রেগসন। অমনি রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা চার চাকার ঘোড়ার গাড়ি থেকে চাবুক হাতে নেমে এল গাড়োয়ান। আসুন মি. শার্লক হোমস, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি পিনকারটন্স আমেরিকান এজেন্সির মিস্টার লেভারটন।

হোমস বলে উঠল, লং আইল্যান্ড গুহা রহস্যের সেই নায়ক? কী সৌভাগ্য আমার।

প্রশংসা শুনে মুখ লাল হয়ে গেল তরুণ আমেরিকানের।

বললে, মি. হোমস, গোরজিয়াননাকে যদি ধরতে পারি—

রক্তবৃত্তের গোরজিয়াননা? বলেন কী!

ইউরোপেও গোরজিয়াননা এত বিখ্যাত জানা ছিল না। আমেরিকায় তো একডাকে সবাই চেনে। পঞ্চাশটা খুনের নায়ক, অথচ টিকি পর্যন্ত ছুঁতে পারছি না। নিউইয়র্ক থেকে পিছু

নিয়ে লন্ডনে এসে সাতদিন ধরে ওত পেতে আছি কোনো একটা অছিলায় বাছাধনকে খাঁচায় পোরার জন্যে। পেছনে পেছনে এসেছি আমি আর গ্রেগসন। শয়তানটা উঠেছে ওই বাড়িটায়–বেরোনোর পথ একটাই। এবার আর চোখে ধুলো দিতে পারবে না। তিনটে লোক এখুনি বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু ওদের মধ্যে গোরজিয়াননা ছিল না।

গ্রেগসন বললে, মি, হোমস এ-ব্যাপারে আরও খবর রাখেন মনে হচ্ছে। এইমাত্র আলোর সংকেতের কী সব কথা বলছিলেন।

সংক্ষেপে হোমস বলল ও যা জানত।

সক্ষোভে আমেরিকান ডিটেকটিভ বললে, তার মানে ও জেনে ফেলেছে আমরা পেছন নিয়েছি।

এ-কথা কেন বললেন?

আলো নেড়ে দলের লোকেদের খবর পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ দেখেছে আমরা ওত পেতে রয়েছি নীচে তাই খবর আর শেষ করেনি। এখন কী করি বলুন তো?

হানা দোব ওপরে–একসঙ্গে, বললে হোমস।

কিন্তু অ্যারেস্ট করার মতো শমন তো আনিনি।

গ্রেগসন বললে, সে-দায়িত্ব আমার। চলুন।

গ্রেগসনের মাথায় বুদ্ধি কম থাকতে পারে, কিন্তু মনে সাহসের অভাব নেই। চরম বিপদের সামনে নিজেই এগিয়ে গেল সবার আগে। আমেরিকান ডিটেকটিভকে কিছুতেই উঠতে দিল না নিজের আগে। লন্ডনে বিপদের মোকাবিলা করুক লন্ডন ডিটেকটিভ আমেরিকানকে সে-সুযোগ দিতে সে রাজি নয়।

তিনতলায় বাঁ-হাতের ফ্ল্যাটের দরজা খোলা দেখে ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল গ্রেগসন। অখণ্ড নৈঃশব্দ্য এবং নীরন্ধ্র তমিস্রা বিরাজ করছে ভেতরে। আমি দেশলাই জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলাম গ্রেগসনের লণ্ঠন। পলতের শিখা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যেতেই বিস্ময়ে শ্বাস টানলাম তিন জনেই। কার্পেটহীন মেঝের ওপর টাটকা রক্তের ধারা। রক্তমাখা পদচিহ্ন আমাদের দিকে এগিয়ে এসে গিয়ে ঢুকেছে ভেতরের একটা ঘরে। দরজাটা বন্ধ ছিল। ঠেলে খুলে দিয়ে লণ্ঠনটা মাথার ওপর তুলে ধরল যাতে আমরা সবাই দেখতে পাই ঘরের দৃশ্য। এবং দেখলাম সেই ভয়াবহ দৃশ্য। দেখলাম শূন্য ঘরের ঠিক মাঝখানে সাদা কাঠের মেঝেতে মুখ গুঁজড়ে থই থই রক্তের মধ্যে বীভৎসভাবে লুণ্ঠিত একজন বিরাটকায় দাড়ি গোঁফ কামানো পুরুষ। দু-হাঁটু মুড়ে দু-হাত সামনে ছড়িয়ে নিঃসীম যন্ত্রণায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে যে-বস্তুটির মরণ মারে, সেটি তখনও চওড়া বাদামি গলায় আমূল ঢুকে থেকে বার করে রেখেছে কেবল সাদা বাঁটটুকু–অত্যন্ত ধারালো হিলহিলে পাতলা একটা ছোরা। হাতের কাছে পড়ে একটা কালো দস্তানা আর একটা ভীষণ দর্শন মোষের শিংয়ের হাতলওলা দু-দিক ধারালো ছোরা।

আমেরিকান ডিটেকটিভ লাফিয়ে উঠল সেই দৃশ্য দেখে, আরে সর্বনাশ! এ যে স্বয়ং ব্ল্যাক গোরজিয়াননা! আমাদের আগেই কেউ কারবার শেষ করে গেছে দেখছি।

গ্রেগসন বললে, মি. হোমস, এই দেখুন জানলার সামনে মোমবাতি। আরে! আরে! ওটা কী করছেন?

মোমবাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে জানলার সামনে গিয়ে এদিক-ওদিক কিছুক্ষণ নাড়ল হোমসতারপর উঁকি মেরে বাইরেটা দেখে নিয়ে ফু দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মেঝেতে।

বলল, ওতেই কাজ হবে। আচ্ছা, নীচে দাঁড়িয়ে তিনটে লোককে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন বললেন না? খুঁটিয়ে দেখেছিলেন?

দেখেছিলাম।

একজনের গালে কালো দাড়ি ছিল কি? মাঝারি সাইজ, বয়স বছর তিরিশ, কালচে মুখ? ছিল। সবশেষে সে-ই তো আমার পাশ দিয়ে গেল।

খুনটা সে-ই করেছে। দেখতে কীরকম শুনলেন, পায়ের ছাপটা মেঝেতেই দেখে নিন। ওই যথেষ্ট, এবার লেগে পড়ুন।

ওতে খুব একটা সুবিধে হবে না মি. হোমস। লন্ডনের লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে ওই চেহারার মানুষ খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় ছুঁচ খুঁজে পাওয়ার শামিল বলতে পারেন।

মোটেই না। সেইজন্যেই তো এই ভদ্রমহিলাকে ডেকে আনলাম।

কথাটা শুনে সচমকে সবাই তাকালাম দরজার পানে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাঙ্গী সুন্দরী ব্লুমসবেরির সেই রহস্যময়ী ভাড়াটে। দুই চোখে অসীম ভয়ার্তি নিয়ে চেয়ে আছে মেঝের রক্তহ্রদে লুণ্ঠিত মৃতদেহটির পানে। সম্মোহিতের মতো বিবর্ণ মুখে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে সেইদিকে।

পরক্ষণেই বিলাপধ্বনির মতো বিড়বিড় করে বললে–ডিও মিও... ডিও মিও... ওকেও শেষে খুন করলে!তারপরেই অবশ্য সব নিশ্বাস টেনে দু-হাত মাথার ওপর তুলে তাথই তাথই নাচ আরম্ভ করে দিলে ঘরময়। সেইসঙ্গে সে কী উল্লাস-চিৎকার! হাততালি দিয়ে আর অনর্গল ইটালিয়ান শব্দের তুবড়ি ছুটিয়ে ঘরময় নেচে নেচে বেড়াতে লাগল রহস্যময়ী রূপসি। আমি হতবাক, স্তম্ভিত এবং শঙ্কিত হলাম এ-রকম একটা বিকট দৃশ্যের সামনে এই ধরনের উন্মত্ত নৃত্য দেখে। আচমকা নাচ থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে আমাদের পানে চাইল রূপসি।

আপনারা কে? দেখে তো মনে হচ্ছে পুলিশ! গুইসেপ্পি গোরজিয়াননাকে তাহলে আপনারাই খতম করেছেন, তাই না?

ম্যাডাম, আমরা পুলিশ ঠিকই।

কিন্তু জেনারো কোথায়?ছায়া ঢাকা কোণগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিল সুন্দরী। সে যে আমার স্বামী। জেনারো লুক্কা আর আমি এমিলি লুক্কা নিউইয়র্ক থেকে পালিয়ে এসেছি একসঙ্গে এই কালকুত্তার ভয়ে। কিন্তু সে গেল কোথায়? এই তো একটু আগে জানলা থেকে LET ডাকল আমাকে ডাক শুনেই তো ছুটতে ছুটতে আসছি।

ম্যাডাম, আমি ডেকেছি আপনাকে, বললে হোমস।

আপনি ডেকেছেন? আপনি কী করে ডাকবেন?

আপনার সংকেত আমি ধরে ফেলেছি বলে। এখানে আপনার থাকাটা দরকার ছিল বলেই শুধু Vieni। শব্দটা ফ্ল্যাশ করেছিলাম–দেখেই দৌড়ে এসেছেন।

ভয় মেশানো চোখে হোমসের পানে তাকায় রূপসি ইটালিয়ান।

কিন্তু... কিন্তু... হঠাৎ থমকে যায় সুন্দরী। গর্ব আর উল্লাস ফেটে পড়ে চোখের তারায় তারায়।বুঝেছি বুঝেছি... ঝড়ঝায় আপদে বিপদে শোকে দুঃখে যে-মানুষটা এতদিন আমাকে আগলে রেখে দিয়েছে–এ তারই কাণ্ড! নিজের হাতে শয়তানদের রাজা পিশাচ

শিরোমণি গুইসেপ্পি গোরজিয়াননাকে খুন করেছে তার নিজের হাতে! জেনারো... জেনারো... কত ভাগ্য করলে তোমার মতো পুরুষের স্ত্রী হওয়া যায়!

ভাবাবেশের ধার দিয়ে গেল না কাঠখোট্টা গ্রেগসন। ভদ্রমহিলা যেন নেহাতই একটা নটিং হিল জাহাবাজ–ঠিক সেইভাবে বাহুতে হাত রেখে বললে নীরসকণ্ঠে, আপনি কে ঠিক ধরতে পারছি না। কিন্তু যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে আপনার এখন থানায় যাওয়া দরকার।

বাধা দিল হোমস। বলল, একটু দাঁড়াও, গ্রেগসন। ম্যাডাম, খুন করার অপরাধে আপনার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হবে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন কুউদ্দেশ্যে খুনটা উনি করেননি, তাহলে যা জানেন তা বলুন–তাতে আপনার স্বামীর ভালো হবে।

গোরজিয়াননাই যখন খতম হয়ে গেল, তখন দুনিয়ার কেউ আমার স্বামীর কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। ওকে খুন করার জন্যে পৃথিবীর কোনো আদালতেই তার সাজা হবে না।

হোমস বললে, তাহলে এ-ঘরের দরজা বন্ধ করে লাশ যেমন তেমন ফেলে রেখে চলুন এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ওঁর ঘরে গিয়ে গল্পটা শোনা যাক।

আধঘণ্টা পরে সিগনোরা লুক্কার ঘরে বসে অত্যাশ্চর্য যে কাহিনি শুনলাম, তা এখানে হুবহু লিখছি তার জবানিতে ভাষাটা কেবল মেজেঘষে দিতে হল–কেননা ভদ্রমহিলার ভাঙা ভাঙা ইংরেজি অনেকেই বুঝবেন না। ব্যাকরণে ভুল ছিল বিস্তর।

নেপলস-এর কাছে পোসিলিপ্পোতে আমার জন্ম। আমার বাবা অগাস্টাস বেরিলি ওখানকার উকিল। জেনারো তার চাকরি করত। ওর রূপ ছিল, প্রাণশক্তি ছিল–কিন্তু টাকা ছিল না, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল না। আমি ভালোবাসলাম ওর যা ছিল তার জন্যে–বাবা বিয়েতে রাজি হলেন না ওর যা নেই তার জন্যে। দুজনে তখন পালিয়ে গেলাম, গয়নাগাটি বেচে সেই টাকায় চার বছর আগে আমেরিকায় গিয়ে সুখের সংসার পাতলাম। বিয়ে করেছিলাম আগেই–প্যারিতে।

প্রথম থেকেই কপাল খুলে গেল আমাদের। ক্যাসটালোট্টি অ্যান্ড জামবিয়া কোম্পানির ক্ষমতাশালী অংশীদার টিটো ক্যাসটালোট্রিকে একবার কিছু গুন্ডাবদমাশের খপ্পর থেকে বাঁচায় আমার স্বামী। ক্যাসটালোট্টি নিজেও ইটালিয়ান, বিয়ে-থা করেননি, কোম্পানির একমাত্র কার্যক্ষম অংশীদার বলতে তিনিই জামবিয়া বিছানা ছেড়ে নড়তে পারতেন না। উপকার ভুলতে না-পেরে আমার স্বামীকে ক্যাসটালোট্টি নিজের ফার্মে বড়ো চাকরি দিলেন। ব্রুকলিনে নিজের বাড়িতে থাকতে দিলেন, নিজের ছেলের মতো ওকে দেখতে লাগলেন এবং বেশ বুঝলাম ওঁর সব সম্পত্তিই শেষ পর্যন্ত আমাদের লিখে দেবেন। এরপরেই কপাল পুড়ল আমাদের।

একদিন কাজ থেকে জেনারো বাড়ি ফিরল দানবের মতো বিরাট একটা লোককে সঙ্গে নিয়ে। পোসিলি পেপার মানুষ সে নাম গোরজিয়াননা। সব কিছুই তার দানবিক। কথা বললে মনে হয় বাজ ডাকছে, হাত পা নাড়লে মনে হয় গদা ঘোরাচ্ছে। এ-রকম কিম্ভুতকিমাকার কদাকার, বুক কাঁপানো হাড় বজ্জাত মানুষ আমি আর দেখিনি। লাশটা আপনারাও দেখেছেন বাড়িয়ে যে বলছি না নিশ্চয় বুঝছেন। কিন্তু রাক্ষসটার কথার মধ্যে যেন জাদু ছিল, ঠায় বসে শুনতে হত–ওঠা যেত না। এক লহমার মধ্যেই মনে হত যেন হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছে–প্রাণটা নির্ভর করছে তার খেয়ালখুশির ওপর।

জেনারো কাঠ হয়ে বসে তার বকবকানি শুনত। লোকটা ঘনঘন আসত। মুখ দেখে বুঝতাম আমার মতোই জেনারো তাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না। তবুও চুপ করে বসে কখনো রাজনীতি, কখনো সমাজবাদ, কখনে ছাইপাঁশ বক্তৃতা শুনত। প্রথম প্রথম ভাবতাম বুঝি জেনারো ওকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে। তারপর ওর মুখের চেহারা দেখে আসল কারণটা ধরতে পারলাম। জেনারো ওকে সাংঘাতিক ভয় করে। একটা চাপা, গোপন, মারাত্মক আতঙ্কে ভেতরে ভেতরে তাই সিটিয়ে আছে। সেই রাত্রেই ওকে দু-হাতে ধরে বললাম, সত্যিই যদি সে আমাকে ভালোবাসে, তাহলে বলতে হবে গোরজিয়াননাকে তার এত ভয় কেন।

জেনারো তখন সব খুলে বলল। শুনে ভয়ে হিম হয়ে গেলাম আমি। একটা সময় এসেছিল জেনারোর জীবনে, যখন সংসারে তার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না, নিজের প্রচণ্ডতায় দাপাদাপি করে বেরিয়েছে সমাজে–তখন, সেই আধ পাগল অবস্থায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে নিউপলিটান সোসাইটিতে নাম লেখায়–এই হল গিয়ে কুখ্যাত সেই রেড

সার্কল–রক্তবৃত্ত সমিতি। এ-সমিতিতে শপথ নিয়ে যে ঢোকে, জীবন নিয়ে সে আর বেরোতে পারে না। আমেরিকায় পালিয়ে এসে জেনারো ভেবেছিল বুঝি বেঁচে গেল। কিন্তু কবজি পর্যন্ত মানুষের রক্তে লাল করেছে যে সেই গোরজিয়াননাও ইটালিয়ান পুলিশের ভয়ে আমেরিকায় পালিয়ে এসে সমিতির একটা শাখার পত্তন করলে সেখানে। তারপর একদিন রাস্তায় জেনারো দেখল সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে–এল আমাদের বাড়িতে। এখানেও একটা গুপ্তচক্র প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে শমন ধরিয়েছে জেনারোকে বিশেষ দিনে প্রতিষ্ঠিত হবে রেড সার্কলের নতুন শাখার। মানে, নতুন করে আরম্ভ হবে রক্তারক্তি কাণ্ড।

কিন্তু এর চাইতেও বড়ো বিপদের তখনও বাকি। লক্ষ করেছিলাম সন্ধের দিকে বাড়ি এসে জেনারোর সঙ্গে ফালতু কথা বলে গেলেও গোরজিয়াননার রাক্ষুসে চোখের দৃষ্টি থাকত আমার দিকে। একদিন যা হবার তা হয়ে গেল, জেনারো বাড়ি ফেরার আগেই গোরজিয়াননা বাড়ি এল। আমাকে কোণঠাসা করে বললে ওর সঙ্গে পালিয়ে যেতে। ঠিক সেই সময়ে জেনারো ঢুকল ঘরে, প্রচণ্ড রাগে পাগল হয়ে গিয়ে মারতে মারতে পোরজিয়াননাকে বার করে দিলে বাড়ি থেকে। সেই থেকে শয়তান আর বাড়ি ঢোকেনি।

ক-দিন পরেই মিটিং হল রেড সার্কলের। মুখ অন্ধকার করে বাড়ি ফিরল জেনারো। সর্বনাশ হয়েছে। আমাদের পরম হিতৈষী ক্যাসটালোট্টিকে বাড়িসুদ্ধ ডিনামাইট মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ভার পড়েছে জেনারোর ওপর। পুরোটাই একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চালাকিটা গোরজিয়ানোর। রেড সার্কলের নিয়ম হল, সমিতির তহবিলে টাকা তোলার জন্যে ধনী ইটালিয়ানদের দোহন করা। প্রথমেই ক্যাসটালোট্টিকে ধরা হয়। তিনি এক পয়সা দিতে রাজি হননি–উলটে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। সমিতি তাই ঠিক করেছে এমন শিক্ষা

তাকে দেওয়া হবে যে অন্য ইটালিয়ানরা সুড় সুড় করে টাকা বের করে দেবে। লটারি হল কোন মূর্তিমানের ওপর ভারটা পড়বে ঠিক করার জন্যে। কী কায়দায় জানা নেই, থলির মধ্যে থেকে গোরজিয়াননা টেনে বার করল জেনারোর নাম লেখা রক্তবৃত্তের চাকতি–মুখে তার শয়তান হাসি। দেখেই বুঝল জেনারো–কী চায় গোরজিয়াননা। এটা তার পুরানো কায়দা। কাউকে দল থেকে এবং পৃথিবী থেকে জন্মের মতো সরিয়ে দিতে হলে এই কৌশল করে। নিজের প্রিয়জনকে মারবার ভার দেয়–না-পারলে দলকে লেলিয়ে দেয় তার পেছনে।

সমস্ত রাত আতঙ্কে কাঠ হয়ে হাতে হাত দিয়ে বসে রইলাম স্বামী-স্ত্রী। পরের দিন সন্ধে নাগাদ ডিনামাইট দিয়ে ক্যাসটালোট্টিকে বাড়িসমেত উড়িয়ে দেওয়ার সময় ধার্য হয়েছে। কিন্তু দুপুরেই লন্ডন রওনা হলাম দুজনে। যাওয়ার আগেই ক্যাসটালোট্টিকে আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে এলাম–পুলিশকে খবর দেওয়া হল যাতে ভবিষ্যতে তাঁর গায়ে আঁচ না-লাগে।

তারপর কী হয়েছে আপনারা জানেন। প্রতিহিংসা পাগল গোরজিয়ানোর তাড়া খেয়ে এখানেও লুকিয়ে থেকেছি। কিন্তু জেনারো ইটালি আর আমেরিকায় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে বলে অন্যত্র থেকেছে–কোথায় তা আমিও জানি না। গোরজিয়াননার শয়তানি আর ক্ষমতার শেষ নেই। কোনদিক দিয়ে আঘাত হানবে বোঝা সম্ভব নয় বলেই এইভাবে এখানে আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল আমার স্বামী। খবর পাঠাত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে। কিন্তু একদিন দেখলাম রাস্তায় দুজন ইটালিয়ান এ-বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। বুঝলাম পিশাচ পোরজিয়াননা আমার ঠিকানা জেনে ফেলেছে। তারপরেই

জেনারো খবর দিলে সামনের বাড়ির ওই জানলাটা থেকে সংকেত করবে। সংকেত এল ঠিকই কিন্তু বিপদের। হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। বুঝলাম, গোরজিয়াননা যে ওর নাগাল ধরে ফেলেছে, এই কথাটাই বলতে গিয়েছিল জেনারো। এখন দেখছি ও তৈরি হয়েই ছিল শত্রু নিধনের জন্যে। কাজ শেষ করে চলে গেছে। এখন আপনারাই বলুন কাঠগড়ায় ওঠবার মতো অপরাধ জেনারো করেছে কি না।

গ্রেগসনকে বলল আমেরিকান ডিটেকটিভ, নিউইয়র্কে কিন্তু মাথায় তুলে নাচা হত জেনারোকে নিয়ে। ব্রিটিশ আইন তাকে কী চোখে দেখবে আমার জানা নেই।

গ্রেগসন বলল, উনি যা বললেন, তা যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, তাহলে কারোরই কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু ওঁকে থানায় আসতে হবে। একটা ব্যাপার কিন্তু মাথায় ঢুকছে না। এ-ব্যাপারে আপনি কী করে জড়িয়ে পড়লেন মি. হোমস?

শেখবার জন্যে, আমি আবার পুরোনো পাঠশালার ছাত্র কিনা–শিক্ষার শেষ দেখতে পাই। ওহে ওয়াটসন, তোমারও একটা শিক্ষা হল। কিম্ভুতকিমাকার শব্দটার মানে যে ট্র্যাজেডিও হতে পারে–তা জানলে। এখনও আটটা বাজেনি। কভেন্ট গার্ডেনে গিয়ে বাজনা শোনা যাক। চটপট পা চালাও!

———-

টীকা

রক্তবৃত্তের রক্তাক্ত কাহিনি : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য রেড সার্কল প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ১৯১১-র মার্চ এবং এপ্রিল সংখ্যায়। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের লিলি লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় রাখা পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় কন্যান ডয়াল প্রথমে এই গল্পটির নাম দিয়েছিলেন দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লুমসবেরি লজার।

নিষ্পত্তি করে দিয়েছিলেন : এই কাহিনির বিষয়ে ওয়াটসন কখনো পাঠকদের জানাননি।

DA ILY GAZETTE : এই নামটি কাল্পনিক।

এই খবরই খুঁজছি : লোকটি বিজ্ঞাপন না-দিয়ে ডাকে চিঠি পাঠাল না কেন মিসেস ওয়ারেনের বাড়ির ঠিকানায়? প্রশ্ন তুলেছেন মার্টিন ডেকিনসহ কয়েকজন গবেষক কয়েকজন গবেষক।

পিনকারটন্স আমেরিকান এজেন্সি : অ্যালান পিনকারটনের প্রতিষ্ঠা করা গোয়েন্দা সংস্থা পিনকারটন ন্যাশনাল ডিটেকটিভ এজেন্সির বিষয়ে প্রথম খণ্ডে দ্য ভ্যালি অব ফিয়ার উপন্যাসের টীকা দ্রষ্টব্য।

লং আইল্যান্ড গুহা রহস্য : বেশ কিছু গবেষক জানিয়েছেন লং আইল্যান্ডে কোনো গুহা নেই।

লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান রহস্য

[দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অফ লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স]

আমার বুটজোড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শার্লক হোমস বললে, কিন্তু ভায়া, হঠাৎ টার্কিশ শখ হল কেন?

বেতের চেয়ারে হেলান দিয়ে দু-পা সামনে বাড়িয়ে বসে ছিলাম আমি। বন্ধুবরের চনমনে নজর ঠিক সেইদিকেই পড়েছে।

অবাক হলাম। বললাম, ইংলিশ জুতো। অক্সফোর্ড স্ট্রিটের ল্যাটিমারের দোকান থেকে কিনেছি।

অসহিষ্ণুভাবে হাসল হোমস।

বললে, ধুত্তোর! আমি বলছি টার্কিশ বাথের কথা! সস্তায় বাড়ির স্নান ছেড়ে হঠাৎ এত দামি টার্কিশ স্নানের দরকার পড়ল কেন?

কারণ দিনকয়েক ধরে নিজেকে বড়ো বুড়োটে আর বেতো মনে হচ্ছে। টার্কিশ বাথ শরীরটাকে ভেতর থেকে তাজা ঝরঝরে করে দেয় কিন্তু ভায়া আমার জুতো আর টার্কিশ

বাথের মধ্যে যোগসূত্রটা তোমার মতো যুক্তিসিদ্ধ ব্রেনের কাছে নিশ্চয় সুস্পষ্ট, আমার কাছে নয়। একটু খোলসা করে বলবে?

চোখ নাচিয়ে হোমস বললে, যুক্তির ধারাবাহিকতা অনুধাবন করতে পারলেই ঠিক খোলসা হয়ে যাবে। যেমন ধর, আজ সকালে তোমার সঙ্গে একজন একই গাড়িতে উঠেছিলেন।

একটু গরম হয়ে বললাম, এর মানে কি খোলসা করা হল? এ তো আর একটি ধাঁধা?

শাব-বাশ! বিক্ষোভ প্রকাশটা চমৎকার যুক্তিসংগত হয়েছে। শেষ বিষয়টা থেকেই তাহলে খোলসা পর্ব শুরু করা যাক। গাড়ির ব্যাপারটা ধরা যাক আগে। তোমার কোটের একদিকের হাতায় আর কাঁধে কাদার ছিটে লেগেছে লক্ষ করেছ? গাড়ির মাঝখানে বসলে কাদা ছিটকে গায়ে লাগলে দু-পাশে সমানভাবে লাগত–একপাশে লাগত না। তাই ধরে নিলাম, তুমি গাড়ির একপাশে বসে ছিলে–আর একপাশে বসেছিল অন্য এক ব্যক্তি।

এ তো সোজা ব্যাপার।

খুবই সোজা এক্কেবারে ছেলেখেলা, তাই তো?

বুটের সঙ্গে চান করার সম্পর্কটা এবার বলো?

সেটাও একটা ছেলেখেলা। তোমার বুটের ফিতেতে ডবল ফাঁস দেখছি–যা তুমি কখনোই নিজে লাগাও না। তার মানে, জুতোজোড়া তুমি খুলেছিলে। অন্য একজন পরিয়ে দিয়েছে। কে পরিয়ে দিয়েছে? মুচি নিশ্চয় নয়–কেননা জুতোজোড়া এই সেদিন কিনেছ। তাহলে নিশ্চয় টার্কিশ বাথ নিতে গেছিলে। নিয়ে অবশ্য ভালোই করেছ–কাজে লাগবে।

সেটা আবার কী?

এইমাত্র বললে না টার্কিশ বাথ নিয়েছ শরীরটাকে ঝরঝরে তাজা করার জন্যে তার মানে একটু হাওয়া বদলও দরকার। লসানে যাবে। ফার্স্টক্লাস টিকিট পাবে–রাজার হালে থাকার খরচ পাবে?

সে তো অতি চমৎকার হয়! কিন্তু কেন?

আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পকেট থেকে নোটবই বার করে হোমস বললে, নির্বান্ধব মেয়েরা যখন ভেসে ভেসে বেড়ায়, সমাজে কেবল অশান্তির সৃষ্টি করে। এক দল শেয়ালের মাঝে তারা তখন অসহায় মুরগি ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেরা নিরীহ হলেও এই ধরনের মেয়েদের জন্যেই অন্যেরা অনেক ধরনের অপরাধ ঘটিয়ে বসে। টাকা আছে বলেই দেশে দেশে এরা ভেসে বেড়ায়, ভালো ভালো হোটেলে থাকে–তারপর একসময়ে হারিয়ে যায়, শেয়ালের খপ্পরে পড়ে। লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সেরও এই ধরনের সাংঘাতিক কোনো বিপদ ঘটেছে বলে আমার মনে হয়।

দুনিয়ার নির্বান্ধব মেয়েদের নিয়ে কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত বিশেষ একজনের নাম বলায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

নোটবই দেখে হোমস বললে, লেডি ফ্রান্সেস হলেন পরলোকগত আর্ল অফ রাফটনের শেষ বংশধর। তোমার মনে থাকতে পারে, এ-বংশে সম্পত্তি পেয়েছে কেবল পুরুষেরাই–এই প্রথম একজন মহিলার বরাতে জুটেছে আর্লের সম্পত্তি। ওঁর সঙ্গে সবসময় এক ট্রাঙ্ক বোঝাই দামি দামি স্পেনীয় জড়োয়া গয়না থাকে। রুপোর জড়োয়া আর অদ্ভুতভাবে কাটা হিরেগুলো উনি কোনো ব্যাঙ্কে রাখেন না–যেখানে যান, সঙ্গে নিয়ে যান। লেডি ফ্রান্সেস সুন্দরী, মাঝবয়সি, কিন্তু একাকিনী। টাকাকড়ি মোটামুটি আছে, কিন্তু ট্রাঙ্কটিই ওঁর আসল সম্পত্তি।

কী হয়েছে ওঁর?

বেঁচে আছেন কি না সেইটাই তো বোঝা যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা গত চার বছর ধরে প্রতি হপ্তায় একখানা চিঠি লিখেছেন ওঁর এককালের গভর্নেস মিস ডবনি-কে। ইনি থাকেন ক্যামবারওয়েলে, অবসর নিয়েছেন। গত পাঁচ হপ্তা ধরে কোনো চিঠি পাচ্ছেন না লেডির কাছ থেকে। শেষ চিঠিটা লেখা হয়েছিল লসানের হোটেল ন্যাশনাল থেকে। খবর নিয়ে জানা গেছে হোটেল ছেড়ে নাকি চলে গেছেন–ঠিকানা রেখে যাননি। টাকার অভাব হবে না ভায়া–কিন্তু ওঁর অন্তর্ধান রহস্য ভেদ করতেই হবে–মিস ডবনির অনুরোধে এ-কেসে তাই নাক গলিয়েছি।

কিন্তু মিস ডবনি ছাড়া নিশ্চয় অন্য অনেককেও উনি চিঠি লেখেন?

চিঠি আর এক জায়গাতেই লেখেন–সেখানেও ঢু মেরে কিছু পায়নি। নির্বান্ধব একাকিনী লেডি মেয়েদের বাঁচতে হলে টাকা দরকার এবং সে-টাকা আসে ব্যাঙ্ক থেকে। ব্যাঙ্কের পাশবই ঘাঁটলেই অনেক জানা যায়। ওঁর ব্যাঙ্কের হিসেব আমিও দেখেছি। লসানের বিল মিটোতে সবশেষে একটা চেক কেটেছেন–কিন্তু টাকাটা মোটা অঙ্কের। তার মানে নিশ্চয় হাতে নগদ টাকা নিয়েই লসান ত্যাগ করেছেন। তারপর একটাই চেক কেটেছেন।

কাকে? কোথায়?

মিস মেরি ডেভিনের নামে। কোথায় কেটেছেন ধরা যাচ্ছে না। তবে চেকটা ভাঙানো হয়েছে ক্রেডিট লায়েনেসে–মঁপেলিয়রে–হপ্তা তিনেক আগে। পঞ্চাশ পাউন্ডের চেক।

মিস মেরি ডেভিন কে?

লেডি কারফাক্সের পরিচারিকা। কিন্তু তাকে এত টাকা দেওয়া হল কেন সেটাই আবিষ্কার করতে পারিনি। তোমার গবেষণায় রহস্য পরিষ্কার হবে, এ-বিশ্বাস আছে।

আমার গবেষণা মানে?

লসান অভিযানে স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে তোমার। তুমি তো জান, বুড়ো আব্রাহাম প্রাণের ভয়ে কাপছে, তাকে ছেড়ে এখন কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া লন্ডন ছেড়ে কোথাও বেরোতেও চাই না–প্রথমত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড বড়ো একা বোধ করে, দ্বিতীয়ত আমি কোথাও গেলেই লন্ডনের দুবৃত্তদল উল্লসিত হয়। তাই আমি থাকি, তুমি যাও। শব্দ পিছু দু-পেনি খরচ করে টেলিগ্রাম মারফত খবরাখবর পাঠিয়ো।

দু-দিন পরে লসানের হোটেল ন্যাশনাল পৌঁছোলাম। খুব খাতির করলেন ম্যানেজার মসিয়ে মোজার। বেশ কয়েক হপ্তা হোটেলে ছিলেন লেডি কারফাক্স। খুবই পছন্দ করত ভদ্রমহিলাকে। বয়স চল্লিশের বেশি নয়। এখনও সুন্দরী–যৌবনে অসাধারণ সুন্দরী ছিলেন সন্দেহ নেই। সঙ্গে দামি জড়োয়া ছিল কি না ম্যানেজারের জানা নেই। তবে চাকরবাকরেরা বলত, শোবার ঘরে একটা ভারী ট্রাঙ্কে সবসময়ে তালা লাগিয়ে রাখতেন। পরিচারিকা মেরি ডেভিনকেও সবার খুব পছন্দ ছিল। হোটেলেরই ওয়েটারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গিয়েছে। ঠিকানা পেতে অসুবিধে নেই। মেয়েটা থাকে মঁপেলিয়রের এগারো নম্বর রু দ্য এ্যজানে। যা শুনলাম, সব লিখে নিলাম। হোমস নিজেও এর চাইতে বেশি ঘটনা জোগাড় করতে পারত না।

শুধু একটা রহস্যই রয়ে গেল। লেডি কারফাক্সের হঠাৎ অন্তর্ধান ঘটল কেন, তা জানা গেল। লসানে বহাল তবিয়তে ছিলেন ভদ্রমহিলা। লেকের ধারের বিলাসবহুল কক্ষে পুরো ঋতুটা কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে নাকি ছিল। তা সত্ত্বেও তড়িঘড়ি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন অযথা এক হপ্তার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে। পরিচারিকা মেরির হবু বর জুলভাইবার্ট বললে, আগের দিন লম্বা কালচে দাড়িওলা এক ভদ্রলোক এসেছিলেন বলেই লেডি কারফাক্স

পালিয়ে গেছেন। লোকটা নাকি একটা আস্ত বর্বর! শহরেই কোথাও থাকে। লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে ম্যাডামের সঙ্গে তন্ময় হয়ে কী সব কথা বলছিল যেন। তারপর আবার আসতেই ম্যাডাম আর দেখা করেননি–পরের দিন হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে যান। সেই থেকেই মনে হয় লোকটার ভয়েই ম্যাডাম গা-ঢাকা দিয়েছেন। তবে মেরি ম্যাডামের চাকরি ছেড়ে দিল কেন, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কারণটা মেরি জানতে পারে–মঁপেলিয়রে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

শেষ হল অনুসন্ধান পর্বের প্রথম অধ্যায়। এবার যেতে হবে লেডি কারফাক্স লসান ছেড়ে যেখানে গেছে, সেখানে। কিন্তু এ-জায়গাটা পাঁচজনে জেনে ফেলুক, লেডি কারফাক্সের তা ইচ্ছে ছিল না বলেই বাক্সপ্যাটরায় খোলাখুলি বাদেন-এর লেবেল লাগাননি। কেউ পিছু নিয়েছিল বোধ হয়–তাই অনেক ঘুরপথে মালপত্র এবং নিজে পৌঁছেছেন খনিজ জলের উৎস রেনিজে। কুক-এর স্থানীয় অফিস থেকে জোগাড় করলাম এই খবর। টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিলাম হোমসকে। জবাবে পেলাম একটা কৌতুকতরসিত প্রশংসা।

বাদেন পৌঁছে খবরাখবর পেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। ইংলিশচার হফে দিন পনেরো ছিলেন লেডি কারফাক্স, এইখানেই সাউথ আমেরিকার ধর্মপ্রচারক ডক্টর স্লেসিংগার এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। ধার্মিক লোকের সঙ্গ পেলে বর্তে যায় নিঃসঙ্গ মহিলারা লেডি কারফাক্সও যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন ডক্টর স্লেসিংগারের সঙ্গ পেয়ে। ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে ভদ্রলোক স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়ে বসেছিলেন বলে প্রাণ কেঁদে ওঠে লেডি কারফাক্সের। তা ছাড়া, ব্যক্তিত্বও নাকি অসাধারণ রকমের। স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে এসে দিনরাত বারান্দায় বসে একটা প্রবন্ধ লিখছিলেন মিডিয়ানটিস রাজ্য

সম্পর্কে দু-পাশে বসে সেবা করতেন তাঁর স্ত্রী আর লেডি কারফাক্স। এসব খবর পেলাম ম্যানেজারের মুখে। একটু সেরে উঠলেই লন্ডন রওনা হন সস্ত্রীক ডক্টর স্লেসিংগার। সঙ্গে যান লেডি কারফাক্স। কিন্তু পরিচারিকা মেরি কাঁদতে কাঁদতে জন্মের-মতো-ওর-চাকরি-ছেড়ে-দিচ্ছি বলে চলে গেল কেন, তা ম্যানেজার জানে না। টাকাপত্র সব মিটিয়ে দেন ডক্টর স্লেসিংগার।

সবশেষে ম্যানেজার বললেন, আপনি কিন্তু একাই খোঁজ করতে আসেননি লেডির। হপ্তাখানেক লাগে আর একজন এসেছিলেন।

নাম বলেছে?

না। ইংরেজ ভদ্রলোক–একটু অস্বাভাবিক ধরনের।

শার্লক হোমসের পদ্ধতিতে ঘটনার মালা গাঁথার কায়দায় জিজ্ঞেস করলাম, বর্বর ধরনের লোক বোধ হয়?

ঠিক বলেছেন। হুবহু তাই। চাষাড়ে, চোয়াড়ে, জাঁহাবাজ। শৌখিন হোটেলে না-উঠে চাষাভুষোর হোটেলে উঠলেই বরং মানাত।

অন্ধকারে আলো দেখতে পেলাম এবার। ছিনেজোঁকের মতো লোকটা পেছন ধরে রয়েছে কেন! এর ভয়েই গোপনে পালিয়েছেন লেডি কারফাক্স–এখানেও সে এসে গেছে। লন্ডন

পর্যন্ত গিয়ে লেডির নাগাল ধরে ফেলেনি তো? কী মতলবে ঘুরছে পেছনে কুটিল লোকটা? নিশ্চয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র আছে এর পেছনে।

হোমসকে জানালাম রহস্যের মূল ধরে ফেলেছি। ও জবাবে লিখল, ডক্টর শ্লেসিংগারের বাঁ-কানটা কীরকম দেখতে বলো তো? মাঝে মাঝে ওর ইয়ার্কি মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। রসিকতার সময় এটা নয় বলেই পাত্তা দিলাম না টেলিগ্রামটার। তা ছাড়া টেলিগ্রাম যখন পেলাম, তখন আমি মেরির সন্ধানে মঁপেলিয়র পৌঁছে গেছি।

মেরি বললে, তার নিজের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে বলে আর সৎসঙ্গে লেডি কারফাক্সের দিন কাটছে দেখে চাকরি ছেড়ে দেয় সে। চাকরি ছাড়তে সুবিধে হয়ে গেল যখন লেডি কারফাক্স নিজেই একদিন তার সততা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ বসলেন। ইদানীং তার মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে গিয়েছিল। কারণ নিশ্চয় সেই চোয়াড়ে জাহাবাজ লোকটা। নিজের চোখে সে দেখেছে, লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে লেডি কারফাক্সের হাত ধরে মোচড়াচ্ছে বদমাশটা। মুখে না-বললেও, লেডি কারফাক্স যে তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই ডক্টর শ্লেসিংগারের আশ্রয়ে লন্ডন গিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই মেরির। সবসময় যেন ভয়ে-ভয়ে থাকতেন। এই পর্যন্ত বলেই চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল মেরি।–ওই দেখুন! বদমাশটা এখানে পর্যন্ত এসেছে?

জানলা দিয়ে দেখলাম বিরাটকায় খোঁচা-খোঁচা কালো দাড়িওলা এক পুরুষ ফুটপাত দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ির নম্বর দেখছে। নিশ্চয় আমার মতোই মেরিকে খুঁজছে। দেখেই আর দেরি করলাম না। ঝড়ের মতো রাস্তায় বেরিয়ে এলাম।

শুধোলাম, আপনি ইংরেজ?

পাক্কা শয়তানের মতো ভুরু কুঁচকে সে বললে, তা হয়েছেটা কী?

আপনার নামটা জানতে পারি?

না পারেন না।

ফাঁপরে পড়লাম। কিন্তু সোজা পথই অনেক সময়ে সেরা পথ।

তাই দুম করে জিজ্ঞেস করলাম, লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স কোথায়?

অবাক হয়ে চেয়ে রইল লোকটা।

আমি বললাম, ওঁর পেছনে ঘুরছেন কেন? কী করেছেন তাঁর? জবাব দিন! লোকটা বাঘের মতো গর্জে উঠে সটান লাফিয়ে পড়ল আমার ওপর এবং সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে টিপে ধরল আমার গলা। চোখে যখন সর্ষেফুল দেখছি, ঠিক তখনই পাশের ক্যাবারে থেকে নীল কুর্তা পরা খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা একজন ফরাসি মজুর তিরের মতো ছুটে এসে হাতের মোটা গেঁটো দিয়ে ধাঁই করে মারল শয়তানটার বাহুতে এক মারেই আঙুল ঢিলে হয়ে গেল রাসকেলের। আমাকে ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে

রাগে ফুলতে ফুলতে ভাবল বোধ হয় আমার টুপি টিপে ধরবে কিনা–পরক্ষণেই উল্কাবেগে ঢুকে গেল আমি যে-কটেজ থেকে বেরিয়েছি, সেই কটেজে।

ফরাসি মজুরটা তখনও আমার পাশে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। ঘুরে দাঁড়ালাম ধন্যবাদ দিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে বললে, ভায়া ওয়াটসন, খুব হয়েছে। আজ রাতের এক্সপ্রেস ট্রেনে চলো আমার সঙ্গে লন্ডনে।

এক ঘণ্টা পর হোটেলে আমার প্রাইভেট রুমে বসে চিরাচরিত ধড়াচূড়া পরে স্বভাবসিদ্ধ নীরস কণ্ঠে বললে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো কেন সে ঠিক বিপদের মুহূর্তটিতে আমার পাশে আসতে পেরেছিল। লন্ডনের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ায় বেরিয়ে পড়েছিল লন্ডন ছেড়ে। মজুর সেজে আগেভাগে এসে বসে ছিল মপেলিয়রে আমার পথ চেয়ে।

ওয়াটসন, অপূর্ব তদন্ত করেছ। সবকটা বিরাট ভুলই নিখুঁতভাবে করে গেছ। যেখানে গেছ, সেখানেই সন্ত্রাস ছড়িয়ে এসেছ, কিন্তু লাভ হয়েছে অষ্টরম্ভা।

তিক্ত কণ্ঠে বললাম, তুমি নিজে তদন্ত করলেও পঙ্করম্ভা পেতে।

আরে ভায়া, আমি তো আসল কাজটা করে বসে আছি। অনারেবল ফিলিপ গ্রিনকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। এই হোটেলেই তিনি রয়েছেন। সার্থক তদন্ত শুরু হবে তো তাকে দিয়েই।

বলতে-না-বলতেই ট্রে-র ওপর একটা কার্ড নিয়ে এল চাকর–পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল দাড়িওলা সেই মারকুটে বদমাশটা–যার গলা টিপুনির ঠেলায় এখনও টনটন করছে কণ্ঠদেশ। আমাকে দেখেই কটমট করে চাইল লোকটা।

বলল, এ আবার কী, মি. হোমস? আপনার চিঠি পেয়ে এসে এ-লোকটাকে এখানে দেখছি কেন?

ইনি আমার পুরোনো দোস্ত এবং সহযোগী ডক্টর ওয়াটসন–এ-কাজে ইনি আমাকে সাহায্য করছেন।

ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিশাল রোদে পোড়া দু-হাত বাড়িয়ে দিলেন আগন্তুক।

বললেন, আশা করি খুব লাগেনি। লেডি কারফাক্সকে আমি লোপাট করেছি বলায় মাথার ঠিক রাখতে পারিনি, আজকাল আমার স্নায়ুর অবস্থা মোটেই ভালো নয়–ধাঁ করে রেগে যাই। এ-পরিস্থিতি আর সইতে পারছি না, মি. হোমস, আগে বলুন আমার খবর পেলেন কোত্থেকে?

লেডি ফ্রান্সেসের গভর্নর মি. ডবনির কাছ থেকে।

তাই নাকি! সুশান বুড়িকে কি এত সহজে ভোলা যায়!

উনিও আপনাকে ভোলেননি। আপনি দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার আগে থেকেই তো চেনেন আপনাকে।

তাহলে তো সব খবরই জেনে ফেলেছেন। যৌবনে বড়ো দুর্দান্ত জীবনযাপন করছি। লেডি কারফাক্স তা জেনে ফেলে। মনটা খিঁচড়ে যায় আমার ওপর। সব সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়–অথচ ভুলতে পারেনি। আমার কুকীর্তি ওকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে কিন্তু মন থেকে আমার স্মৃতি মুছতে পারেনি। আমার প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসায় এতটুকু চিড় খায়নি। সেই কারণেই বিয়ে পর্যন্ত করেনি। বারবারটনে গিয়ে দু-পয়সা করলাম। ভাবলাম এবার ওর মনটা নরম করা যাক। লসানে গিয়ে কাকুতিমিনতি করলাম। মনটা সত্যিই নরম হয়েছে দেখলাম। তারপরেই খবর পেলাম লসান ছেড়ে কোথায় যেন চলে গেছে। আসলে ওর মনের জোর সাংঘাতিক। ভাঙবে তবু মচকাবে না। খোঁজখবর নিয়ে এলাম বাদানে। শুনলাম, এখানেই থাকে ওর পুরানো পরিচারিকা। তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসন আমাকেই ওর অন্তর্ধানের জন্যে দায়ী করায় মাথায় খুন চেপে গিয়েছিল। যাক গে সে-কথা, লেডি ফ্রান্সেস কোথায় আপনার জানা থাকলে দয়া করে বলুন।

অদ্ভুতভাবে গম্ভীর হয়ে গেল হোমস। বললে, সেইটাই তো জানতে চাই। আপনার লন্ডনের ঠিকানাটা কী, মিস্টার গ্রিন?

ল্যাংহ্যাম হোটেলে পাবেন আমাকে।

তাহলে আপনি সেখানেই যান। হোটেল ছেড়ে নড়বেন না–দরকার হলে যেন ডাকলেই পাই। মিথ্যে আশা দিতে চাই না–তবে যা করবার সবই করব কথা দিচ্ছি। আমার এই কার্ডটা রাখুন–আপনিও যোগাযোগ রাখবেন। ওয়াটসন, বাক্সপ্যাটরা গুছিয়ে নাও। মিসেস হাডসনকে আমি টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, কাল সাড়ে সাতটায় বুভুক্ষু দুই ট্রেনযাত্রীর জন্যে ভালোমন্দ খাবার যেন তৈরি থাকে।

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছেই হোমস দেখল একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে রয়েছে ওর নামে। খুলে পড়ল। আগ্রহ চিকমিকিয়ে উঠল দুই চোখে, ছুঁড়ে দিল আমার দিকে। আমি দেখলাম শুধু দুটো শব্দ লেখা রয়েছে টেলিগ্রামে–খাঁজকাটা ছেড়া। টেলিগ্রাম এসেছে বাদেন থেকে।

মানে? শুধোই আমি।

সব মানে তো ওরই মধ্যে। তোমাকে বলেছিলাম পাদরি সাহেবের বাঁ-কানটা দেখতে কীরকম জানাতে–জানাওনি। মনে পড়ে?

আমি তো তখন বাদেন ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছি–জানাব কী করে?

সেইজন্যেই ইংলিশচার হফের ম্যানেজারকে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলাম। এই তার জবাব।

কিন্তু মানেটা কী?

মানেটা হল, আমরা অসাধারণ ছুঁদে আর বিপজ্জনক এক ক্রিমিনালের সঙ্গে লড়তে নেমেছি! সাউথ আমেরিকায় প্রাতঃস্মরণীয় পাদরি সাহেব ডক্টর শ্লেসিংগারের আসল নাম হোলি পিটার্স অস্ট্রেলিয়ার বদমাশ শিরোমণি হোলি পিটার্স–যার কীর্তিকাহিনি গায়ে কাঁটা জাগিয়ে ছাড়ে। শয়তানটার কুকাজের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল ধর্মপ্রাণা মেয়েদের ধর্মের কথায় ভুলিয়ে ফাঁদে ফেলা। ওর এই বৈশিষ্ট্য জানা আছে বলেই ডক্টর শ্লেসিংগারের কাহিনি শুনে সন্দেহ হয় আমার–যাচাই করার জন্যে পাদরির বাঁ-কানের বর্ণনা চেয়েছিলাম। কেননা, ১৮৮৯ সালে অ্যাডিলেডে১১ মারপিট করতে গিয়ে কুকুর-কামড়ানোর মতো কামড়ানো হয় ওর বাঁ-কান। ওর সঙ্গে স্ত্রীর ভূমিকায় যে স্ত্রীলোকটি থাকে, তার আসল নাম ফ্রেজার জাতে ইংরেজ। এই দুজনের পাল্লায় যখন পড়েছেন লেডি ফ্রান্সেস, তখন ধরে নিতে পারি তিনি বেঁচে নেই, অথবা এমন অবস্থায় আছেন যে পাঁচ হপ্তায় একখানা চিঠিও লিখতে পারেননি। হতে পারে ওরা লন্ডনেই পৌঁছোয়নি। তবে সে-সম্ভাবনা কম। কেননা, কন্টিনেন্টাল পুলিশের কাছে এসব বদমাশদের বাঁদরামি গোপন থাকে না–চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। তাই আমার ধারণা লন্ডনেই কোথাও এরা ঘাপটি মেরে আছে–কিন্তু ঠিক কোথায় বলা সম্ভব নয়। আপাতত খেয়েদেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করা যাক। সন্ধে নাগাদ স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে লেসট্রেডের সঙ্গে দেখা করব।

কিন্তু লেসট্রেড আর হোমস দুজনেই ঘোল খেয়ে গেল। সাত-সাতটা দিন কতরকম চেষ্টাই করা হল। কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, বদমাশদের বিবরে হানা দেওয়া হল, ডক্টর শ্লেসিংগারের যেখানে-যেখানে যাওয়া সম্ভব সব জায়গাতেই ছুঁ মারা হল–কিন্তু

মহানগরীর কোন গর্তে যে তিনটি মানুষ ঢুকে বসে রয়েছে, সে-হদিশ পাওয়া গেল না। সাত দিন পরে আচমকা খবর এল ওয়েস্টমিনস্টার রোডে বেভিংটনের দোকানে একটা স্পেনীয় ডিজাইনের রুপোর জড়োয়া গহনা বাধা দেওয়া হয়েছে। বাঁধা যে দিয়েছে, তার চেহারাটা পাদরির মতন। লম্বা-চওড়া, দাড়ি গোঁফ পরিষ্কার কামানো। কানের চেহারা লক্ষ করা যায়নি তবে বাদবাকি চেহারার সঙ্গে স্লেসিংগারের চেহারার মিল আছে।

এই সাতদিনের মধ্যে ল্যাংহ্যাম হোটেল থেকে মিস্টার গ্রিন তিনবার এসেছেন নিখোঁজ প্রেয়সীর খবর নিতে। উৎকণ্ঠায় যে তাঁর অবস্থা শোচনীয়, তা পোশাক-আশাকের ঢিলেঢালা অবস্থা দেখেই মালুম হয়েছে। তৃতীয়বার যখন এলেন, ঠিক তখনই জড়োয়া গয়না বাঁধা দেওয়ার খবরটা এসেছে।

হোমস খবরটা দিল মিস্টার গ্রিনকে। বললে, গয়না বাঁধা দেওয়া শুরু করেছে রাসকেল।

আকুল কণ্ঠে গ্রিন বললেন, আমাকে কিছু একটা করতে দিন মি. হোমস। কিন্তু গয়না বাঁধা দেওয়ার মানে কি এই নয় যে সর্বনাশ হয়ে গেছে লেডি ফ্রান্সেসের?

গম্ভীর হয়ে হোমস বললে, কয়েদ করেও যদি রেখে দেয় মুক্তি দিতে গিয়ে এখন নিজেরাই বিপদে পড়বে। কাজেই সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতির জন্যেই তৈরি থাকা ভালো।

কী করতে বলেন আমাকে?

ওরা কি আপনাকে চেনে?

না।

তাহলে বেভিংটনের দোকানে গিয়ে ওত পেতে থাকুন–আবার আসতে পারে গয়না বাঁধা দিতে। অন্য দোকানেও যেতে পারে, তবে বেভিংটন টাকা দিয়েছে ভালো, প্রশ্নও করেনিকাজেই ওর কাছেই আবার আসাটা সম্ভব। আপনি কিন্তু হামলা করবেন না। শুধু পেছনে গিয়ে বাড়িটা দেখে আসবেন। কথা দিন আমাকে না-জানিয়ে আগ বাড়িয়ে কিছু করতে যাবেন না।

দু-দিন নতুন খবর আনতে পারলেন না অনারেবল ফিলিপ গ্রিন (এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, ইনি বিখ্যাত অ্যাডমিরাল ফিলিপ গ্রিনের ছেলে ক্রিমিয়ান যুদ্ধে অ্যাজোভ সাগরের নৌবাহিনী পরিচালনা করে যিনি বিখ্যাত)। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় উদ্রান্ত চেহারা নিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাঁপাতে হাঁপাতে বিবর্ণ মুখে ঘরে ঢুকলেন ভদ্রলোক।

পেয়েছি! ওকে পেয়েছি!

উত্তেজনায় কথা আটকে গেল ভদ্রলোকের। হোমস সান্ত্বনা দিয়ে ঘরে বসিয়ে দিল চেয়ারে।

বলল, আস্তে আস্তে বলুন।

স্লেসিংগারের সঙ্গে যে মেয়েছেলেটা থাকে, সে এসেছিল। যে গয়নাটা বাঁধা দিয়ে গেল, সেটা কিন্তু লেডি ফ্রান্সেসের। মাগির চোখ দুটো বেজির মতো খরখরে। মাথায় বেশ লম্বা, ফ্যাকাশে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্লেসিংগারের সঙ্গিনীই বটে।

দোকান থেকে বেরিয়ে গেল কেনসিংটন রোডে–পেছনে আমি। ঢুকল একটা আন্ডারটেকারের–দোকানে যাদের কাজ মড়া কবর দেওয়া।

চমকে উঠল হোমস। কেঁপে উঠল গলা। বুঝলাম, কীরকম তোলপাড় চলছে ভেতরে। ধূসর শীতল মুখের প্রতিটা মাংসপেশি শক্ত হয়ে গেল কথাটা শুনেই।

তারপর?

কঁচুমাচু মুখে দোকানি মেয়েটা বললে, একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব বলুন, বেমক্কা সাইজ, বড় বড়ো। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। আমাকে দেখেই চুপ মেরে গেল দুজনেই। আমি ধানাইপানাই করে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করে বেরিয়ে এলাম দোকান থেকে।

খুব ভালো করেছেন। তারপর কী হল?

মাগিটা বেরিয়ে এল–সন্দিগ্ধচোখে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে একটা ছ্যাকড়াগাড়িতে উঠে বসল। আমাকে দেখতে পায়নি–লুকিয়ে ছিলাম। কপাল ভালো একটা গাড়ি পেয়ে গেলাম। পেছন পেছন গেলাম। সামনের গাড়ি থামল ব্রিক্সটনের ছত্রিশ নম্বর পোল্টনি স্কোয়ারে। আমি সামনে দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে নামলাম পার্কের কোণে। ওখান থেকেই নজর রাখলাম বাড়ির ওপর।

দেখলেন কাউকে?

ওপরের সব জানলা বন্ধ–অন্ধকার। নীচের তলায় একটা জানলাই কেবল খোলা–তাও খড়খড়ি দিয়ে ঢাকা। ভেতরে কাউকে তাই দেখতে পাইনি। হঠাৎ একটা ভ্যান এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। দুজন লোক ধরাধরি করে একটা জিনিস নামিয়ে নিয়ে গিয়ে ঢুকল হল ঘরের দরজা দিয়ে। মিস্টার হোমস, জিনিসটা একটা কফিন।

আ-চ্ছা!

আর একটু হলেই তেড়েমেড়ে ঢুকে পড়তাম ভেতরে। দরজাটা ফাঁক করে ধরেছিল মাগিটা লোক দুজনকে ঢুকিয়ে নেওয়ার জন্যে এই সময় দেখল আমাকে। দেখেই চিনেছে নিশ্চয় চমকে উঠেই দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। আপনাকে কথা দিয়েছি নিজে কিছু করব না—তাই ছুটতে ছুটতে আসছি খবরটা দিতে।

খসখস করে একটা কাগজে কী লিখতে লিখতে হোমস বলল, অপূর্ব কাজ করেছেন। ওয়ারেন্ট ছাড়া এখন আর কিছু করা মানেই বেআইনি কাজ করা। আপনি এটা নিয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে চলে যান। লেসট্রেড ওয়ারেন্ট বার করে দেবে। জড়োয়া গয়না পাওয়া গেছে এর সাহায্যেই লেসট্রেড পারবে শমন ধরাতে।

কিন্তু এর মধ্যে ওকে তো খুন করেও ফেলতে পারে? কফিনটা এল কেন? কার জন্যে?

অযথা সময় নষ্ট করবেন না–ও-ব্যাপারটা ছেড়ে দিন আমাদের ওপর, মিস্টার গ্রিনকে ঠেলেঠুলে ঘর থেকে বিদেয় করে আমার দিকে ফিরল হোমস। ওয়াটসন, উনি গেলেন আইনের পথে–দরকার পড়লেই চিরকাল যা করেছি। পরিস্থিতি খুব খারাপ–চরম ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া পথ দেখছি না। এক্ষুনি চল পোল্টনি স্কোয়ার যাই।

পার্লামেন্ট হাউসের পাশ দিয়ে আর ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের ওপর দিয়ে নক্ষত্রবেগে ছুটল আমাদের গাড়ি। ভেতরে বসে হোমস বললে, ওয়াটসন, লেডি ফ্রান্সেসকে ছুতোনাতা করে পরিচারিকার কাছ থেকে সরিয়ে রাসকেলরা এনে ফেলে লন্ডনের ওই ভাড়া বাড়িটায়। চিঠিপত্র যদিও-বা লিখে থাকেন লেডি–সে-চিঠি এরা গায়েব করেছে। এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল গয়না দখল করা–এতদিনে সে-কাজও করেছে। তাই একটা একটা করে গয়না বাঁধা দিতে আসছে। এখন আর লেডি কারফাক্সকে জ্যান্ত ছেড়ে দেওয়া যায় না তাই তাকে খুন করাই ওদের পক্ষে মঙ্গল।

সেটা তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এবার আর এক লাইন ধরে চিন্তা করা যাক। দু-লাইনের যুক্তি যেখানে কাটাকুটি করবে– সেইটাই আসল সত্যি বলে জানবে। আমরা এখন লেডিকে ছেড়ে কফিনকে নিয়ে চিন্তা করব। বাগান খুঁড়ে লাশ পুঁতে দিলেই যখন ল্যাটা চুকে যায়, তখন এত হেপাজত করে কফিন আনা হল কেন? পুরো ব্যাপারটাই আইনসংগত হচ্ছে। তাই না? মেডিক্যাল সার্টিফিকেট আর সরকারি অনুমতি না-থাকলে কাউকে কফিনে করে কবর দেওয়া যায় না। তাহলে কি বিষ খাইয়ে অথবা এমনভাবে লেডিকে খুন করা হয়েছে যে ডাক্তারের চোখে ধূলো দেওয়া হয়েছে? ডাক্তার কিন্তু হাতের লোক না হলে এ-অবস্থায় লাশের ধারেকাছেও কেউ আসতে দেয় না। তবে কি ডাক্তার ওদেরই লোক? এটা কিন্তু সম্ভব বলে মনে হয় না।

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট জাল করেনি তো?

সেটা আরও বিপজ্জনক, ওয়াটসন। এসে গেছি–ওই তো বন্ধকি দোকান ছাড়িয়ে এলাম। দাঁড়াও হে গাড়োয়ান! নামমা ওয়াটসন। তোমার চেহারা এমনি যে দেখলেই বিশ্বাস হয়— কারো সন্দেহ হয় না। সোজা ঢুকে পড়ো। জিজ্ঞেস করো, আগামীকাল পোল্টনি স্কোয়ারের কফিন কবরে যাবে ক-টার সময়ে।

বিনা দ্বিধায় দোকানের মেয়েটি বললে, সকাল আটটার সময়ে।

হোমস শুনে বললে, দেখলে তো, যেভাবেই হোক রাস্তা পরিষ্কার রেখেছে রাসকেলরা–সার্টিফিকেট জোগাড় করেছে আইনসংগতভাবে কবর দিতে চলেছে লেডিকে। আর দেরি করা চলে না। আইনের পথে যেতে গেলে দেরি হয়ে যাবে–পুলিশের আশায় হাত পা গুটিয়ে বসে থাকা আর সম্ভব নয়। কপাল ঠুকে দেখাই যাক না কেন। হাতিয়ার আছে কাছে?

ছড়িটা আছে!

ওতেই হবে। আইনের রক্তচক্ষুকে ওরা যখন আর পরোয়া করে না, তখন বেআইনিভাবে সোজা হামলা জুড়ে দেখা যাক কাজ হয় কি না। ওহে গাড়োয়ান, তুমি যেতে পারো। চলো ওয়াটসন।

পোল্টনি স্কোয়ারের মাঝামাঝি জায়গায় একটা বড়োসড়ো কালচে রঙের বাড়ির সামনে গিয়ে খুব জোরে ঘন্টা বাজিয়ে দিল হোমস। সঙ্গেসঙ্গে কপাট খুলে দাঁড়াল ঢ্যাঙা মতন একটা মেয়েছেলে।

হল ঘরের ম্যাড়মেড়ে আলোর পটভূমিকায় কালো ছায়ামূর্তিটাই কেবল চোখে পড়ল আমাদের। শুধোল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, কী চাই?

ডক্টর স্লেসিংগারের সঙ্গে কথা বলতে চাই, ঝটিতি জবাব দিল হোমস।

ও-নামে এখানে কেউ থাকে না, বলেই যেই দরজা বন্ধ করতে যাবে, একটা দরজার ফাঁকে পা ঢুকিয়ে দিল হোমস।

বলল কড়া গলায়, যে-নামেই থাকুক না কেন, দেখা করতে চাই।

দ্বিধায় পড়ল স্ত্রীলোকটি। পরক্ষণেই দু-হাট করে দরজা খুলে ধরে বললে, আসুন ভেতরে। আমার স্বামী কাউকে ডরায় না। হল ঘরের ডান পাশে বসবার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে, বসুন। আসছেন মিস্টার পিটার্স।

বেরিয়ে গেল মেয়েটি। পোকায় খাওয়া ধুলোয় ভরা ঘরটার চেহারা ভালো করে দেখবার আগেই বেড়ালের মতো নিঃশব্দ চরণে ঘরে ঢুকল সৌম্যদর্শন টাক মাথা দাড়ি গোঁফ কামানো বিরাট একটা লোক–মুখটা আশ্চর্য লাল, পুরন্ত গাল–কিন্তু ঠোঁটের গড়ন নিষ্ঠুর, পাশবিক।

বলল সহজ সুরে, ভুল করেছেন মনে হচ্ছে। যাকে খুঁজছেন, তাকে আর একটু এগোলেই–

শক্ত গলায় হোমস, ব্যস, ওতেই হবে। নষ্ট করার মতো সময় আমার নেই। তুমি হেনরি পিটার্স ওরফে রেভারেন্ড ডক্টর শ্লেসিংগার। আমার নাম শার্লক হোমস।

চমকে উঠল লোকটা। খরখরে চোখে চাইল ভয়ানক মানুষটার দিকে। বললে চিবিয়ে চিবিয়ে, মিস্টার হোমস, আপনার নাম শুনে আঁতকে ওঠার কারণ দেখি না। বিবেক আমার পরিষ্কার। কী জন্যে এসেছেন এখানে?

বাদেন থেকে সঙ্গে যাকে পাকড়ে এনেছ, সেই লেডি কারফাক্সকে নিয়ে কী করেছ জানতে চাই।

ভদ্রমহিলা কোথায় আমাকে যদি বলেন তো আমারও খুব উপকার হয়। প্রায় এক-শো পাউন্ড পাই তার কাছ থেকে। বাদেনে অন্য নাম নিয়েছিলাম ঠিকই, সেই সময়ে ভদ্রমহিলা ভাব জমালেন আমার স্ত্রীর সঙ্গে। আঠার মতো পেছনে লেগে থেকে আসেন লন্ডনেও। হোটেলের বিল, টিকিট–সব, সব আমি মিটিয়েছি। লন্ডনে এসেই হাওয়া হয়েছেন–ফেলে গেছেন কয়েকটা যাচ্ছেতাই সেকেলে গয়না–দেনা মিটোনোর জন্যে নিশ্চয়ই। মিস্টার হোমস, খুঁজে বার করুন তাকে আর আমার দেনাটা মিটিয়ে দিন।

খুঁজে বার করব বলেই তো এসেছি। এ-বাড়ি তন্নতন্ন করে দেখব এখুনি।

শমন এনেছেন?

পকেট থেকে রিভলভারটা একটু টেনে বার করে দেখাল শার্লক হোমস, আপাতত এই শমনেই কাজ হবে–এর চাইতে ভালো শমন পরে আসছে।

আচ্ছা ছিঁচকে চোর তো আপনি!

প্রফুল্ল কণ্ঠে হোমস বললে, আমার এই স্যাঙাতটিও কিন্তু বিপজ্জনক লোক। এ-বাড়ি তল্লাশ করব দুজনেই।

দরজা খুলে ধরে পিটার্স বললে, অ্যানি পুলিশ ডাক! মেয়েলি স্কার্টের খসখস আওয়াজ শুনলাম সিঁড়িতে দুম করে খুলেই বন্ধ হয়ে গেল হল ঘরের দরজা।

ওয়াটসন! দ্রুত কণ্ঠে বললে হোমস, সময় খুব কম। পিটার্স, বাধা দিতে এস না–জখম হবে। কফিনটা কোথায়?

কফিন নিয়ে আপনার কী দরকার? একটা ডেডবডি রয়েছে ওর মধ্যে।

আমি দেখব বডিটা।

আমি দেখতে দেব না।

তাহলে নিজেই দেখব,হন হন করে হল ঘরে ঢুকে গেল হোমস। পাশের দরজাটা আধখোোলা দেখে ঢুকে পড়ল সেই দরজা দিয়ে। খাবার ঘর সেটা। ম্যাড়মেড়ে গ্যাসের আলোটা বাড়িয়ে দিতেই চোখে পড়ল টেবিলের ওপর শোয়ানো কফিনটা। ডালা খুলে ফেলল হোমস। ভেতরে শুয়ে সিটিয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধা। হাজার অনাহার,

উৎপীড়ন অসুখেও এ-চেহারায় আসতে পারেন না সুন্দরী লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স। যুগপৎ বিস্ময় আর স্বস্তিবোধ ফুটে উঠল হোমসের চোখে-মুখে।

হে ভগবান! এ যে দেখছি অন্য একজন।

মিস্টার শার্লক হোমসও ভুল করেন তাহলে! পেছন পেছন এসে মিষ্টি মিষ্টি করে বলল পিটার্স।

কে এ?

আমার স্ত্রীর বুড়ি নার্স–রোজ স্পেন্ডার। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি থেকে নিয়ে আসি তিনদিন আগে, তেরো নম্বর ফেয়ার ব্যাঙ্ক ভিলা থেকে ডক্টর হর্সোমকে এনে চিকিৎসা করাই এই তিনদিন–ঠিকানাটা মুখস্থ করে ফেলুন মিস্টার হোমস। তিনদিন সবরকম চেষ্টা করেও লাভ কিছু হল না–মারা গেলেন তৃতীয় দিনে। ডাক্তার বলছেন বুড়ি হয়েছে বলে টিকে থাকতে আর পারল না–আপনি কী বলবেন সেটা আপনিই ভেবে নিন। ধার্মিক খ্রিস্টানের মতোই তাকে বাঁচাতে গিয়েছি, না-পেরে কবর দেওয়ার ব্যবস্থাও করছি। কেনিংটন রোডের স্টিমসন কোম্পানিকে বলে দিয়েছি কাল সকাল আটটায় যেন কবর দেওয়া হয় কফিনটা। হ্যাঁদা পেলেন মিস্টার ছিদ্রান্বেষী? আস্ত গাধার মতো এমন ভুলও মানুষে করে? কফিনের ডালা খোলার সময়ে আপনার হাঁ-করা চোখ-ঠেলে বেরিয়ে আসা মুখের চেহারাটার ফটো তুলে রাখলে পারতাম। ভেবেছিলেন দেখবেন অন্তিম

শয়ানে শুয়ে আছেন লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স। তার বদলে দেখতে পেলেন নব্বই বছরের এ-বুড়িকে।

ঠাট্টা বিদ্রুপের তুফানের মধ্যেও অবিচলিত রইল শার্লক হোমস। ভেতর ভেতর যে ফুঁসছে, তা বোঝা গেল দু-হাত মুঠো করা দেখে।

বলল, বাড়িটা তল্লাশ করব।

করা বার করছি আপনার! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে পিটার্স। বাইরের প্যাসেজে শোনা গেল নারীকণ্ঠ এবং একাধিক পদশব্দ। এইদিকে আসুন, এই দেখুন–এই দুটো লোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে হামলা জুড়েছে–কিছুতেই বেরোতে চাইছে না। ঘাড় ধরে বের করে দিন তো।

দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল একজন সার্জেন্ট আর একজন কনস্টেবল। পকেট থেকে নিজের কার্ড বার করে এগিয়ে দিল হোমস, এই আমার নাম-ঠিকানা। ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন।

আপনাকে কে না চেনে, মিস্টার হোমস। কিন্তু স্যার শমন ছাড়া এখানে আর থাকতে তো পারবেন না, বললে সার্জেন্ট।

তা পারব না।

গ্রেপ্তার করুন! চিৎকার করে বলল পিটার্স।

সেটা আমার কাজ, আমি বুঝব, গ্রামভারী চালে বললে সার্জেন্ট। মিস্টার হোমস, আপনার কিন্তু এখানে আর থাকা হবে না।

চলো, ওয়াটসন।

রাস্তায় এসে রাগে অপমানে গরম হয়ে গেলাম আমি–হোমস কিন্তু নির্বিকার। পেছন পেছন সার্জেন্ট বেরিয়ে এসে বললে, মিস্টার হোমস, আমি দুঃখিত। কিন্তু আইন যা, তা মানতেই হবে।

ঠিক কথা, সার্জেন্ট। আপনার আর কিছু করার ছিল না।

কারণ ছিল বলেই বাড়ি ঢুকেছিলেন বুঝতে পারছি। আমাকে দিয়ে যদি কোনো সাহায্য হয় তো বলতে পারেন।

একজন নিখোঁজ লেডির খোঁজে গিয়েছিলাম। বাড়ির মধ্যেই আছেন ভদ্রমহিলা। শমনও এল বলে।

বেশ তো, আমি চোখ রাখছি। খবর পেলেই জানাব আপনাকে।

সবে তখন ন-টা বাজে। তদন্ত চালিয়ে গেলাম পুরোদমে। সোজা গেলাম ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস আতরশালায়। সত্যিই দিন তিনেক আগে এক সহৃদয় দম্পতি এসে তাদেরই এক পুরোনো চাকরানিকে নিয়ে গেছে। মারা গেছে বুড়ি? আশ্চর্য কিছু নয়। অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

এর পর গেলাম ডাক্তারের কাছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্রেফ জরায় ধুকতে ধুকতে পরলোকে গিয়েছে বুড়ি। আমি তো গিয়ে দেখলাম শেষ হয়ে গিয়েছে। লিখে দিলাম ডেথ সার্টিফিকেট। না, বাড়ির মধ্যে সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েনি। তবে হ্যাঁ, একটা খটকা লেগেছে। ওইরকম দানধ্যানের মন আর পকেটের জোর যাদের, তাদের বাড়িতে একটা চাকর পর্যন্ত নেই, এ কেমন কথা?

শেষকালে গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে। গিয়ে শুনলাম শমন বার করা নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে বেচারি লেসট্রেড। দেরি একটু হবেই। আগামীকাল সকালের আগে সই পাওয়া যাবে না ম্যাজিস্ট্রেটের। শার্লক হোমস যদি লেসট্রেডের সঙ্গে সকাল নটা নাগাদ একটু তদবির করেন তো ভালো হয়। মাঝরাত নাগাদ এল সার্জেন্ট। বললে, বিশেষ কিছু খবর নেই। বিশাল বাড়িটার নানান জানলায় মাঝে মাঝে কেবল আলোর ঝলক দেখা গেছে।

মেজাজ খিঁচড়ে যাওয়ায় কথা বলার মুডে পর্যন্ত রইল না হোমস। শুতে যাওয়ার সময়ে দেখলাম পাইপের পর পাইপ কড়া তামাক টেনে চলেছে আর সরু সরু কাঁপা আঙুল

দিয়ে সমানে টরে টক্কা বাজনা বাজিয়ে চলেছে চেয়ারের হাতলে। এ-লক্ষণ আমার চেনা। সমস্যার অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধান মাথার মধ্যে নিয়ে তোলপাড় করার সময়ে এমনি অস্থির হয়ে পড়ে ও। সারারাত বেশ কয়েকবার তন্দ্রার ঘোরে শুনলাম পায়চারি করছে বাড়িময়। সকাল বেলা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল ঘরে। পরনে ড্রেসিং গাউন, কিন্তু ফ্যাকাশে মুখ আর গর্তে-বসা চোখ দেখেই বুঝলাম নিদ্রাদেবীকে বিমুখ করেছে সারারাত।

কবর দেওয়া হবে ক-টার সময়ে ওয়াটসন? আটটা তো? এখন বাজে সাতটা কুড়ি। এখনও সময় আছে, ওয়াটসন, এখনও সময় আছে। মাথায় আমার কী আছে বলতে পার? ব্রেনটা কি ঘুমিয়েছিল? তাড়াতাড়ি নাও, ঝটপট গা তোলো! জীবন ঝুলছে সুতোর ওপর কে জানে এতক্ষণে মরণ এসে গেল কি না। এ ভুলের জন্যে কোনোদিন ক্ষমা করতে পারব না নিজেকে। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি!

পাঁচ মিনিটও গেল না, বেকার স্ট্রিট দিয়ে আমাদের নিয়ে উল্কাবেগে যেন উড়ে চলল একটা ঘোড়ার গাড়ি। আটটা বাজতে পঁচিশ মিনিটের সময়ে পেরিয়ে এলাম বিগবেন১৭, ঠিক আটটার সময়ে ঢুকলাম ব্রিক্সটনে, আটটা দশে বাড়িটার দোরগোড়ায়। আমাদের মতো অপরপক্ষরও দেরি হয়েছিল। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘোড়া যখন দাঁড়াল, ঠিক তখনই চৌকাঠের ওপর দিয়ে একটা বিরাট কফিন ধরাধরি করে বার করে আনা হল বাইরে। ছিলেহেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে গেল হোমস।

পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে একদম সামনের লোকটার বুকে ঠেলা দিয়ে বললে তারস্বরে, ফিরে চলো! ফিরে চলো! এক্ষুনি ফিরে চলো!

কফিনের পেছন থেকে বিরাট লাল মুখখানা আরও লাল করে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল পিটার্স, আবার কী শয়তানি করতে এসেছেন? শমন কোথায়?

শমন আসছে না–আসা পর্যন্ত কফিন বাড়িতে থাকবে।

হোমসের কণ্ঠস্বরের কর্তৃত্ব অমান্য করা বড়ো কঠিন–সেইমুহূর্তে প্রত্যেকেই স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে গেল চৌকাঠে। নিমেষমধ্যে বাড়ির মধ্যে উধাও হল পিটার্স। ফলে, হোমসের হুকুম

-মেনে পারল না কুলিরা। টেবিলে কফিন রাখতে-না-রাখতেই একটা স্ক্রু-ড্রাইভার আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললে ক্ষিপ্তের মতো, তাড়াতাড়ি হাত চালাও, ওয়াটসন! যত তাড়াতাড়ি পার ডালাটা খোলো। আর একটা ক্রু-ড্রাইভার একজন কুলির হাতে গুঁজে দিয়ে বললে, এই নাও, তুমিও খোলো–এক মিনিটের মধ্যে খুলতে পারলে এক মোহর বকশিশ! একটার পর একটা ⇒ খুলে ছিটকে যেতে লাগল মেঝের ওপর–আর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল হোমসের উত্তেজনা–তুবড়ির মতো ছুটল কথার ফুলকি, খুলেছে! খুলেছে! আর একটা স্ক্রু খুলেছে। প্রশ্ন নয়–একদম প্রশ্ন নয়! আরও খুলছে! নাও, এবার সবাই মিলে চাড় মারো–টান মারো–হেঁইয়ো! খুলে গেছে! খুলে গেছে!

সবাই মিলে গায়ের জোরে টেনে খুলে ফেললাম কফিনের ডালা। সঙ্গেসঙ্গে ভক করে নাকে ঢুকল ক্লোরোফর্মের কড়া গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে উঠল সেই গন্ধে। ভেতরে

শায়িত একটা নারীদেহের সারামুখটা ঢাকা রয়েছে জ্ঞানলোপকারী এই আরকে ভিজানো তুলোর আস্তরণে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল হোমস বেরিয়ে পড়ল মাঝবয়েসি এক মহিলার আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যে সুন্দরী সুশ্রী মুখশ্রী। চকিতের মধ্যে মূর্তির তলায় হাত দিয়ে উঠিয়ে বসিয়ে দিল হোমস।

ওয়াটসন বেঁচে আছে না, মারা গেছে? খুব দেরি করে ফেললাম কি?

আধঘণ্টা ধরে মনে হল সত্যিই বড়ো দেরি করে ফেলেছি। ক্লোরোফর্মের জন্যেই হোক কি দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্যেই তোক মনে হল জীবনের শেষ দ্বার পেরিয়ে গেছেন লেডি ফ্রান্সেস–বৃথা চেষ্টা করে যাচ্ছি আর ওঁকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তা সত্ত্বেও চালিয়ে গেলাম কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস বওয়ানোর চেষ্টা, ইথার ইঞ্জেকশন, বিজ্ঞান যা কিছু জেনেছে, তার কোনো পদ্ধতিটাই বাদ দিলাম না। তারপর যেন মনে হল, নাকের সামনে আয়না ধরলে সামান্য ঝাঁপসা দেখাচ্ছে, চোখের পাতা অল্প অল্প কাঁপছে এবং পলায়মান প্রাণ আবার ফিরে আসছে। এই সময়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। খড়খড়ি ফাঁক করে দেখল হোমস। বলল, লেসট্রেড এসে গেছে শমন নিয়ে কিন্তু যার জন্যে আনা সে তো ভাগলবা! ওই তো আর একজন আসছেন–ভারী পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল প্যাসেজে লেডিকে সেবা করার অধিকার আমাদের চাইতে এঁরই বেশি। আসুন, মিস্টার গ্রিন। লেডি ফ্রান্সেসকে এখুনি এখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করুন। আর হ্যাঁ, কফিন নিয়ে যাও ওর মধ্যে যে-বুড়িটা শুয়ে আছে, তাকে শান্তির শয্যায় শুইয়ে দাও।

সেইদিন রাতেই হোমস বললে, ওয়াটসন, এ-কাহিনি যদি কখনো লেখ, তবে তা আমার এই অত্যন্ত সাজানো গোছানো ব্রেনের মারাত্মক পদস্খলনের নজির হয়ে থাকবে চিরকাল। মস্তিষ্কের এ-রকম বাহারে রোগ সবারই মাঝে মাঝে হয়–এ ধরনের সাংঘাতিক ভুল সব মানুষই করে কিন্তু ভুলটা ধরতে পেরে যে-মানুষ শুধরে নিতে পারে, তাকেই বলব মানুষের মতন মানুষ। এ-মর্যাদার যোগ্য কেবল আমিই। কেননা সমস্ত রাতটা আমি অস্থির হয়ে কেবল একটা সূত্র, একটা কথা মনে আনবার চেষ্টা করেছি। বার বার মনে হয়েছে, সামান্য এই কথাটা আমার গোচরে আনা হয়েছিল। কিন্তু আমি খেয়াল করিনি। কথাটা অদ্ভুত, বিচিত্র একটা পর্যবেক্ষণ, কিন্তু সূত্র হিসেবে অসাধারণ। অথচ আমি শুনেও শুনিনি–মনে রাখিনি। ভোরবেলা বিদ্যুৎচমকের মতো মনে পড়ে গেল কথাটা। কবর দেওয়ার ব্যবস্থা যে করে, তার বউ বলেছিল–শুনে ফেলেছিলেন মিস্টার গ্রিন–একটু দেরি হয়ে গেল। কী করব বলুন, বেমক্কা সাইজ–বড় বড়ো। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে নিশ্চয়। বেমক্কা সাইজ বড় বড়ো বলতে কী বোঝাচ্ছিল বুঝেছ? কফিন–কফিন! কফিনের কথা হচ্ছিল। আকারে বড়া সাধারণ কফিনের মতো নয়। কেন? এ-রকম বেয়াড়া মাপে কফিন তৈরি হল কেন? সঙ্গেসঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল সুগভীর কফিনের মাঝখানে শোয়ানো ছোট্ট একটা দেহ গুটিয়ে এইটুকু হয়ে যাওয়া বুড়ির মৃতদেহ। কেন? এইটুকু দেহের জন্যে এতবড়ো কফিন কেন? আর একটা দেহ রাখবার জন্যে। কিন্তু কবর দেওয়া হবে একই ডেথ সার্টিফিকেটের জোরে। এত সোজা ব্যাপারটা আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল বুদ্ধির গোড়ায় গলদ জমেছিল বলে। ঠিক আটটায় কবরস্থ হবেন লেডি ফ্রান্সেস। গাড়ি থেকে কফিন বেরিয়ে যাওয়ার আগেই আটকাতে হবে আমাদের যেভাবেই হোক।

জীবিত পাব কি না জানি না–তবুও মরিয়া হয়ে ছুটে গিয়েছিলাম। তার দামও পেয়েছি–প্রাণটা গিয়েও বলতে পার ফিরে এসেছে সময়মতো পৌঁছোতে পেরেছিলাম বলে। যদূর জানি, এরা খুন-টুনের ধার দিয়েও যায় না। মারপিটের সম্ভাবনা দেখলেই সরে পড়ে। লেডি ফ্রান্সেসকে কবর দেওয়া হবে মৃত অবস্থায়–অথচ যদি কোনোদিন কবর খুঁড়ে দেখা হয় তো মৃত্যুর কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমার বিশ্বাস ঠিক এই লাইনেই চিন্তা করেছিল পিটার্স। এরপর কী কী ঘটেছিল, মনে মনে ভেবে নিতে পার। সিঁড়ির ওপরে কি কাছে আমরা দেখিনি। ওপরতলাতেই একটা খুপরিতে বন্দিনী ছিলেন লেডি ফ্রান্সেস অ্যাদ্দিন। দুজনে দৌড়ে গেছে সেখানে, গায়ের জোরে নাকে ক্লোরোফর্ম চেপে ধরেছে, ধরাধরি করে এনে কফিনে শুইয়েছে। কফিনের মধ্যে আরও ক্লোরোফর্ম ঢেলেছে যাতে জ্ঞান ফিরে না-পায়, তারপর স্ক্রু এঁটে ডালা বন্ধ করে দিয়েছে। ওয়াটসন, এ-রকম অপূর্ব কায়দা এত বছরেও আমার চোখে পড়েনি। অপরাধের ইতিহাসে এ-ঘটনা একেবারে নতুন। লেসট্রেডের হাত ফসকে প্রাক্তন-পাদরি যদি সত্যিই লম্বা দেয়, শিগগিরই আরও চমকপ্রদ অপরাধের পর অপরাধের সংবাদ কানে আসবে তোমার।

———-

টীকা

লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্সের অন্তর্ধান রহস্য : স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন এবং আমেরিকান ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯১১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অব লেডি ফ্রান্সেস কারফাক্স। জানা যায়, প্রথম পাণ্ডুলিপিতে লেডি ফ্রান্সেস উল্লিখিত হয়েছিলেন লেডি

মারিয়া নামে। আমেরিকান ম্যাগাজিনে গল্পটির শিরোনাম ছিল দ্য ডিস্যাপিয়ারেন্স অব লেডি কারফাক্স।

টার্কিশ বাথ : স্টিম বাথ বা বাষ্পের দ্বারা স্নানের তুর্কি সংস্করণ। ভিক্টোরীয় যুগে ইংলন্ডে এই ধরনের স্নান জনপ্রিয়তা লাভ করে।

লসান : সুইজারল্যান্ডে, লেক জেনেভার তীরবর্তী শহর। জেনেভা শহর থেকে বাষট্টি কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে এর অবস্থান। শহরের উত্তর পশ্চিমে জুরা পর্বতমালা অবস্থিত।

মঁপেলিয়র : প্রথম খণ্ডের টীকা দ্রষ্টব্য। এই শহরের এক ল্যাবরেটরিতে ১৮৯১ থেকে ১৮৯৪-এর অজ্ঞাতবাসের সময়ে কয়েকমাস পরীক্ষানিরীক্ষা করেন হোমস।

বাদেন : জার্মানির ব্যাদেন-ব্যাদেন কিংবা সুইজারল্যান্ডের ব্যাদেন-এর মধ্যে যেকোনো একটি জায়গা হওয়া সম্ভব।

রেনিজ : রাইন নদীর তীরবর্তী অঞ্চল। মধ্য ইউরোপের এই অঞ্চল বিখ্যাত রাইনল্যান্ড নামে।

কুকস-এর স্থানীয় অফিস : ১৮৪১-এর ৯ জুন প্রতিষ্ঠিত থমাস কুক ট্রাভেল এজেন্সি। ব্যাপটিস্ট ধর্মপ্রচারক থমাস কুক (১৮০৮-১৮৯২) লাফবরোতে একটি সভায় যোগ

দেওয়ার জন্য সহকর্মীদের প্রস্তাব দেন একসঙ্গে ভ্রমণ করতে এবং মিডল্যান্ড রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থা করেন আলাদা কয়েকটি কামরায় মাথাপিছু এক শিলিং ভাড়ায় পাঁচশো যাত্রীকে নিয়ে যেতে। এতে যে অর্থের সাশ্রয় হয়, তাই দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি নিজেই ব্যাবসা শুরু করেন দলবদ্ধভাবে ভ্রমণ করাতে। কুকের ব্যাবসা ইংলন্ডের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে ১৮৫৫ সাল থেকে। লসেন শহরে কুক কোম্পানির অফিস খোলা হয় ১৮৯১-এ।

মিডিয়ানটিস রাজ্য : ওল্ড টেস্টামেটে বর্ণিত, ইস্রায়েলাইটদের সঙ্গে সম্পর্কিত, আরব মরুভূমির যাযাবর জাতি মিডিয়ানটিস। এঁরা হলেন আব্রাহামের ছেলে মিডিয়ানের বংশধর। মোজেসের স্ত্রী জিফোরা ছিলেন মিডিয়ানটিস পুরোহিত জেথ্রোর কন্যা। তবে মিডিয়ানটিস রাজ্য নামে আলাদা কোনো রাজ্য ছিল না।

বারবারটন : দক্ষিণ আফ্রিকার ডি কাপ উপত্যকায় মাকনজোয়া পর্বতমালায় অবস্থিত শহর। এই শহরের সন্নিহিত বারবার্স রীফ অঞ্চলে ১৮৫৪ সালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়।

ল্যাংহ্যাম হোটেল : লন্ডনের পোর্টল্যান্ড প্লেসে অবস্থিত এই হোটেলে আর্থার কন্যান ডয়ালের সঙ্গে লিপিনকট ম্যাগাজিনের সম্পাদক যোসেফ মার্শাল স্টডার্টের দ্য সাইন অব ফোর উপন্যাসের প্রকাশন সম্পর্কিত আলোচনা হয়েছিল।

অ্যাডিলেড : দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী শহর।

ওয়েস্টমিনস্টার রোড : লন্ডনে এই নামে কোনো রাস্তা নেই। হোমস সম্ভবত ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ রোডের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

বেভিংটনের : সম্ভবত ভিক্টোরীয় যুগের বিখ্যাত অলংকার বিক্রেতা ব্র্যাভিংটন্স।

ক্রিমিয়ান যুদ্ধ : দ্য গ্লোরিয়া স্কট গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

অ্যাজোভ সাগর : স্থলে ঘেরা বিশাল হ্রদ অ্যাজোভ বা আজফ সাগর আসলে ব্ল্যাক সি-র উত্তর দিকের অংশ। কার্চ (Kerch) প্রণালী এটিকে ব্ল্যাক সি-র সঙ্গে যুক্ত করেছে।

ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি : ইংলন্ডে ওয়ার্কহাউস দরিদ্র মানুষদের কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য ১৬০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। তা ছাড়া দরিদ্র এবং অসুস্থদেরও রাখা হত এখানে। এখানকার বাসিন্দাদের বেওয়ারিশ মৃতদেহ অ্যানাটমির ক্লাসে ব্যবহার করা হত ১৮৩৩ সালের আইনে। ব্রিক্সটন ওয়ার্কহাউস ইনফার্মারি সংস্থাটি অবশ্য কাল্পনিক।

বিগবেন : লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার প্যালেসের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত টাওয়ারের চারমুখো ঘড়ির ঘণ্টার আদরের ডাকনাম বিগবেন হলেও সম্পূর্ণ টাওয়ারটিকেই বিশ্ববাসী চেনেন বিগবেন নামে। ১৮৫৮-র দশই এপ্রিল এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছিল।

ইথার ইঞ্জেকশন : ইথারের গন্ধ রোগীকে অ্যানিস্থিসিয়া দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হলেও হৃৎপিণ্ডকে স্টিমুলেট করতে ইথার ইঞ্জেকশন দিতেন চিকিৎসকরা। কিন্তু, এখানে প্রশ্ন ওঠে ওই তাড়াহুড়োয় ইথার ইঞ্জেকশন জোগাড় হল কোথা থেকে? ওয়াটসন কি তার

শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায়

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডাইং ডিটেকটিভ]

শার্লক হোমসের বাড়িউলি মিসেস হাডসন বেচারির হাড় ভাজা-ভাজা হয়ে গিয়েছিল ওইরকম একখানা ভাড়াটেকে বাড়িতে ঢুকিয়ে। একে তো রাজ্যের আজেবাজে লোক হানা দিয়েছে। দোতলার ফ্ল্যাটে, তার ওপর ভাড়াটের সৃষ্টিছাড়া খ্যাপামি আর উলটোপালটা অভ্যেসের দরুন নিশ্চয়ই ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছিলেন ভদ্রমহিলা।

একদিকে যেমন অবিশ্বাস্য রকমের অগোছালো, অন্যদিকে তেমনি রাতবিরেতে গান-বাজনার গিটকিরি। এ ছাড়াও আছে ঘরের মধ্যে বসে রিভলভার ছুঁড়ে হাত পাকানো আর দুর্গন্ধময় বৈজ্ঞানিক গবেষণা। সর্বোপরি সবসময়ে বিপদ আর দাঙ্গাহাঙ্গামার হাওয়ায় সারাবাড়ি যেন থমথমে। সব মিলিয়ে এত জঘন্য ভাড়াটে সারালন্ডন শহরে আর দুটি নেই। পক্ষান্তরে টাকাকড়ি দেওয়ার ব্যাপারে রাজারাজড়ার মতো দিলখোলা হোমস। এত টাকা ভাড়া বাবদ সে গুনেছে, আমার তো মনে হয়, সে-টাকায় অনায়াসেই বাড়িটা কিনে নিতে পারত সে।

গা জ্বালানো অভ্যেস আর সৃষ্টিছাড়া খ্যাপামি সত্ত্বেও ভাড়াটেকে যমের মতো ভয় করেন মিসেস হাডসন, ভুলেও কখনো নাক গলান না ওর ব্যাপারে। তবে ভালোও বাসেন। কেননা মেয়েদের মন জয় করার একটা আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল হোমসের। অদ্ভুত সৌজন্য

আর কোমল শিষ্টাচার দিয়ে কাছে টেনে নিতে পারত যেকোনো মহিলাকে। মেয়েদের কিন্তু পছন্দ করত না, বিশ্বাস করত না–অথচ ছিল আশ্চর্য রকমের নারীপ্রিয়। শার্লক হোমস যে মিসেস হাডসনের শ্রদ্ধার পাত্র, আমি তা জানতাম বলেই আমার বিয়ের দ্বিতীয় বছরে যখন ভদ্রমহিলা আমার বাড়ি বয়ে এসে বন্ধুবরের মুমূর্ষ অবস্থা বর্ণনা করতে আরম্ভ করলেন, তখন উৎকর্ণ হয়ে না-শুনে পারলাম না।

মিসেস হাডসন বললেন, আপনার বন্ধু যে মরতে চলেছেন, ডক্টর ওয়াটসন! তিন দিন ধরে তিল তিল করে এগিয়ে চলেছেন মৃত্যুর দিকে, আর একটা রাত পেরোবেন বলে মনে হয় না। ওদিকে ডাক্তারও আনতে দেবেন না আমাকে। আজ সকালে মুখ-চোখের চেহারা দেখে আর স্থির থাকতে পারলাম না। বললাম, মি. হোমস, আপনি বলুন চাই না-ই বলুন, আমি চললাম ডাক্তার ডাকতে। উনি শুনে বললেন, তাহলে বরং ওয়াটসনকেই ডাকুন। তাই দৌড়াতে দৌড়াতে আসছি। এখুনি চলুন, দেরি করলে আর জ্যান্ত দেখতে পাবেন কি না সন্দেহ।

ভীষণ ভয় পেলাম। হোমসের শরীর যে এত খারাপ হয়েছে, কিছুই জানতাম না। কোট আর টুপি নিয়ে রওনা হলাম তৎক্ষণাৎ। গাড়িতে যেতে যেতে শুনলাম বাকি কাহিনি।

আমিও কি ছাই সব জানি! মিসেস হাডসন বললেন, নদীর ধারে রোদারহিদেব গলিতে কী-একটা মামলা নিয়ে তদন্ত করতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন উনি। ধুকছেন বুধবার বিকেল থেকে। বিছানা থেকে একদম উঠছেন না। এই তিনটে দিন একফোঁটা জল পর্যন্ত খাননি, দাঁতেও কিছু কাটেননি।

গুড গড! ডাক্তারকে খবর দেননি কেন? অবাক হয়ে শুধোলাম।

দিতে দিলে তো? জানেনই তো, উনি কারো কথায় চলেন না, সবাই চলে ওঁরই কথায়। কিন্তু আর বোধ হয় বেশিক্ষণ নয়, হয়ে এল মি. হোমসের! মুখের চেহারা দেখলেই বুঝবেন।

নভেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন ম্লান আলোয় ঘরের মধ্যে দেখলাম সেই শোচনীয় দৃশ্য। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে শার্লক হোমসের দীর্ঘ শীর্ণ কঙ্কালসার মুর্তি। কোটরাগত দুই চক্ষুর চাহনি আমার ওপর নিবদ্ধ হতেই মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিউরে উঠল আমার। এ কী দেখছি আমি? এই কি আমার প্রিয়বন্ধু শার্লক হোমস? এ কী হাল হয়েছে তার? ঠোঁটের দুই কোণে কালচে ফেনা জমে গেছে, জ্বরের ঘঘারে চোখ ঘোলাটে হয়ে এসেছে, গাল লাল হয়ে গেছে দেহের উত্তাপে, লেপের ওপর হাড়-বার-করা হাতের আঙুল বিকারগ্রস্ত রুগিরমতো থরথর কাঁপছে, মোচড় খাচ্ছে বিরামবিহীনভাবে, থেকে থেকে গলা থেকে দমকে দমকে ব্যাঙের ডাকের মতো কেঁ-কে কাতরানি ঠিকরে আসছে। আমি ঘরে ঢুকতেই আমায় চিনতে পেরেছে মনে হল, ঈষৎ উজ্জ্বল হল দুই চক্ষু।

বললে সে ক্ষীণ কণ্ঠে, ওয়াটসন, সময় বড়ো খারাপ যাচ্ছে।

ভাই হোমস! রুদ্ধকণ্ঠে কথাগুলি বলে ওর দিকে এগোতেই চিলের মতো তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল হোমস, কাছে এস না! কাছে এস না। এলে কিন্তু দূর করে দেব বাড়ি থেকে।

সংকটে পড়লে চিরকালই এমনি তুঘলকি মেজাজ দেখায় হোমস।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললাম, কিন্তু কেন?

কেন আবার? আমার ইচ্ছা, সেটাই কি যথেষ্ট নয়?

ঠিকই বলেছেন মিসেস হাডসন। আগের মতোই হুকুম চালিয়ে যাচ্ছে হোমস–কারো হুকুমে চলতে সে রাজি নয়। কিন্তু এই ছোট্ট হুকুমটা চালাতে গিয়ে যেভাবে বেদম হয়ে পড়ল যে দেখে বড়ো কষ্ট হল।

যা বলি, তা-ই করো। তাতেই বেশি কাজে লাগবে!

বেশ তো, বলো।

একটু নরম হল যেন হোমস। জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বললে, রাগ করলে না তো?

হায় রে! ওই অবস্থায় কাউকে দেখে তার ওপর রাগ করা যায়?

কো-কোঁ করতে করতে ফের বলল সে, তোমার ভালোর জন্যেই কাছে আসতে বারণ করলাম।

আমার ভালোর জন্যে?

হ্যাঁ। আমি তো জানি আমার কী হয়েছে। সুমাত্রার কুলিদের রোগ। মারাত্মক, কেউ বাঁচে না। আর সাংঘাতিক ছোঁয়াচে। ওলন্দাজরা খবর রাখে এ-রোগের, কিন্তু বাঁচবার পথ আজও বের করতে পারেনি। হাড়-বার-করা আঙুল নাড়তে নাড়তে জ্বরের ঘোরে অতিদ্রুত যেন প্রলাপ বকে চলল হোমস, খবরদার কাছে আসবে না। দারুণ ছোঁয়াচে রোগ। দূরে থাকো।

হোমস, ছোঁয়াচে রোগ বলে আমার কর্তব্য করতে দেবে না? অচেনা মানুষও যদি ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে আসে তো ডরাই না, আর তুমি হলে আমার কদ্দিনের বন্ধু! বলে যেই আবার এগোতে গেছি বিছানার দিকে, গনগনে চোখে কটমট করে তাকিয়ে বজ্রকণ্ঠে গর্জে উঠল হোমস, আর এক পা এগোলে তাড়িয়ে দেব ঘর থেকে, একটা কথাও আর বলবে না।

হোমসকে আমি বরাবরই অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি বলে কখনো তার হুকুমের উলটো কাজ করি না, তা সে যত অপ্রিয় আদেশই হোক না কেন। কিন্তু এ-ব্যাপারটা আলাদা। এখন তার গুরুগিরি মানতে আমি রাজি নই, রুগির ঘরে ডাক্তারই গুরু—আমিই এখন

তার মনিব। কর্তব্য আমাকে করতেই হবে। বললাম, হোমস, তুমি এখন অসুস্থ, মোটেই ধাতস্থ নও। অসুখে পড়লে রুগিমাত্রই শিশু হয়ে যায়। তখন তাকে সেইভাবেই চিকিৎসা করতে হয়। কাজেই এখন তোমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের ধার ধারি না আমি, তোমার নাড়ি আমাকে দেখতেই হবে, ওষুধপত্রের ব্যবস্থাও করতে হবে।

বিষ মাখানো চোখে চাইল হোমস। বললে, তাহলে এমন ডাক্তার ডাকব, যার ওপর আমার আস্থা আছে।

তার মানে আমার ওপর তোমার আস্থা নেই?

তোমার বন্ধুত্বে আস্থা আছে, ডাক্তারি বিদ্যেতে নেই। সামান্য জেনারেল প্র্যাকটিশনার তুমি, সীমিত অভিজ্ঞতা আর অতি মামুলি ডিগ্রি নিয়ে ডাক্তারি কর। জানি, তোমার কষ্ট হচ্ছে শুনতে, কিন্তু বলতে তুমিই বাধ্য করলে।

মনটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেল। বললাম, হোমস, তোমার মুখে এ-কথা কোনোদিন শুনব ভাবিনি। বেশ, আমার বিদ্যেবুদ্ধিতে যদি তোমার আস্থা না-থাকে, তো লন্ডন শহরের সেরা ডাক্তারদের ডেকে আনছি। স্যার জ্যাসপারসিক বা পেনরোজ ফিশার বা বিখ্যাত কোনো বিশেষজ্ঞকে এখুনি ডেকে আনছি। কিন্তু চোখের সামনে এভাবে তোমাকে কষ্ট পেতে দেব না।

যেন গুঙিয়ে উঠল হোমস, যেন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল আমার আবেগরুদ্ধ এই কথায় বললে, তাহলে হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমার বিদ্যের দৌড় কত কম। তাপানুলি জ্বরের নাম কখনো শুনেছ? জান কি ব্ল্যাক ফরমাশা ব্যাধি কাকে বলে?

জীবনে নাম শুনিনি।

প্রাচ্যদেশে এইরকম অনেক অজানা ভয়ংকর রোগ আছে, ওয়াটসন। কেউ তার খবর রাখে। আমি জেনেছি রোগগুলো অপরাধ-সংক্রান্ত বলেই। তদন্ত করতে গিয়ে নিজেই রোগে পড়েছি। প্রত্যেকটা শব্দ অতি কষ্টে থেমে থেমে দম নিয়ে নিয়ে কোনোমতে বলল হোমস, তাই বলছিলাম, তুমি পারবে না আমাকে ভালো করতে।

বেশ তো, ট্রপিক্যাল রোগে সেরা বিশেষজ্ঞ ডক্টর এইন্সট্রে এখন লন্ডনে আছেন। তোমার সঙ্গে তার আলাপও আছে। বাজে কথায় সময় নষ্ট না-করে চললাম তাকে ডাকতে। বলে পা বাড়ালাম দরজার দিকে।

এ-রকম শক জীবনে পাইনি। আচম্বিতে মৃত্যুপথের পথিক শার্লক হোমস বাঘের মতো লাফ দিয়ে উঠল বিছানা থেকে, আমার আগেই ছিটকে গেল দরজার সামনে, কড়াৎ করে দরজায় চাবি নিয়ে চাবিটা হাতে নিয়ে ফের গিয়ে আছড়ে পড়ল বিছানায়। প্রাণশক্তির আচমকা বিস্ফোরণে হাপরের মতো হাঁপাতে হাঁপাতে সে নেতিয়ে রইল শয্যায়।

খানিক বাদে বললে, ওয়াটসন, এখন চারটে বাজে। ঠিক ছ-টার সময় ছাড়া পাবে ঘর থেকে। চাবিটা গায়ের জোরে কাছ থেকে নিতে যেয়ো না, যেখানে আছে, সেখানেই থাক।

হোমস, এ যে বদ্ধ পাগলামি!

কথা দিচ্ছি, ঠিক দু-ঘণ্টা পরে তোমায় ছেড়ে দেব। ঠিক ছটায়। রাজি?

রাজি না হয়ে আর তো উপায় দেখছি না।

কাছে এস না। দূরে থাকো। শোনো, লন্ডন শহরে একজনই আমাকে আরাম করতে পারে। যার নাম বলব, তুমি তার কাছে যাবে।

নিশ্চয়ই যাব।

এতক্ষণে বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে। ছ-টা পর্যন্ত বই পড়ো। এখন আর কথা বলবার শক্তি আমার নেই। ঠিক ছটায় আবার কথা বলব।

কিন্তু তার আগেই আবার প্রাণশক্তি আর বাক্যশক্তির বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাড়ল মরণপথের পথিক শার্লক হোমস। আঁতকে উঠলাম তার বর্জনাদে। ঘটনাটা ঘটল এইভাবে।

চেয়ে দেখি মুখ পর্যন্ত লেপ চাপা দিয়ে বোধ হয় ঘুমুচ্ছে হোমস।

মনের এই অবস্থায় বই পড়া যায় না। তাই ঘুরে ঘুরে দেওয়ালে ঝোলানো কুখ্যাত ক্রিমিনালদের ছবি দেখতে দেখতে এক সময় পৌঁছোলাম ম্যান্টলপিসের সামনে। দেখলাম, খানকয়েক পাইক, তামাকের থলি, ইঞ্জেকশন নেওয়ার সিরিঞ্জ, কাগজকাটা ছুরি, রিভলভারের কার্তুজ এবং অন্যান্য হাবিজাবি জিনিসের স্তুপের মধ্যে পড়ে আছে একটা সাদা-কালো আইভরি কৌটো। হাতির দাঁতের ভারি সুন্দর কৌটোটা দেখে যেই সেদিকে হাত বাড়িয়েছি, অমনি বিকট বীভৎস একটা চিৎকারে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ভয়াবহ সেই আর্তনাদ রাস্তার লোকেও শুনেছিল নিশ্চয়। মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল আমার অবর্ণনীয় সেই আর্তনাদে। ফিরে দেখি, বিকৃত উন্মত্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমার মুমূর্ষু বন্ধু। কৌটোটা হাতে নিয়ে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি স্থাণুবৎ।

একটু বাদেই হোমসের হুমকি কানে এল, নামিয়ে রাখ ওয়াটসন, যেখানকার জিনিস এখুনি রেখে দাও সেখানে।

ভীষণ ঘাবড়ে গিয়ে হাবিজাবি স্তুপে কৌটোটা রেখে দিতেই পরম স্বস্তিতে পাঁজর-খালি-করা নিশ্বাস ছেড়ে ফের বালিশে এলিয়ে পড়ল হোমস। বললে, ওয়াটসন, আমি চাই না, আমার জিনিসপত্রে কেউ হাত দিক। তুমি তা জান, জেনেও আমাকে মারতে বসেছ! আমার সহ্যশক্তির বাঁধ ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছ! ডাক্তার হয়ে আমাকে পাগলাগারদে ঢোকানোর মতো কাজ করছ। বোসো, বোসসা, বলছি। একটু জিরোতে দাও আমাকে!

ঘটনাটা নাড়া দিয়ে গেল আমার ভেতর পর্যন্ত। হোমসের কথাবার্তা চিরকালই মাজাঘষা, মসৃণ। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর প্রচণ্ডতা, ওর ভয়াবহ উত্তেজনা দেখে স্পষ্ট বোঝা গেল, মস্তিষ্কের সুস্থতা একেবারেই হারিয়েছে বন্ধু। শরীর যায় যাক, কিন্তু একটা উঁচুদরের মহৎ মনের এই দূরবস্থা দেখা যায় না। দু-ঘন্টার মেয়াদ উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত বসে রইলাম চুপচাপ।

আমার মতোই ঘড়ির দিকে হোমসও নজর রেখেছিল নিশ্চয়ই। কেননা ছ-টা বাজতে-বাজতেই ঠিক আগের মতো জ্বরগ্রস্ত বিকারের ঘোরে উত্তেজিত গলায় বললে, ওয়াটসন, খুচরো পয়সা আছে পকেটে?

আছে।

রুপোর খুচরো?

বেশ কিছু?

আধক্রাউন ক-টা?

পাঁচটা!

মাত্তর! কী কপাল! কী কপাল! যাকগে, ঘড়ির পকেটে রাখো আধক্রাউনগুলো, বাকি খুচরো রাখো বাঁ-দিকের প্যান্টের পকেটে।... ধন্যবাদ! এতক্ষণে ব্যালেন্সে এলে তুমি।

বদ্ধ উন্মত্ততা সন্দেহ নেই। মাথার একদম ঠিক নেই ওর। থরথর করে একবার কেঁপে উঠেই ফের কাশি আর ফোপানি জাতীয় অদ্ভুতভাবে কাতরে উঠল হোমস। বললে, গ্যাসের আলোটা জ্বালাও ওয়াটসন। বেশি না, অর্ধেকের বেশি না। খুব সাবধান ... ঠিক আছে। চমৎকার হয়েছে। না, না, জানলার খড়খড়ি বন্ধ করার দরকার নেই। এবার দয়া করে খানকয়েক চিঠি আর কাগজ এনে আমার হাতের কাছের এই টেবিলটায় রাখ।... ধন্যবাদ! এবার ম্যান্টলপিস থেকে কিছু হাবিজাবি জিনিস এনে রাখো তো... চমৎকার হয়েছে ওয়াটসন! চিনির ডেলা তোলার চিমটেটা ওইখানে আছে, ওটা দিয়ে আইভরি কৌটোটা তুলে এনে রাখো কাগজপত্তরের ওপর।... বাঃ, বাঃ, বেশ হয়েছে। এবার যাও, তেরো নম্বর লোয়ার বার্ক স্ট্রিট থেকে মি. কালভার্টন স্মিথকে ডেকে আনো।

হোমসের প্রলাপ শুনে এই অবস্থায় ওকে ফেলে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছিলাম বলেই ডাক্তার ডাকার উৎসাহ উবে গিয়েছিল আমার। যাই হোক, আগে ডাক্তারের নাম শুনে ও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছিল, এখন তবু একজনকে ডাকতে বলছে। কিন্তু এ-নাম জীবনে আমি শুনিনি। হোমসকে সে-কথা বলতে ও বললে, কী করে শুনবে বল! এ-রোগে পণ্ডিত বলতে যাঁকে বোঝায়, তিনি ডাক্তার নন মোটেই, চাষবাসের কাজ করেন সুমাত্রায়। খেত-খামারে বিচিত্র এই কালব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। ডাক্তার পাওয়া সেখানে দুষ্কর। তাই নিজেই রোগটা নিয়ে গবেষণা করেন ইনি এবং বেশ কিছু মাশুল গোনবার পর ভয়ংকর এই ব্যাধির অনেক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন মি.

কালভার্টন স্মিথ। এই মুহূর্তে ইনি রয়েছেন লন্ডনে। ভদ্রলোক বড়ো গোছালো মানুষ, ঘড়ি ধরে কাজ করেন, সব ব্যাপারে নিয়ম মেনে চলেন। ছ-টার আগে গেলে তাকে পেতে না বলেই বসিয়ে রেখেছিলাম তোমাকে। রোগটা নিয়ে উনি শখের খাতিরে গবেষণা করছেন বলেই তোমাকে পাঠাচ্ছি তার কাছে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবেই হোক তাকে নিয়ে এসো আমার কাছে।

কী কষ্টে যে এতগুলো কথা বলে গেল হোমস, চোখে না-দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। হাঁপাতে হাঁপাতে প্রত্যেকটা শব্দ দেহ আর মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে উচ্চারণ করে দু-হাতে কাঁপা আঙুল দিয়ে লেপ খামচে ধরে যেভাবে বলে গেল, তা থেকেই স্পষ্ট বুঝলাম ভেতরে ভেতরে কী সাংঘাতিক যন্ত্রণায় শেষ হয়ে আসছে শার্লক হোমস। এই দু-ঘণ্টার মধ্যে আরও অবনতি ঘটেছে ওর চেহারার চোখ আরও কোটরে বসে গেছে, অন্ধকার গর্তের মধ্যে আগের চাইতে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে উদ্ভ্রান্ত দুই চক্ষু। বিন্দু বিন্দু ঘাম চকচক করছে কালচে কপালে। কথা বলছে। অবশ্য আগের মতো ঝুঁকি মেরে মেরে বাদশাহি মেজাজে। নাঃ দেখছি, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওর এই নবাবি মেজাজ চালিয়ে যাবে ও, কারো কাছে মাথা নোয়বে না। ফের বললে, আমাকে যেভাবে দেখে গেলে, ঠিক সেইভাবে আমার দূরবস্থা ফুটিয়ে তুলবে ওঁর কাছে। বলবে, আমি মরতে চলেছি! শরীর বিছানায় মিশে গেছে, পাগলের মতো প্রলাপ বকছি। আমাকে যেরকম তোমার মনে হচ্ছে, তোমার কথায় তারও যেন সেইরকম মনে হয়। আহা রে, গোটা সমুদ্রটা যদি শুক্তিতে বোঝাই হত, কী মজাই না হত তাহলে! কী বলছিলাম যেন ওয়াটসন?

মি. কালভার্টন স্মিথের কাছে গিয়ে কী বলব, তা-ই বলছিলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমার মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে এঁর ওপর। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে বলবে, দরকার হলে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আসবে। আমার ওপর তিনি চটে আছেন। তার ভাইপোর একটা ব্যাপারে একটা বিশ্রী জিনিস আমি আঁচ করেছিলাম, শেষকালে ভয়ানকভাবে মারা যায় ছেলেটা। সেই থেকে আমার নাম পর্যন্ত সইতে পারেন না উনি। তুমি তাকে ঠান্ডা করবে। কাকুতিমিনতি করবে, হাতে পায়ে ধরবে, যেভাবেই হোক এখানে নিয়ে আসবে। আমাকে বাঁচানোর ক্ষমতা একমাত্র তারই আছে জানবে।

আমি আশ্বাস দিলাম, ঘাবড়িয়ো না বন্ধু, দরকার হলে তাকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে আসব।

খবরদার! হোমস শাসিয়ে উঠল, এসব করতে যেয়ো না! ওঁকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দেবে, আগে চলে আসবে তুমি। একসঙ্গে এস না, পইপই করে বারণ করছি, একসঙ্গে এস না। এ-ব্যাপারে ভুল যেন না হয়। তোমার ওপর আস্থা আছে বলেই বলছি এত কথা। ঠিক যেমনটি বললাম, তেমনটি করবে। আহা রে, শুক্তিগুলোর শত্রু দেখছি বেড়েই চলেছে। সারাপৃথিবীটা যদি ওরা ছেয়ে ফেলে! না, না! কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর! যা বললাম, ঠিক সেইভাবে বলবে ওয়াটসন। আমি জানি, তোমাকে যা বলি, কখনো তার অন্যথা হয় না।

পাছে বিকারের ঘোরে ফের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয় হোমস, এই ভয়ে চাবিটা সঙ্গে নিয়ে এলাম। আসবার সময় দেখে এলাম একটা অসাধারণ অতুলনীয় মেধা

কীভাবে কচি খোকার মতো আধো-আধো স্বরে আবোল-তাবোল বকে চলেছে আপন মনে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শুনলাম, আচমকা উচ্চকণ্ঠে তীক্ষ্ণ সরু গলায় মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেছে হোমস। মিসেস হাডসনের পাশ দিয়ে আসার সময় দেখলাম ভদ্রমহিলা ভয়ে দুঃখে কাঁপছেন আর কাঁদছেন।

রাস্তায় নেমে শিস দিয়ে ভাড়াটে গাড়ি ডাকতেই কুয়াশার মধ্যে থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, মিস্টার হোমস আছেন কেমন?

লোকটাকে চিনি; স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইনস্পেকটর মর্টন। এখন গেরস্তর মতো টুইডের সুট পরে হাওয়া খাচ্ছে।

বললাম, খুবই খারাপ।

অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল মর্টন। আবছা আলোয় মনে হল, যেন একটা পৈশাচিক উল্লাস চকিতের জন্যে ভেসে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে। বললে, হু গুজবও সেইরকমই।

গাড়ি এসে গেল, উঠে বসলাম আমি।

লোয়ার বার্ক স্ট্রিট রাস্তাটা নটিংহিল আর কেনসিংটনের মাঝামাঝি জায়গায়। সারি সারি সুন্দর বাড়ি। যে-বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল, সেটি পুরেনো আমলের লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা বেশ জমকালো ধরনের ভাজ-করা বিরাট পাল্লাওয়ালা দরজার বাড়ি। কপাটে

চকচকে তামার কারুকাজ। ঘণ্টা বাজাতেই গম্ভীরবদন বাটলার এসে কার্ড নিয়ে গেল ভেতরে। কিন্তু আমার সামান্য নাম আর খেতাব মনঃপূত হল না মি. কালভার্টন স্মিথের, আধাখোলা দরজার মধ্যে দিয়ে শুনলাম তাঁর তীক্ষ্ণ চড়া কণ্ঠস্বর, লোকটা কে? কী চায়? কতবার বলব তোমাকে, আমার কাজের সময়ে যেন কেউ বিরক্ত না-করে?

বিড়বিড় করে কী যেন সাফাই গাইল বাটলার। কিন্তু তাতে ঠান্ডা না হয়ে আরও জ্বলে উঠলেন মি. স্মিথ, চিৎকার করে বললেন, বলে দাও, আমি বাড়ি নেই। খুব বেশি দরকার থাকলে যেন কাল সকালে আসে। যাও। কাজের সময়ে যত উৎপাত।

আবার বিড়বিড় করে কী যেন বলল বাটলার।

যা বললাম, তা-ই বলো গিয়ে। কাল সকালে যেন আসে। কাজের সময় ঝগড়া আমি পছন্দ করি না।

আমার চোখের সামনে তখন ভেসে উঠল হোমসের ছটফটানি, রোগযন্ত্রণা, প্রলাপের ঘোরে উন্মত্ত আচরণ। মিনিটে আয়ুক্ষয় হচ্ছে তার, মিনিটে মিনিটে সে এগিয়ে চলেছে মৃত্যুর দিকে। এখন আর সৌজন্য বা শিষ্টাচার দেখাবার সময় নয়। মি. স্মিথের ধমকে জবুথবু বাটলার এসে পৌঁছোনোর আগেই আমি পেয়ে গেলাম তার পাশ দিয়ে সোজা ভেতরের পড়ার ঘরে।

আগুনের পাশে রাখা চেয়ার থেকে ভীষণ রাগের আতীক্ষ্ণ চিৎকার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এক ব্যক্তি। হলদে মুখ, চামড়ায় অজস্র ভাজ, ভারী দু-পাটকরা তেলতেলে চিবুক। ঝোঁপের মতো ঘন বালিরঙা একজোড়া ভুরুর তলা থেকে দুটো পিলেচমকানো ধূসর চোখের গনগনে চাহনি যেন পলকের মধ্যে দগ্ধ করে দিতে চাইল আমার নশ্বর দেহকে। লোকটার মাথায় বিরাট টাকের ওপর হেলিয়ে বসানো একটা ভেলভেটের টুপি। মগজের সাইজ নিঃসন্দেহে প্রকাণ্ড, করোটির সাইজেই তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু অবাক হলাম সেই অনুপাতে তাঁর ছোট্ট ধড়টা দেখে। হাত-পা লিকলিকে, ছেলেবেলায় যেন রিকেটি রোগে ভুগে ডিগডিগে হয়ে গিয়েছেন।

বিষম বিকট আর্ত চিৎকারের ধরনে উনি বললেন, মানেটা কী? কে বলেছে আপনাকে এভাবে ঘরে ঢুকতে? বলে পাঠালাম না কাল সকালে আসবেন?

দুঃখিত। সময় একদম নেই। মি. শার্লক হোমস–

নামটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে অসাধারণ পরিবর্তন এল লোকটার চোখে-মুখে, মিলিয়ে গেল ক্রোধের অভিব্যক্তি, নিমেষ মধ্যে টানটান হয়ে গেল মুখের প্রতিটি রেখা। আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, হোমসের কাছ থেকে আসছেন নাকি?

সোজা আসছি সেখান থেকে।

আছে কীরকম?

মরতে চলেছে। ভীষণ অসুখ। সেইজন্যেই এসেছি।

হাত নেড়ে আমাকে বসতে হলে নিজেও বসলেন ভদ্রলোক। বসতে গিয়ে তাঁর মুখটা অন্যদিকে একটু ঘুরে গিয়েছিল বলে উলটোদিকে আয়নায় দেখতে পেলাম হলদে মুখের প্রতিফলন। চোখের ভুল নিশ্চয়ই অবিশ্বাস্য রকমের পৈশাচিক একটা উল্লাস ফুটে উঠতে দেখলাম যেন সে-মুখের পরতে পরতে। চোখের ভুলই, কেননা পরমুহূর্তেই যখন আমার দিকে ফিরলেন, তখন তার মুখের চেহারায় দেখলাম আত্যন্তিক উদবেগের অভিব্যক্তি। বললেন, খুবই দুঃসংবাদ। হোমসের সঙ্গে কর্মসূত্রে একবার আলাপ হয়েছিল আমার। ওর ধীশক্তি, ওর চরিত্রকে আমি শ্রদ্ধা করি। আমি যেমন অসুখবিসুখের শখের গবেষণা নিয়ে নাওয়া খাওয়া ভুলেছি, হোমস তেমনি হাজারো অপরাধ নিয়ে শখ মিটিয়ে চলেছে। ওর জীবনের লক্ষ্য দুনিয়ার পাপীকে খাঁচায় পোরা, আমার জীবনের লক্ষ্য জীবাণুদের সবংশে ধ্বংস করা। ওই দেখুন, ওদের জন্যে কেমন খাঁচা বানিয়ে রেখেছি।

একটা টেবিলে সারি সারি সাজানো বোতল আর বয়েম দেখিয়ে উনি বললেন, দুনিয়ার অত্যন্ত জঘন্য কয়েকটা জীবাণু কীরকম প্রায়শ্চিত্ত করছে দেখুন জিলেটিনের মধ্যে।

এই কারণেই আপনার সাহায্য চায় হোমস। লন্ডন শহরে আপনি ছাড়া এ-ব্যাপারে বড়ো বিশারদ আর দ্বিতীয় নেই। আপনার ওপর অসীম শ্রদ্ধা আর আস্থা আছে বলেই ও পাঠিয়েছে

আমাকে।

চমকে উঠলেন খুদে ব্যক্তি, টাক মাথা থেকে ভেলভেটের টুপিখানা সুড়ুৎ করে পিছলে পড়ে গেল মেঝেতে। বললেন, আমার সাহায্য চায় হোমস, আঁ? সে আবার কী কথা? ওকে আমি সাহায্য করব কী করে তা কি বলেছে হোমস?

প্রাচ্যরোগে আপনার বিশেষ জ্ঞান আছে বলেই সাহায্য করতে পারবেন।

কিন্তু রোগটা প্রাচ্যমুলুক থেকে নিয়ে এসেছে, এমন ধারণাটা তার হল কেন?

জাহাজঘাটায় কিছু প্রাচ্যদেশীয় খালাসির সঙ্গে একটা তদন্ত নিয়ে কাজ করতে হয়েছিল হোমসকে, তখনই সংক্রামিত হয়েছে রোগটা।

প্রসন্ন হেসে মেঝে থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিলেন স্মিথ। বললেন, তা-ই নাকি? তা, ভুগছে কদ্দিন?

দিন তিনেক।

প্রলাপ বকছে কি?

মাঝে মাঝে।

আরে সর্বনাশ! এ-অবস্থায় ওর পাশে না-যাওয়াটা জানোয়ারের মতো কাজ হবে। যদিও কাজের ক্ষতি হবে আমার, তাহলেও আপনার সঙ্গে আমি যাব ডক্টর ওয়াটসন।

হোমসের নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ল আমার। বললাম, আমার আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

তাহলে আমি নিজেই যাচ্ছি, ঠিকানা কাছেই আছে। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।

বুকভরা হতাশা নিয়ে ফিরলাম বেকার স্ট্রিটের বাসায়। ভেবেছিলাম, এইটুকু সময়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই হোমসের আরও সাংঘাতিক অবনতি দেখব। কিন্তু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম ওর অবস্থার উন্নতি হয়েছে দেখে। চেহারা আগের মতোই বিবর্ণ, কিন্তু প্রলাপ আর বকছে না। কথা বলল খুব ক্ষীণ কণ্ঠে স্বভাবমতো রসিয়ে রসিয়ে, দেখা হল, ওয়াটসন?

হয়েছে। আসছেন উনি।

চমৎকার! তুমিই আমার সেরা দূত।

উনি আমার সঙ্গেই আসতে চেয়েছিলেন।

অসম্ভব! তা হতেই পারে না। রোগটা জুটিয়েছি কোত্থেকে জানতে চাননি?

উত্তরে আমি যা বলেছি তা জানাতে হোমস সোল্লাসে বললে, ঠিক বলেছ! ওয়াটসন, খাঁটি বন্ধুর কাজ করে এলে। এবার সরে পড়ো।

হোমস, ওঁর মতামতটা শুনে তারপর যাব।

নিশ্চয়ই শুনবে। তবে কী জান, উনি প্রাণ খুলে মতামত প্রকাশ করবেন শুধু আমার সাক্ষাতে। অন্য কেউ থাকলে মন খুলে কথা বলবেন না বলেই জানি। আমার এই খাটের মাথার দিকে একটা ছোট্ট ঘর আছে, ওইখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।

হোমস! কী আবোল-তাবোল বকছ!

যা বলছি, তা-ই করো। ঘরটা লুকিয়ে থাকার উপযুক্ত নয় বলেই উনি সন্দেহ করবেন না ওখানে কেউ আছে বলে। এ ছাড়া আর উপায় নেই, ওয়াটসন।

বলতে বলতে আচম্বিতে সটান উঠে বসে হোমস বললে চাপা তীক্ষ্ণ গলায়, গাড়ির চাকার আওয়াজ শুনছি। এসে গেলেন বলে। যাও, ওয়াটসন, যাও! সত্যিই যদি আমাকে ভালোবেসে থাকো, যাও, গিয়ে লুকিয়ে পড়ো! কুইক! শুধু কান খাড়া করে শুনে যাবে, যা-ই ঘটুক না কেন, একটা কথাও বলবে না। মনে থাকে যেন, শুধু শুনবে, নড়বে না, কথা বলবে না!

বলেই হোমস ঝপ করে পড়ে গেল বিছানায়। আচমকা উত্তেজনার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজ্যের অবসাদ। আবার শুরু হল তার বিড়বিড় প্রলাপ বকুনি।

লাফ দিয়ে কোনোমতে লুকিয়ে পড়লাম ছোট্ট খুপরিটার মধ্যে। সিঁড়িতে শোনা গেল পায়ের আওয়াজ, শোবার ঘরের দরজা খুলল এবং বন্ধ হল। তারপর আর শব্দ নেই, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কেবল হাপরের মতো হাঁপানির আওয়াজ... মুমূর্ষুর শ্বাসটানার চেষ্টা! বেশ বুঝলাম, খাটের পাশে দাঁড়িয়ে হোমসের দিকে চেয়ে আছেন মি. স্মিথ। একটু বাদেই ভঙ্গ হল নীরবতা। উচ্চকণ্ঠে বললেন দর্শনার্থী, হোমস! হোমস! শুনতে পাচ্ছ? হোমস!

ঠিক যেন ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে অর্ধ অচেতন মুমূর্ষুর ঘোর কাটানোর চেষ্টা, সেই রকমই খসখস আওয়াজও শুনলাম।

ফিসফিস করে হোমস বললে, মি. স্মিথ, আপনি! আমি ভেবেছিলাম আপনি আসবেন না।

হেসে উঠলেন স্মিথ, তা অবশ্য ঠিক। তবু দেখ, এসেছি। কয়লার আগুন, হোমস, কয়লার আগুন।

আপনার অসীম দয়া। আপনাকে আমি সমীহ করি আপনার বিশেষ কাজের জন্যে।

চাপা হাসি হেসে উঠলেন মিস্টার স্মিথ। বললেন, বটে! এ-খবর কিন্তু লন্ডনের একজনই রাখে–তুমি। জান কী হয়েছে তোমার?

সেই রোগ?

আচ্ছা! লক্ষণগুলো চিনতে পেরেছ তাহলে?

হাড়ে হাড়ে।

হোমস, তোমার চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছ। লক্ষণ সেই একই। ভিক্টর বেচারা চারদিনেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এশিয়ার কালব্যাধি লন্ডনের বুকে একজনকে শেষ করে দেয় কীভাবে ভেবে খুবই অবাক হয়েছিলে তুমি, বিশেষ করে যে-রোগ নিয়ে শুধু আমিই বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছি। তবে কী জান, রোগটার উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়েই তুমি মরেছ।

আমি তো জানি, ভিক্টরকে আপনিই শেষ করেছেন।

জান নাকি? এতই যদি জান, তত ফের আমাকে ডেকেছ কেন বাঁচবার জন্যে? আমার সম্বন্ধে কুৎসা রটিয়ে ফের পায়ে ধরে ডেকে এনেছ কেন শুনি? মতলবটা কী?

রুদ্ধ নিশ্বাসে খাবি খেতে খেতে হোমস বললে, একটু জল দিন!

আর বেশি দেরি নেই তোমার। কিন্তু কাজের কথাটা শেষ হওয়ার আগে তোমাকে মরতে দিতে চাই না বলেই জল দিচ্ছি। উঁহু, ঢকঢক করে খেয়ো না, একটু খাও।–ঠিক আছে। কী বললাম বুঝেছ?

গুঙিয়ে উঠল হোমস। বলল ফিসফিস করে, আমাকে বাঁচান! কথা দিচ্ছি, এ নিয়ে আর কোনো কথা বলব না। আমাকে সারিয়ে তুলুন, দেখবেন, সব ভুলে গেছি।

কী ভুলে যাবে?

ভিক্টর স্যাভেজের মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ যে আপনি, এইমাত্র নিজের মুখেই তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওসব কথা আর মনে রাখব না।

কাঠগড়ায় সাক্ষী হয়ে এ-জীবনে আর তোমাকে দাঁড়াতে হবে না। কাজেই তুমি মনে রাখলে কি রাখলে না, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। কীভাবে মারা গেছে আমার ভাইপো, তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। আমার যত মাথাব্যথা, শুধু তোমার জন্যে, বুঝেছ, শুধু তোমার জন্যে।

আমি জানি, আমার জন্যে।

নিজের ব্রেন নিয়ে অহংকারে মটমট কর বলেই আজ তোমার এই অবস্থা। তোমার ধারণা, তোমার মতো ধারালো মগজ দুনিয়ায় আর কারো নেই। বড্ড স্মার্ট মনে কর নিজেকে। প্রাচ্যদেশীয় খালাসিদের মারফত সংক্রামিত হওয়া ছাড়াও এ-রোগ তোমার শরীরে ঢুকতে পারে ভেবে দেখেছ কি?

ভাববার শক্তি আর নেই। আমাকে বাঁচান!

এখনও বাঁচতে চাও! মরবার আগে বরং জেনে যাও কোত্থেকে জীবাণুটা ঢুকল তোমার শরীরে।

বড় যন্ত্রণা হচ্ছে! যা হয় একটা ওষুধ দিন!

তা-ই নাকি? খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। কুলিগুলোও শেষের দিকে ইঁদুরের মতো চি-চি করত। হাতে-পায়ে খিচ ধরছে, তাই-ই না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খিঁচ ধরছে!

ধরুক, কিন্তু কানে তো খিঁচ ধরেনি, কথা এখনও শুনতে পাচ্ছ। এখন যা বলি শোনো। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ঠিক আগে অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা মনে পড়ে?

না তো।

ভালো করে ভেবে দেখো।

ভাববার মতো মাথা আর নেই। বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

বেশ, বেশ, তাহলে আমিই বরং ধরিয়ে দিচ্ছি। ডাকযোগে কিছু পেয়েছিলে?

ডাকযোগে?

ধর একটা কৌটো?

মনে করতে পারছি না... জ্ঞান হারাচ্ছি... উঃ, মা গো!

হোমস! হোমস! আমার কথা শোনো।

স্পষ্ট শুনলাম, মুমূর্ষু হোমসকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দেওয়া হচ্ছে। কী কষ্টে যে হাত পা গুটিয়ে বসে রইলাম, তা শুধু আমিই জানি।

স্মিথের গলা ভেসে এল, আমার কথা তোমাকে শুনতেই হবে। হাতির দাঁতের একটা কৌটোর কথা মনে পড়ছে? বুধবার ডাকপিয়োন এসে দিয়ে গিয়েছিল। তুমি খুলেছিলে, মনে পড়ছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুলেছিলাম বটে। ভেতরে একটা ছুঁচোলো স্প্রিং ছিল। ইয়ার্কি করে কেউ নিশ্চয়ই–

ইয়ার্কি নয় হে, ইয়ার্কি নয়। জীবন দিয়ে এখুনি সেটা টের পাবে। মাথায় তোমার গোবর আছে বলেই বুঝতে পারনি, এমনি ইডিয়ট তুমি। এই বুদ্ধি নিয়ে আমাকে ঘাঁটাতে এসেছিলে কোন সাহসে? তেমনি দিয়েছি পালটা মার!

আবার খাবি খেতে খেতে হোমস বললে, হ্যাঁ,হা, মনে পড়েছে! কৌটো খুলতেই স্প্রিংয়ের খোঁচায় আঙুল থেকে রক্ত বেরিয়ে গিয়েছিল। এই তো সেই কৌটো টেবিলেই রয়েছে।

হ্যাঁ এই সেই কৌটো। থাক এটা আমার পকেটে। সঙ্গে নিয়ে যাব, কোনো প্রমাণ আর থাকবে না। ভিক্টরের মৃত্যু সম্পর্কে বেশি খবর জেনে ফেলেছিলে বলেই তোমাকে মরণ দাওয়াই দিতে হল আমাকে। আর বেশিক্ষণ আয়ু নেই তোমার। শেষ নিশ্বাসটা দেখে তারপর যাব। বসে বসে দেখে যাই কীভাবে অক্কা পাও তুমি।

এবার হোমসের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ হয়ে গেল যে, না-শোনারই শামিল। স্মিথ বললেন, কী বললে? গ্যাসের আলো বাড়িয়ে দেব? চোখে অন্ধকার দেখছ বুঝি? শুরু হয়ে গেছে তাহলে। বেশ, বেশ, আলো বাড়িয়ে দিচ্ছি।

পায়ের আওয়াজ গেল জানলার কাছে, তারপর হঠাৎ জোরালো আলো দেখা গেল ঘরে, সেইসঙ্গে ভেসে এল স্মিথের গলা, বলো, বন্ধু, বলো, শেষ মুহূর্তে তোমার আর কী সেবায় লাগতে পারি বলে ফেলো।

সিগারেট আর দেশলাইটা দিন।

আর একটু হলেই বিস্ময়ে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠতাম আমি। একটু কাহিল গলায় হলেও বেশ স্বাভাবিক গলায় কথা বলছে হোমস। এ-স্বর আমি চিনি। বেশ কিছুক্ষণ থমথমে হয়ে রইল, কোনো শব্দ নেই। বেশ বুঝলাম, বিষম অবাক হয়ে হাঁ করে হোমসের দিকে চেয়ে আছেন মি. কালভার্টন স্মিথ।

তার পরেই শুনলাম তাঁর শুষ্ক কাটা-কাটা কণ্ঠস্বর, এর মানে কী?

স্রেফ অভিনয়। অভিনয়টা মর্মস্পর্শী করার জন্যে অবশ্য গত তিনদিন জল বা খাবার কিছুই খাইনি। আপনার হাত থেকে ওই প্রথম একটু জল খেলাম। তবে কী জানেন, ধুমপানটা আমার কাছে আরও উপাদেয়। এই তো পেয়েছি সিগারেট।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে ওঠার আওয়াজ পেলাম। তারপরই হোমসের গলার আওয়াজ, আঃ কী আরাম! আরে, আরে! পুরোনো বন্ধুর পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি মনে হচ্ছে!

পায়ের আওয়াজ শোনা গেল বাইরে, খুলে গেল দরজা, কে যেন ঘরে ঢুকল ভারী বুটের আওয়াজ তুলে।

হোমস বললে, মর্টন, এই তোমার আসামি।

ইনস্পেকটর মর্টন রুটিনমাফিক গাওনা গাইল, মি. স্মিথ, ভিক্টর স্যাভেজকে খুন করার অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি।

খুক খুক করে হেসে উঠল হোমস। বললে, সেইসঙ্গে আর একটা চার্জ জুড়ে দিয়ে হে, শার্লক হোমসকে খুন করার চেষ্টাও ইনি করেছিলেন। তবে মুমুর্মুর মুখ চেয়েই বোধ হয় মি. কালভার্টন স্মিথ একটা উপকারও করেছেন, নিজেই গ্যাসের আলো বাড়িয়ে সিগন্যাল দিয়ে ডেকে এনেছেন তোমাকে। ওঁকে তাই আগে ভারমুক্ত করো। ওঁর কোটের ডান পকেটে একটা ছোট্ট কৌটো আছে, আগে ওটা বার করে নাও, ধন্যবাদ! এখানে রাখো কৌটোটা, নাড়াচাড়া করতে যেয়ো না, মারা পড়বে। কোর্টে মামলা উঠলে কৌটোটা কাজে লাগবে।

আচমকা ধাবমান পদশব্দ, ধস্তাধস্তি, লোহায় লোহায় ঠোকাঠুকির ঝনৎকার এবং যন্ত্রণাবিকৃত চিৎকার শোনা গেল।

ইনস্পেকটর বললে, খামোখা মার খেয়ে মরছেন, সিধে হয়ে দাঁড়ান।

কড়াং করে আওয়াজ হল হাতকড়া লাগিয়ে দেওয়ার।

হিংস্র কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলেন স্মিথ, খুব ফাঁদে ফেললে দেখছি! হোমস, কাঠগড়ায় শেষ পর্যন্ত তোমাকেই উঠতে হবে, আমাকে নয়। রোগ সারানোর নাম করে ডেকে এনে পাগলের মতো যা-তা বলে আমাকে ফাসাতে যেয়ো না, বিপদে পড়বে। মিথ্যে সন্দেহকে গল্প বানিয়ে প্রমাণ করা যায় না, পাগলের প্রলাপ বলবে সবাই।

আরে ওয়াটসন যে! আমি বেরিয়ে আসতে সোল্লাসে বললে হোমস, কী ভুলো মন দেখেছ আমার, তোমার কথা একদম খেয়ালই ছিল না। ভায়া, এক হাজার এক বার ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। মি. স্মিথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আর দরকার আছে কি? আজ বিকেলেই তো সে-পালা চুকিয়ে এসেছ। গাড়ি আছে তো নীচে? মহামান্য অতিথিকে নিয়ে তোমরা এগোও, আমি জামাকাপড় পালটে যাচ্ছি। থানায় আমার থাকা দরকার।

মুখ-হাত পোয়র ফাঁকে ফাঁকে এক গেলাস ব্র্যান্ডির সঙ্গে খানকয়েক বিস্কুট খেয়ে নিয়ে হোমস বললে, আঃ বাঁচলাম। এমনিতে বড়ো অগোছালো আমি, তার ওপর এত বড় ধকল গেলে শরীরপাত হয়ে যাবে। অথচ দেখ, এসব না-করলেও চলত না। মিসেস হাডসনকে যদি বিশ্বাস করাতে না-পারতাম যে মরতে চলেছি, তোমাকে ঠিক সেইভাবে উনি বোঝাতে পারতেন না। তোমার মনে সেই বিশ্বাস আনতে না-পারলে ধুরন্ধর স্মিথকে তুমি এখানে আমার খপ্পরে টেনে আনতে পারতে না। আমি জানতাম, নিজের কীর্তি স্বচক্ষে দেখবার জন্যে ছুটে সে আসবেই। এত লুকোচুরির জন্যে ভাই কিছু মনে

কোরো না। তোমার ওপর আমার প্রচণ্ড আস্থা, তোমার বিদ্যেবুদ্ধির ওপর আমার দারুণ ভরসা।

কিন্তু হোমস, তোমার মুখটা ওইরকম বীভৎস ফ্যাকাশে হল কী করে?

তিনদিন পেটে দানাপানি না-পড়লে কেউই খুব সুস্থ থাকে না। বাকিটুকু সাজাতে একটা স্পঞ্জই যথেষ্ট। কপালে একটু ভেসলিন, চোখে বেলেডোনা, গালের হাড়ে রুজ আর ঠোঁটের কোণে একটু মোম, ব্যস, যে কেউ আঁতকে উঠবে সেই চেহারা দেখলে। বুঝলে, ধোঁকা দেওয়াও একটা আর্ট। মাঝে মাঝে আধক্রাউন আর শুক্তি নিয়ে বকবকানি জুড়ে দিলে মনে হবে, ঠিক যেন প্রলাপ বকুনি। ছলনা-শিল্প নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখবার ইচ্ছে আমার অনেকদিনের।

বেশ, তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু সত্যিই যখন ছোঁয়াচে রোগ হয়নি তোমার, তখন আমাকে কাছে ঘেঁষতে দিলে না কেন?

কৃত্রিম হতাশায় কপালে কপট করাঘাত করে হোমস বললে, হায় রে, তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে! চার ফুট দূর থেকে আমি ধোঁকা দিতে পারি একজন ঝানু ডাক্তারকে, কিন্তু আমার গায়ে হাত দিলে কি সঙ্গেসঙ্গে ধরা পড়ে যেতাম না? জ্বর কোথায় আমার? নাড়ি তো অচঞ্চল! মুমূষুর মতো অবস্থা যে আমার নয়, তা তো গায়ে হাত দিলেই বোঝা যায়। তোমার মনে অবিশ্বাস এসে গেলে ধড়িবাজ স্মিথকে বিশ্বাস করিয়ে আমার খপ্পরে কি নিয়ে আসতে পারতে? তুমি কি ভাব, তোমার ডাক্তারি বিদ্যেবুদ্ধির উপর আমার

সত্যিই অশ্রদ্ধা আছে? তোমাকে কি আমি চিনি না? উঁহু ওয়াটসন, কৌটোয় হাত দিয়ো না। পাশ থেকে ডালাটা সামান্য ফাঁক করে দেখতে পার, বিষধর সাপের দাঁতের মতো স্প্রিংয়ের ডগাটা উঁকি দিচ্ছে কোনখান থেকে, তার বেশি নয়। ঠিক এই কায়দায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে স্যাভেজ বেচারাকে, এই পিশাচটার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মাশুল সে দিয়েছে নিজের জীবন দিয়ে! অনেকরকম চিঠিপত্র আসে আমার কাছে, তাই প্যাকেট খোলার সময় আমি হুঁশিয়ার থাকি। কিন্তু আমি শয়তানটাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে, সত্যি সত্যিই যেন ওর মরণ-মারে ঘায়েল হয়েছি, যাতে উল্লাসের চোটে বাহাদুরি নিতে গিয়ে নিজের মুখেই স্বীকার করে নিজের কীর্তি। তা অভিনয়টা কীরকম করেছি বল? পাকা শিল্পীর মতোই ছলনার প্যাঁচে কুপোকাত করে ছেড়েছি মহাপাপিষ্ঠ এক শয়তানকে। ধন্যবাদ ওয়াটসন, নাও, কোটটা পরিয়ে দাও। থানার কাজ শেষ হলে সিম্পসনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে পুষ্টিকর কিছু খাবার আহার করে আসা যাবেখন।

———-

টীকা

শার্লক হোমসের মৃত্যুশয্যায় : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডাইং ডিটেকটিভ ১৯১৩-র ডিসেম্বর সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

টাকাকড়ি দেওয়ার ব্যাপারে রাজারাজড়ার মতো দিলখোলা হোমস : এ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে দেখা গিয়েছিল একা ভাড়া গুনতে না-পারায় বাড়িতে অন্য ভাড়াটে

এনে অর্থ সাশ্রয় করতে চেষ্টা করছেন শার্লক হোমস। বোঝা যায় যে এই ক-বছরে যথেষ্ট সচ্ছলতার মুখ দেখেছেন বিশ্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাটি। তবে সেই সময়ে অর্থনৈতিক দূরবস্থা ছিল বলেই হোমস-ওয়াটসনের সাক্ষাৎ হয় এবং শার্লক হোমসের কীর্তিকলাপ গোচরে আসে সাধারণ মানুষের।

সুমাত্রা : ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম দ্বীপ সুমাত্রার দখল ঊনবিংশ শতকের প্রায় সম্পূর্ণ জুড়ে লড়াই চলে ইংরেজ এবং ওলন্দাজদের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ওলন্দাজরা এখানে তাদের অধিকার কায়েম করতে সক্ষম হয়।

কুলি : হিন্দিতে কুলি শব্দের অর্থ মজুর, তামিল ভাষায় মজুরি। অর্থাৎ শব্দটি খাঁটি ভারতীয় এবং ইংলন্ডে এশীয় বা আফ্রিকান মজুরদের বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হত। সম্ভবত ১৮৪০-এ ক্রীতদাস-প্রথা রদ হওয়ার পর এশিয়া বা আফ্রিকা থেকে কম মজুরির শ্রমিক আনা শুরু হয়। এদের নিয়ে আসা হত পাঁচ বা তার বেশি বছরের চুক্তিতে। এদের নিয়ে আসা বা বসবাসের ব্যবস্থা যেভাবে করা হত, তা ছিল চরম অস্বাস্থ্যকর এবং তার ফলে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হত। পরের দিকে এইভাবে কুলি নিয়ে আসার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে শুরু করে বিভিন্ন দেশ।

জীবনে নাম শুনিনি : দুটি অসুখের নামই কাল্পনিক।

ইঞ্জেকশন নেওয়ার সিরিঞ্জ : নিশ্চয়ই কোকেন সেবন করবার জন্য রাখা ছিল।

কয়লার আগুন : সম্ভবত বাইবেলে সেন্ট পলের উক্তির উদ্ধৃতি : ... for in so doing thou shalt heap coals of fire on his head. (রোমানস ১২: ২১)।

আরে ওয়াটসন যে : লুকোনো সাক্ষী রেখে অপরাধীকে দিয়ে দোষ কবুল করানোর ঘটনা দেখা গিয়েছে দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য মাজারিন স্টোন গল্পে।

বেলেডোনা : বেলেডোনা বা নাইটশেড এক ধরনের বিষাক্ত ভেষজ। লালচে গাছড়ায় জন্মানো কালো জাম-গোছের ফলের সুগন্ধী রস থেকে বেলেডোনা আহরিত হয়। অ্যাট্রোপিন সালফেট জাতীয় ওষধি তৈরি হয় এই রস থেকে।

মোম : সে-যুগের ইংলন্ডে মোম লাগিয়ে গোঁফ চকচকে এবং শক্ত রাখার প্রচলন ছিল।

সিম্পসনের রেস্তোরাঁ : লন্ডনের স্ট্র্যান্ডে স্যামুয়েল রীসের ১৮২৮-এ প্রতিষ্ঠা করা গ্র্যান্ড সিগার ডিভান, ক্রমে একটি কফির দোকানে পরিণত হয়। তা ছাড়া, এখানকার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে এটি একটি দাবা খেলার আড্ডাও হয়ে ওঠে অচিরে। ১৮৪৮-এ এর অংশীদার হিসেবে যোগ দেন বিখ্যাত খাদ্য পরিবেশক বা ক্যাটারার, জন সিম্পসন এবং এর নতুন নাম হয় সিম্পসন্স গ্র্যান্ড সিগার ট্যাভার্ন। বেঞ্জামিন ডিসরেইলি, উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন, চার্লস ডিকেন্স প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নিয়মিত আসা-যাওয়া ছিল এই আড্ডায়।

শয়তানের পা

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ডেভিলস ফুট]

বন্ধুবর শার্লক হোমসের কীর্তিকাহিনি লিখতে গিয়ে সবচেয়ে বড়ো যে অসুবিধের সম্মুখীন হয়েছি তা হল হোমসেরই অনিচ্ছা–নিজের ঢাক নিজে তো পিটবেই না–কাউকে পিটতেও দেবে না। কথা বলে কম, ছিদ্র খোঁজে সব কিছুর মধ্যে। প্রকৃতি কাঠখোট্টা। কাছে গেলে ভয় লাগে। সস্তা বাহবায় তার বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। রহস্যের জট সুন্দরভাবে ছাড়িয়ে ঠিক সমাধানে পৌঁছোতে পারলেই অনাবিল তৃপ্তিতে মনটা ভরে ওঠে কানায় কানায়–সেইটাই ওর সবচেয়ে বড়ো আনন্দ, সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। তারপর বাহবার ভাগটুকু তুলে দেয় সরকারি গোয়েন্দার হাতে এবং যখন দেশ জুড়ে ধন্য-ধন্য রব ওঠে সরকারি গোয়েন্দাটির নামে, বিদ্রুপের হাসি হাসে আপন মনে। শুধু এই কারণেই প্রচুর রসদ হাতে থাকা সত্ত্বেও বেশ কয়েক বছর ওর অনেক ভালো ভালো কীর্তিকলাপ জনগণকে উপহার দিতে পারিনি আমি।

তাই গত মঙ্গলবার হোমসের কাছ থেকে টেলিগ্রামটা পেয়ে অবাক হলাম। এ যে আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। এভাবে তো টেলিগ্রাম পাঠিয়ে কখনো ফরমাশ করেনি হোমস। লিখেছে : কর্নিশ-আতঙ্ক নিয়ে এবার কিছু লিখে ফেললা–পাঠকরা চমকে যাবে। অনেক অদ্ভুত কেসের সমাধান করেছি কিন্তু এত অদ্ভুত কোনোটাই নয়। জানি না হঠাৎ এ-খেয়াল ওর মাথায় এল কেন, কেনই-বা মনে পড়ল পুরোনো কাহিনি–আমি কিন্তু আর

দেরি করলাম না। মত পালটে যাওয়ার আগেই তড়িঘড়ি কেসটার পুরোনো কাগজপত্র খুঁজে নিয়ে লিখতে বসেছি আশ্চর্য ভয়াল সেই উপাখ্যান।

১৮৯৭ সালের বসন্তকালে শরীর ভেঙে পড়ে শার্লক হোমসের। লোহার কাঠামোতেও ঘুণ ধরার উপক্রম হয় অত্যধিক পরিশ্রম আর স্বাস্থ্যরক্ষায় বিন্দুমাত্র যত্ন না-নেওয়ার দরুন। মার্চ মাসে ধূমকেতুর মতো রীতিমতো নাটকীয়ভাবে হোমসের জীবনে ঢুকে পড়লেন হার্লে স্ট্রিটের বিখ্যাত। ডাক্তার মুর আগার–সে-কাহিনি অন্য সময়ে বলা যাবেখন এবং জানিয়ে দিলেন কর্মক্ষমতা জন্মের মতো চলে যাবে যদি এখুনি সব কাজ ফেলে ঢালাও বিশ্রাম না নেয় হোমস। নিজের শরীর নিয়ে কোনোকালেই ভাবত না হোমস–শরীর থেকে মনকে সরিয়ে আনার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল বলেই ঝুঁদ হয়ে থাকত হাতের কাজ আর চিন্তায়। কিন্তু যখন শুনল জন্মের মতো কাজ করার ক্ষমতা চলে যেতে পারে বিশ্রাম না নিলে, তখন সব কাজ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঠিক করল বায়ু পরিবর্তনে যাবে। এই কারণেই সেই বছর বসন্তের গোড়ায় কর্নিশ অন্তরীপের শেষ প্রান্তে পোলধু উপসাগরের কাছে একটা ছিমছাম ছোট্ট কটেজে আস্তানা নিলাম দুই বন্ধু।

অপূর্ব জায়গা বটে, হোমসের নীরস অন্তর প্রকৃতির উপযুক্ত। ঘাস ছাওয়া উঁচু জমির ওপর আমাদের চুনকাম করা কটেজের জানলা থেকে চোখ পড়ত অর্ধবৃত্তাকারে ক্রূর কুটিল দৃশ্যের পর দৃশ্য, দেখতাম পালতোলা জাহাজের মরণফাঁদ মাউন্টস বে–দেখতাম কীভাবে সারি সারি খোঁচা খোঁচা কালচে এবড়োখেবড়ো পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জলের মধ্যে থেকে। সাগরফেনায় ঢাকা এই চোরা পাথরের ধাক্কায় ডুবেছে বহু জাহাজ, মরেছে বহু খালাসি। অথচ উত্তুরে বাতাসে বড়ো শান্ত দেখায় ভয়াল এই মাউন্টস বে–দূর

থেকে ঝড়ে উথালিপাথালি জাহাজ ছুটে আসে মরীচিকার টানে–আসে একটু স্থির হতে, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচতে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের ঝড় এলেই কিন্তু চেহারা পালটে যায় শান্ত সুন্দর এই উপসাগরের। তখন ঘূর্ণিঝড়ের দাপটে জল ফুঁসে ওঠে, নোঙরে হ্যাচকা টান পড়ে, শুরু হয় পাথরের খোঁচা বাঁচিয়ে জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার শেষ লড়াই। তাই বুদ্ধিমান খালাসি এই শয়তান-অঞ্চলের ধারেকাছেও জাহাজ আনে না।

জলের মতো ডাঙার চেহারাও বুক কাঁপানো। ঢেউ খেলানো বাদার পর বাদা–বালিয়াড়ি রঙের তরঙ্গায়িত জলাভূমির শেষ যেন আর নেই। কাকপক্ষীও বুঝি থাকে না ধু-ধু সেই প্রান্তরে। মাঝে মাঝে মাথা উঁচিয়ে থাকা এক আধটা গির্জের চুড়ো দেখে কেবল বোঝা যায় ছন্নছাড়া সেকেলে গ্রামগুলো রয়েছে কোথায় কোথায়। এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে প্রাগৈতিহাসিক বাসিন্দাদের তৈরি পাথরের স্মৃতিস্তম্ভ—সুদূর অতীতে তারা যে এই বিজন অঞ্চলে ঘরসংসার করে গিয়েছিল–তার পাথুরে প্রমাণ বিচিত্র থাম আর বিদঘুটে স্তূপের অন্তরালে তাদেরই চিতাভস্ম আর কিম্ভুতকিমাকার মাটির বাসনপত্র। জায়গাটার এই প্রাগৈতিহাসিক মাহাত্ম্য, হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া জাতির স্মৃতিচিহ্ন এবং সব মিলিয়ে একটা ভয়াল ভয়ংকর রূপ শার্লক হোমসের বেশ মনে ধরেছে বোঝা গেল। কল্পনায় গা ভাসিয়ে দেওয়ার এমন উপযুক্ত খোরাক পেয়ে অধিকাংশ সময় কাটত নির্জন জলায় একা একা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুরে বেড়িয়ে। সুপ্রাচীন কর্নিশ ভাষাটাও খুব পছন্দ হয়েছে দেখা গেল। এই নিয়ে রীতিমতো চর্চাও আরম্ভ করে দিল। আমাকে বললে, চালডিন ভাষার সঙ্গে নাকি কর্নিশ ভাষার দারুণ মিল আছে। টিনব্যবসায়ী ফিনিশিয়ানদের ভাষা

থেকে বেশ কিছু শব্দ ধার করাও হয়েছে। ভাষাতত্ত্বর ওপর এক বাক্স বই আনিয়ে এই সম্পর্কে সবে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করতে যাচ্ছে, এমন সময়ে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করে দিয়ে পাণ্ডববর্জিত অমন একটা বিকট স্বপ্নিল দেশের কোথেকে একটা হতকুচ্ছিত কূট সমস্যা এসে হাজির হল একেবারে দোরগোড়ায়–খাস লন্ডন শহরেও এমন রক্ত-জল-করা, এমন প্যাচালো, এমন রহস্যজনক ধাঁধার জট কখনো ছাড়াতে হয়নি। দিব্যি শান্তিতে খেয়েদেয়ে বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম, এমন সময়ে মূর্তিমান উৎপাতের মতো এই চক্রান্তে জড়িয়ে যাওয়ায় শান্তিতে দিনযাপন শিকেয় উঠল, অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনার আবর্ত নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করে বিপর্যস্ত করে তুলল আমাদের প্রাত্যহিক জীবন এবং সে-উত্তেজনায় চঞ্চল হল শুধু কর্নওয়াল নয়–সমগ্র পশ্চিম ইংলন্ড। আমার কিছু কিছু পাঠক হয়তো সে সময়ে খবরের কাগজে কর্নিশ-আতঙ্ক সম্বন্ধে দু-এক লাইন খবর পড়ে থাকতে পারেন কিন্তু পুরো খবর কেউ জানেন না। তেরো বছর পরে অকল্পনীয় সেই কাহিনিই সবিস্তারে উপহার দিতে বসেছি সারাদেশকে।

আগেই বলেছি এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে থাকা গির্জের মাথাগুলো দেখেই বোঝা যেত মান্ধাতার আমলের গাঁগুলো রয়েছে কর্নওয়ালের কোথায় কোথায়। সবচেয়ে কাছের গ্রামটার নাম ট্রেডান্নিক ওলাস। শ্যাওলা ধরা সুপ্রাচীন একটা গির্জাকে ঘিরে শ-দুই বাসিন্দার অনেকগুলো কটেজ নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই গ্রাম। গাঁয়ের পাদরি মিস্টার রাউন্ড হে ভদ্রলোকের প্রত্নতত্ত্বের বাতিক থাকায় হোমস বেশ খাতির জমিয়ে নিল তার সঙ্গে। ভদ্রলোক মাঝবয়েসি, মোটাসোটা, অমায়িক। স্থানীয় খবরের ডিপো বললেই চলে। চায়ের নেমন্তন্ন রাখতে পারিসাহেবের বাড়ি গিয়ে জেনেছিলাম মর্টিমার ট্রেগেনিস নামে এক ভদ্রলোক পাদরির স্বল্প আয়কে একটু বৃদ্ধি করেছেন তাঁর পেল্লায় বাড়ির খানকয়েক

ঘর ভাড়া নিয়ে। ভাড়াটের সঙ্গে পাদরির এমনিতে অনেক অমিল থাকলেও পয়সার দিক দিয়ে কিছুটা সুরাহা হওয়ায় কৃতার্থ হয়েছেন ব্যাচেলর পাদরি। ভাড়াটের চেহারাটা কিন্তু পাতলা, কালচে চোখে চশমা; হাঁটেন একটু ঝুঁকে–যেন বিকৃতি আছে শরীরের কোথাও! চায়ের আসর একাই মাতিয়ে রাখলেন পাদরিসাহেব–কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক চুপচাপ বসে রইলেন অন্যদিকে তাকিয়ে। যত রাজ্যের বিষাদ মুখে টেনে এনে অদ্ভুতভাবে মুখে চাবি এঁটে ডুবে। রইলেন নিজের মনের ভেতর মনে হল যেন অনেক দুশ্চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছেন। আসলে তার প্রকৃতিই এইরকম মৌন।

ষোলোই মার্চ মঙ্গলবার এহেন দুই ব্যক্তি দুম করে ঢুকে পড়লেন আমাদের ঘরে প্রাতরাশের ঠিক পরেই। আমরা তখন সবে ধূমপান আরম্ভ করেছি–শেষ করেই রোজকার অভ্যেসমতো জলা পরিভ্রমণে বেরোব ভাবছি।

উত্তেজিত কণ্ঠে পাদরি সাহেব বললেন, কাল রাতে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক আর অত্যন্ত মর্মান্তিক একটা কাণ্ড ঘটেছে। আমাদের কপাল ভালো, বিধাতা সদয় বলেই অশ্রুতপূর্ব এই ঘটনার মধ্যে আপনাকে আমরা পেয়ে গেছি–ইংলন্ডে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই যিনি এ-রহস্যের সমাধান করতে পারেন।

আমি পাদরিমশায়ের দিকে নির্দয় চোখে কটমট করে তাকালাম। কিন্তু শিকারের গন্ধ পেলে ঝানু হাউন্ড যেভাবে চনমনে হয়ে ওঠে, ঠিক সেইভাবে মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে পিঠ খাড়া করে হোমস সিধে হয়ে বসল আস্তে আস্তে। হাতের ইশারায় বসতে বলল উত্তেজিত দুই অভ্যাগতকে। এঁদের মধ্যে অনেক সংযত দেখলাম মর্টিমার ট্রেগেনিসকে।

তা সত্ত্বেও যেভাবে ভদ্রলোক অস্থিরভাবে রোগা-রোগা দু-হাত পরস্পর ঘষতে লাগলেন এবং কালো চোখের উজ্জ্বল চাউনি মেলে তাকিয়ে রইলেন, বেশ বুঝলাম, একই আতঙ্কে দুজনেই সমানভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

বললেন পাদরিকে, আপনি বলবেন, না আমি বলব?

হোমস বললে, দেখেছি আপনিই প্রথম ব্যাপারটা আবিষ্কার করেছেন–উনি জেনেছেন পরে–সুতরাং আপনি শুরু করুন।

ভারি সোজা এই অনুমিতি সিদ্ধান্ত অকৃত্রিম বিস্ময়চিহ্ন ফুটিয়ে তুলল দুজনেরই মুখে। ব্যাপারটা আমিও বুঝলাম দুজনের সাজপোশাক দেখে। পুরুতমশায় পোশাক পরেছেন তাড়াহুড়ো করে, কিন্তু ভাড়াটে ভদ্রলোক শ্রীঅঙ্গে জামাকাপড় চাপিয়েছেন বেশ পরিপাটি করে।

পাদরি বললেন, আমি বরং গোড়ায় দু-একটা কথা বলে নিই। শোনবার পর ভেবে দেখবেন মিস্টার ট্রেগেনিসের কাছে বিশদ শুনবেন না সোজা ধাওয়া করবেন রহস্যে ঘেরা অকুস্থল অভিমুখে। জলার কাছে মান্ধাতার আমলের পাথরটার কাছেই ট্রেডান্নিক ওয়ার্দা ভবনে গত সন্ধ্যা কাটিয়ে এসেছেন ওঁর দুইভাই আর এক বোনের সঙ্গে, ভাইদের নাম ওয়েন আর জর্জ। বোনের নাম ব্রেন্দা। তাস খেলেছেন রাত দশটা পর্যন্ত দশটার একটু পরেই চলে আসবার সময়ে দেখে এসেছেন তাস নিয়ে খাবার ঘরের গোল টেবিল ঘিরে মশগুল হয়ে বসে তিন ভাইবোন–শরীর বা মনের স্বাস্থ্য যতখানি ভালো থাকা

সম্ভব, ততটা ভালো। খুব ভোরে ওঠা ওঁর অভ্যেস। আজ ভোরে বেড়াতে বেরিয়ে দেখা হয়ে গেল ডক্টর রিচার্ডসের সঙ্গে জরুরি কল পেয়ে ছুটছেন ট্রেডান্নিক ওয়ার্দা ভবনে। উদবিগ্ন হলেন মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেন্নিস। গেলেন তৎক্ষণাৎ। গিয়ে দেখলেন এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখলেন, কাল রাতে ঠিক যেভাবে গোলটেবিল ঘিরে সামনে তাস নিয়ে বসা অবস্থায় ভাইবোন তিনজনকে দেখে গিয়েছিলেন, সেইভাবেই বসে রয়েছে তারা, টেবিলে ছড়ানো রয়েছে তাস, মোমবাতি গোড়া পর্যন্ত পুড়ে নিভে গেছে। চেয়ারে পাথরের মতো শক্ত হয়ে মরে পড়ে আছে বোন আর দু-পাশে বসে দু-ভাই বিকৃত গলায় চেঁচাচ্ছে, পাগলের মতো হাসছে, গান গাইছে, কখনো কাঁদছে–সুস্থ মস্তিষ্কের কোনো লক্ষণ তাদের নেই। তিন জনেরই মুখে ফুটে উঠেছে অবর্ণনীয় বিভীষিকার প্রতিচ্ছবি–বিকট খেঁচুনি আর প্রবল আক্ষেপে মুখগুলো যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে সীমাহীন আতঙ্কে। অনেক দিনের রাঁধুনি আর হাউসকিপার মিসেস পোর্টার ছাড়া বাড়িতে কেউ নেই। রাত্রে সে মড়ার মতো ঘুমিয়েছে–আওয়াজ-টাওয়াজ পায়নি। চুরিও যায়নি কিছু কোথাও কিছু অগোছালো অবস্থাতেও পাওয়া যায়নি। কিন্তু কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না এমন কী ভয়ংকর কাণ্ড ঘটল যা দেখে কল্পনাতীত আতঙ্কে একটি মেয়ে মরে পাথর হয়ে গিয়েছে, আর দুটি শক্তসমর্থ পুরুষের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মিস্টার হোমস, সংক্ষেপে এই হল ঘটনা। আপনি যদি মাথা খাটান এ নিয়ে, মস্ত উপকার হয় আমাদের।

মনে মনে ভাবছিলাম, কী করে কয়েকটা বাক্যবাণ ত্যাগ করে বন্ধুবরকে সহজ অবস্থায় ফিরিয়ে আনব–এসেছি ভাঙা স্বাস্থ্য জোড়া লাগাতে রহস্য সমাধান করতে নয়–এইটাই বুঝিয়ে বলব। কিন্তু ওর কোঁচকানো কপালের ভাঁজে আঁকা গভীর চিন্তার রেখা দেখে

বুঝলাম বৃথা চেষ্টা। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে অদ্ভুত নাটকটা নিয়ে যেন সমাহিত হয়ে রইল মনে মনে।

তারপর বললে, কথা দিচ্ছি, এ-ব্যাপারে আপনাদের পাশে আমি আছি। সত্যিই খুব জটপাকানো মনে হচ্ছে ব্যাপারটা, খুবই রহস্যময়। আপনি কি সেখানে নিজে গেছিলেন, মিস্টার রাউন্ড হে?

না। মিস্টার ট্রেগেনিস ছুটতে ছুটতে এসে খবরটা দিতেই তড়িঘড়ি করে আসছি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে।

জায়গাটা এখান থেকে কদ্দূরে?

মাইলখানেক।

তাহলে হেঁটেই যাওয়া যাক। যাওয়ার আগে মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেনিসকে কয়েকটা প্রশ্ন করব।

এতক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে ছিলেন মিস্টার ট্রেগেনিস। লক্ষ করলাম, ওঁর চাপা উত্তেজনা পাদরিমশায়ের ফেটে-পড়া উত্তেজনার চাইতে কোনো অংশে কম তো নয়ই বরং বেশি। ফ্যাকাশে মুখে হোমসের দিকে উদবিগ্ন চোখে তাকিয়ে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। রোগা-রোগা দু-হাত কচলাচ্ছেন বিরামবিহীনভাবে। পারিবারিক বিপর্যয়ের কাহিনি শুনতে শুনতে

থর থর করে কাপছে দুই ঠোঁট। কুচকুচে কালো দুই চোখেও যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে বর্ণনার অতীত সেই আতঙ্ক।

বললেন সাগ্রহে, যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস করুন, মিস্টার হোমস। যদিও বিষয়টা আলোচনা করার মতো নয়। তাহলেও যা জানি সব বলব।

কাল রাতের ঘটনা বলুন।

পাদরিমশায় যা বললেন, গেছিলাম আড্ডা মারতে। ওরা বললে, এক হাত হুইস্ট খেলা যাক। বসে গেলাম তাস নিয়ে। তখন ন-টা। উঠলাম সোয়া দশটা নাগাদ। ওরা তখন দারুণ ফুর্তিতে মশগুল হয়ে বসে টেবিল ঘিরে।

আপনাকে এগিয়ে দিল কে!

মিসেস পোর্টার শুয়ে পড়ায় আমি নিজেই হল ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলাম–দরজা বন্ধ করলাম নিজেই। খাবার ঘরের জানলা বন্ধ ছিল কিন্তু খড়খড়ি ভোলা ছিল। আজ সকালেও জানলা দরজার অবস্থা দেখলাম সেইরকম। বাড়িতে কেউ ঢুকেছে বলে মনে হল না। তা সত্ত্বেও সাংঘাতিক আতঙ্কে স্রেফ পাগল হয়ে গিয়েছে ভাইরা–আর ভয়ের চোটে মরে কাঠ হয়ে পড়ে রয়েছে বোন–মাথাটা ঝুলে পড়েছে চেয়ারের হাতল পর্যন্ত। মিস্টার হোমস জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ঘরের সেই দৃশ্য মন থেকে আমি মুছতে পারব না।

আশ্চর্য, খুবই আশ্চর্য। আপনার নিজের কোনো ব্যাখ্যা আছে এ-ব্যাপারে?

খোদ শয়তান ঘরে ঢুকেছিল, মিস্টার হোমস! কাঁপতে কাঁপতে বললেন মর্টিমার ট্রেগেন্নিস। শয়তান নিজে এসে দু-দুটো মানুষকে বদ্ধ উন্মাদ করে গিয়েছে আর একজনের প্রাণকে লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে! এ-কাজ মানুষের নয়–হতে পারে না!

তাই যদি হয় তো এ-ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। তবে সে-সিদ্ধান্তে আসার আগে স্বাভাবিক ব্যাখ্যা যদি পাওয়া যায়, চেষ্টা করে দেখতে হবে। মিস্টার ট্রেগেন্নিস, আপনি দেখছি ফ্যামিলি থেকে আলাদা ভাইবোনদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতেন না।

কথাটা ঠিক। আমাদের টিনের খনি ছিল। বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা ভাগ বাটোয়ারা করে নিই। সেই সময়ে একটু মন কষাকষি হয়েছিল বটে, এখন সেসব কারো মনে নেই। মানিয়ে নিয়েছি–আলাদা থাকলেও মিলেমিশে আছি।

কাল রাতের ব্যাপারে ফিরে যাওয়া যাক। একসঙ্গে আড্ডা মেরে যাওয়ার সময়ে এমন কিছু নজরে পড়েছিল যার সঙ্গে আজকের এই মর্মান্তিক ব্যাপারের যোগাযোগ আছে? ভালো করে ভেবে দেখুন, মিস্টার ট্রেগেন্নিস। ছোটোখাটো সূত্র পেলেও উপকার হবে আমার!

সে-রকম কিছু মনে পড়ছে না।

চারজনেই কি হইচই করছিলেন? ফুর্তির মেজাজে ছিলেন?

দারুণভাবে।

ভাইবোনেরা কি ভীতু ধাতের? আসন্ন বিপদ সম্পর্কে কোননারকম ভয়-টয় এর আগে দেখিয়েছিল?

একদম না।

কাজে লাগে, এ-রকম কিছুই তাহলে বলার নেই আপনার?

তন্ময় হয়ে মুহূর্তের জন্যে কী যেন ভাবলেন মর্টিমার ট্রেগেন্নিস।

বললেন, একটা ব্যাপার মনে পড়ছে। আমি জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসে ছিলাম। জর্জ বসে ছিল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে। হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর দিয়ে জানলার দিকে কেন তাকাল দেখবার জন্যে ঘাড় ঘুরিয়েছিলাম। ভোলা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দেখলাম অন্ধকার বাগানে কালো ছায়ার মতো সাঁৎ করে কী যেন একটা সরে গেল, মানুষ কি জন্তু বোঝা গেল না। জর্জকে জিজ্ঞেস করতে বললে, ওরও মনে হল কী যেন একটা ঝোঁপের মধ্যে মিলিয়ে গেল–ভালোভাবে ঠাহর করা গেল না।

উঠে গিয়ে দেখে এসেছিলেন?

না। সামান্য ব্যাপার বলেই যাইনি। গুরুত্ব দিইনি।

এর মধ্যে আসন্ন বিপদের সংকেত টের পাননি? অমঙ্গলের পূর্বাভাস?

একেবারেই না।

এত সকালে দুঃসংবাদটা কীভাবে শুনলেন?

ভোরে উঠে বেড়াতে বেরোনো আমার বরাবরের অভ্যেস। আজকেও বেরিয়েছি, এমন সময়ে পাশে এসে দাঁড়াল ডক্টর রিচার্ডসনের গাড়ি। মিসেস পোর্টার একটা ছোকরা মারফত ওঁকে এখুনি ডেকে পাঠিয়েছেন। উঠে বসলাম গাড়িতে। বাড়িতে পৌঁছে ঘরের দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মোমবাতি আর ফায়ারপ্লেসের আগুন নিভে গেছে বেশ কয়েক ঘন্টা আগে। অন্ধকার ঘরে বসে থেকেছে ওরা ভোরের আলো না-ফোঁটা পর্যন্ত। ডাক্তার বললেন, ঘন্টা ছয়েক আগে মারা গেছে ব্রেন্দা–জোরজবরদস্তির কোনো চিহ্ন কোথাও নেই! মুখ-চোখের ওইরকম বিকট চেহারা নিয়ে ঘাড় গুঁজে বসে আছে চেয়ারে। বিরাট হনুমানের মতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে গলা ছেড়ে গান গাইছে জর্জ ওয়েন। সে-দৃশ্য দেখা যায় না! আমি সহ্য করতে পারলাম না–ডাক্তার তো প্রায় অজ্ঞানের মতো এলিয়ে পড়লেন চেয়ারে কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল মুখ। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে এলাম বাইরে।

পরমাশ্চর্য হলে যদি কিছু থাকে, তবে তা এই কেস, উঠে দাঁড়িয়ে আলনা থেকে টুপি নামাতে নামাতে বললে হোমস। আর দেরি করা সমীচীন হবে না–চলুন যাওয়া যাক ওয়ার্দায়। উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায় শুরুতেই এ-রকম গোলমেলে সমস্যা এর আগে কক্ষনো হাতে আসেনি আমার।

আমাদের প্রথম দিনের কার্যকলাপ তদন্তের অগ্রগতির পক্ষে খুবই সামান্য। সূত্রপাতেই একটা ঘটনা অদ্ভুত ছাপ রেখে গেল আমার মনে। অকুস্থলে যাওয়ার পথে রাস্তাটা সরু গলির মতো এক জায়গায় বাঁক নিয়েছে। হঠাৎ শুনলাম সামনের দিক থেকে চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ আসছে। সরে দাঁড়ালাম একপাশে। পাশ দিয়ে ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল গাড়িটা। পলকের জন্যে বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম বীভৎসভাবে বিকৃত, বিকট, একটা মুখ জ্বলন্ত চাহনি মেলে কটমট করে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। দাঁতে দাঁত ঘষটানি আর নিমেষহীন বিস্ফারিত চাহনি ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের মতো বিদ্যুৎবেগে অতিক্রম করে গেল আমাদের।

ঠোঁট পর্যন্ত সাদা হয়ে গেল মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের। আচ্ছন্নকণ্ঠে শুধু বললেন, হেলসটনে নিয়ে যাচ্ছে ভাইদের।

আমাদের ঘোর তখনও কাটেনি। আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে দুঃস্বপ্নের মতো অপস্রিয়মাণ কালো গাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম ফ্যালফ্যাল করে। তারপর পা চালালাম অভিশপ্ত

বাড়িটার দিকে–যে-বাড়ি থেকে এই অদৃষ্ট নিয়ে পাগলাগারদে যাত্রা করেছে দু-দুটো শক্তসমর্থ জোয়ান পুরুষ।

কটেজ ঠিক নয়–বাড়িটাকে ভিলা বলা উচিত। বেশ বড়ো, ঝকঝকে। চারিদিকে বাগান। কর্নিশ বাতাসের দৌলতে এর মধ্যেই ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। বাগানের দিকে খাবার ঘরের জানলাটা দেখা যাচ্ছে। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বর্ণনা মতে এই জানলা দিয়ে এসেছে অপার্থিব সেই ভয়ংকরটি, যাকে দেখামাত্র বিপুল আতঙ্কে তিন তিনটে মানুষের সুস্থ চেতনায় তুমুল বিস্ফোরণ ঘটেছে নিমেষে বিকৃত হয়েছে মস্তিষ্ক। হোমস চিন্তায় কুঁদ হয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছে ফুলের টবের পাশ দিয়ে বারান্দার দিকে। চিন্তায় সে এমনভাবে ডুবে গেছিল যে, জলের ঝারিটার ওপর আচমকা হুমড়ি খেয়ে পড়ায় বাগানের পথ আর আমাদের সকলের পায়ের ওপর দিয়ে ছোটোখাটো একটা বন্যা বয়ে গেল বললেই চলে। বাড়ির ভেতরে দেখা হল প্রৌঢ়া কর্নিশ হাউসকিপার মিসেস পোর্টারের সঙ্গে। একটি বাচ্চা মেয়ের সাহায্য নিয়ে সংসারের কাজ দেখাশুনা করে। হোমসের সমস্ত প্রশ্নের জবাব মুখে মুখে দিয়ে গেল মিসেস পোর্টার। রাত্রে শব্দ-ট কিস্‌সু কানে আসেনি। গতরাতে মনিবরা যেরকম খোশমেজাজে ছিলেন, সে-রকম সচরাচর থাকেন না। সকালে ঘরে ঢুকেই এই বীভৎস দৃশ্য দেখে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায়। তারপর সুস্থ হয়ে জানলাটা খুলে দেয় যাতে ভোরের বাতাস ঘরে ঢোকে। তারপর ছুটে বাইরে গিয়ে চাষাদের একটা ছোটো ছেলেকে দিয়ে ডাক্তারকে খবর পাঠায়। বোনের দেহ ওপরের বিছানায় শোয়ানো আছে, ইচ্ছে হলে দেখে আসতে পারি। ভাই দুজনকে পাগলাগারদে নিয়ে যাওয়ার সময় চারজন গাঁটাগোট্টা পালোয়ানকে হিমশিম খেতে হয়েছে। সে নিজে

এ-বাড়িতে আর একদণ্ডও থাকবে না–সেন্ট ইভসে আত্মীয়স্বজনের কাছে যাচ্ছে আজকেই বিকেলে।

ওপরে গিয়ে দেখলাম মিস ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিসের মৃতদেহ। সত্যিই পরমাসুন্দরী মেয়ে মাঝবয়সি হলেও রূপ যেন ফেটে পড়ছে। নিখুঁত মুখটি প্রকৃত সুন্দর–যদিও সে-মুখ নিঃসীম আতঙ্কে বিকৃত হয়ে রয়েছে। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যা দেখে প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে উড়ে গিয়েছে, সেই ভয়ের রেশ এখনও লেগে রয়েছে মুখের পরতে পরতে। শোবার ঘর থেকে নেমে এলাম বসবার ঘরে–যে-ঘরে আশ্চর্য এই ঘটনার সূত্রপাত এবং শেষ। ফায়ার প্লেসে শুধু কাঠকয়লা, টেবিলের ওপর শেষ পর্যন্ত পুড়ে যাওয়া চারটে মোমবাতি আর ছড়ানো তাস। চেয়ারগুলো কেবল সরিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালের গা ঘেঁষে–এ ছাড়া ঘরের কোনো জিনিস নাড়াচাড়া করা হয়নি। লঘু পায়ে অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল হোমস। চেয়ারগুলোকে টেনে এনে রাখল টেবিলের পাশে যেখানে থাকা উচিত, সেইখানে। প্রত্যেকটা চেয়ারে বসে দেখলে জানলা দিয়ে বাগানের কতখানি দেখা যায়। খুঁটিয়ে দেখলে মেঝে, কড়িকাঠ আর ফায়ারপ্লেস। কিন্তু ক্ষণেকের জন্যেও চোখ জ্বলে উঠতে দেখলাম না। ঠোঁট শক্ত হতে দেখলাম না–যে-লক্ষণ দেখলেই বুঝতাম নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে আলোর নিশানা পেয়েছে বন্ধু আমার।

একবার কেবল জিজ্ঞেস করল, বসন্তের সন্ধেবেলায় এইটুকু ঘরে আগুন জ্বালানোর কী এমন দরকার পড়ল বলতে পারেন?

মর্টিমার ট্রেগেনিস বললেন, বড্ড ঠান্ডা পড়েছিল, স্যাঁ স্যাঁ করছিল–তাই আমি আসবার পরেই হয়েছিল আগুনটা। এখন কী করবেন, মি. হোমস?

হাসল হোমস। আমার বাহু স্পর্শ করে বললে, ওহে ওয়াটসন, তামাক দিয়ে বিষোননা যে উচিত নয়, তা তোমার কাছে বহুবার শুনেছি। এখন কিন্তু সেই তামাক সেবনের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি চললাম তামাক খেতে–কেননা এখানে দেখবার মতো আর কিছু নেই। ভেবেচিন্তে যদি কিছু পাই তো আপনাকে জানাব, মিস্টার ট্রেগেনিস। পাদরি সাহেবকেও খবর দেব। আপাতত সুপ্রভাত।

পোলধু কটেজে ফিরে না-আসা পর্যন্ত আর একটি কথাও বলল না হোমস। গুটিসুটি মেরে বসে রইল আর্মচেয়ারে। তাম্রকূটের নীলচে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে রইল বললেই চলে চিন্তাকুটিল বিশুষ্ক মুখখানা। কালো ভুরু কুঁচকে কপালের রেখায় রেখায় অজস্ব চিন্তার ছাপ ফেলে শূন্য চোখ মেলে তাকিয়ে রইল কোন সুদূরের পানে। অবশেষে এক সময়ে পাইপ নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অট্টহেসে বললে, ভায়া, অযথা ভেবে সুবিধে হবে না। সমুদ্রের ফুরফুরে বাতাস, সূর্যদেবের মিষ্টি রোদ আর ধৈর্য–এই তিনটেই এখন বিশেষ দরকার। চলো, পাহাড়ে বেড়িয়ে বরং চকমকির পাথরের তির খোঁজা যাক। সমস্যার সূত্র খোঁজার চাইতে সেটা সহজ। কয়লা ছাড়া ইঞ্জিন চালাতে গেলে ইঞ্জিন যেমন বিগড়ে যায়, উপযুক্ত রসদ ছাড়া ব্রেন খাটাতে গেলেও ব্রেন তেমনি বিকল হয়। চলো, চলো, হাওয়া আর রোদ খেয়ে আসা যাক।

সমুদ্রের ধারে ধারে পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে, সমস্ত ব্যাপারটা এবার ঠান্ডা মাথায় তলিয়ে দেখা যাক। সবার আগে, এব্যাপারে যা কিছু জেনেছি–তা সে যত তুচ্ছই হোক না কেন–পর-পর সাজিয়ে ফেলা যাক–তাহলে নতুন কোনো ব্যাপার যখন জানব, ঠিকমতো জায়গায় বসিয়ে ঘটনা-পরম্পরা সম্পূর্ণ করা সহজ হবে। ভূত-প্রেত-পিশাচ শয়তানের হাত ঘটনায় নেই–প্রথমেই কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাক, কেমন? মানুষের ব্যাপারে পিশাচ নাক গলিয়েছে, এ-তত্ত্ব মানতে আমি রাজি নই–মন থেকে এ-সম্ভাবনা তাই একেবারেই বাদ দেওয়া গেল। বেশ, বেশ। তাহলে কী পাচ্ছি এখন? কোনো একটা মানবিক উৎপাতের দরুন মারাত্মক চোট পেয়েছে তিন ব্যক্তি একজন মারা গেছে, দুজন উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। উৎপাতটা জ্ঞাতসারে হতে পারে, অজ্ঞাতসারেও হতে পারে। এই হল গিয়ে শক্ত জমি চিন্তার উপযুক্ত ক্ষেত্র–এর ওপর সিদ্ধান্তর ইমারত তৈরি করা যাক। ভয়াবহ এই কাণ্ডটা ঘটল কখন? মি. ট্রেগেনিসের কথা মেনে নিলে, তিনি ঘর ছেড়ে চলে আসবার ঠিক পরেই। খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ধরে নিতে পারি, উনি চলে আসার মিনিট কয়েকের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছে। কেননা, টেবিলের তাস টেবিলেই পড়ে–জড়ো করা হয়নি। শোয়ার সময় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও টেবিল ছেড়ে কেউ নড়েনি–চেয়ার পর্যন্ত সরায়নি। তাই ফের বলছি–উনি চলে আসতে-না-আসতেই রহস্যজনক সেই আতঙ্ক এসে উপস্থিত হয়েছে জানলার বাইরে—এবং তা ঘটেছে রাত এগারোটার মধ্যেই পরে নয়।

আচ্ছা এরপর আমাদের করণীয় হল ঘর ছেড়ে চলে আসবার পর মি. ট্রেগেনিসের গতিবিধি তার জবানবন্দির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া। সত্যিই উনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে। কেননা, ঝারি উলটে দেওয়ার বদখত কৌশলটা তোমার অজানা নয়। ফলে, ভদ্রলোকের পায়ের

স্পষ্ট ছাপ পেলাম ভিজে মাটির ওপর। গতদিনও বৃষ্টি হয়েছিল, মাটি ভিজে ছিল। মি. ট্রেগেন্নিস এবং আরও অনেকের পায়ের ছাপ ভিজে মাটিতে ছিল। তার মধ্য থেকে মি. ট্রেগেন্নিসের পায়ের ছাপ খুঁজে নেওয়া খুব একটা কষ্টকর হল না। ভদ্রলোকের গতিবিধি লক্ষ করে নিশ্চিন্ত হলাম দেখলাম, উনি বাড়ি থেকে বেরিয়েই খুব তাড়াতাড়ি পাদরিমশায়ের বাড়ির দিকে–মানে নিজের বাড়ির দিকে গেছেন।

সন্দেহ-চক্র থেকে তাহলে বাদ গেলেন মি. ট্রেগেন্নিস। তাস খেলা জন্মের মতো পণ্ড হয়ে গেল কার জন্যে, এখনও কিন্তু তা জানা যাচ্ছে না। কার আবির্ভাবে এত আঁতকে উঠল তিন-তিনটে সুস্থ মানুষ–তাও এখনও রহস্য তিমিরে অদৃশ্য। আতঙ্কটা এল কোন পথে কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। মিসেস পোর্টারকে বাদ দেওয়া যায়। একেবারেই গোবেচারা মেয়েছেলে। এমনও হতে পারে, বাগানের জানলায় গুড়ি মেরে এসে দাঁড়িয়েছিল কেউ এমন বিকট কাণ্ড করেছে যে দেখেই আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গিয়েছে তিনজনের। ঠিক এই ধরনের সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন একজনই–মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিস! বাগানের অন্ধকারে সাঁৎ করে কী যেন একটা মিলিয়ে গিয়েছিল–দেখেছেন উনি, দেখেছে ওঁর ভাই। খুবই আশ্চর্য ঘটনা। কেননা গতরাতে আকাশ মেঘলা থেকেছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েছে, ঘুটঘুটে অন্ধকার বিরাজ করেছে। কাজেই এদেরকে ভয় দেখিয়ে পাগল করবার মতলব নিয়ে কেউ এসে থাকলে তাকে শার্সির কাছে মুখ চেপে ধরতেই হবে–নইলে অন্ধকার দেখাই যাবে না। জানলার নীচেই একটা ফুট তিনেক চওড়া ফুলের ঝোপ আছে কিন্তু নরম মাটিতে কই কারো পায়ের ছাপ তো পড়েনি। সেই কারণেই ভেবে পাচ্ছি না বাইরে থেকে এসে কারো পক্ষে মুখ না-দেখিয়ে ভয় দেখানো সম্ভব হয় কী করে–সবচেয়ে বড়ো কথা এত কাঠখড় পুড়িয়ে এত ঝাট করে গোবেচারা তিনটে

মানুষকে ভয় দেখানোর কারণটাই-বা কী, তাও তত মাথায় আসছে না। ওয়াটসন, বুঝেছ তো অসুবিধেটা হচ্ছে কোথায়?

হাড়ে হাড়ে বুঝছি, বললাম দৃঢ়স্বরে।

তা সত্ত্বেও জেনো আরও একটু সূত্র-টু পেলে এর মধ্যেও আলোর নিশানা দেখা যাবে। তুমি তো জান, অতীতে এমনি অনেক ঝাঁপসা কেস নিয়ে প্রথম-প্রথম নাকানিচোবানি খেয়েছি–শেষকালে কিন্তু সমস্যার হিমালয়ও একলাফে পেরিয়ে গিয়েছি। কাজেই আমার বুদ্ধি যদি নাও তো, যতক্ষণ ঠিক তত্ত্ব হাতে না-আসছে, ততক্ষণ এ-কেস শিকেয় তুলে রেখে চলো গুহাবাসী মানবের অন্বেষণে সময়টা ব্যয় করা যাক।

যখন খুশি মনটাকে বিষয়ান্তরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল শার্লক হোমসের এ নিয়ে এর আগেও অনেক কথা বলেছি আমি। কিন্তু সেদিন কনওয়ালের সেই বাসন্তী প্রভাতে যেভাবে ঝাড়া দু-ঘণ্টা কেল্ট, তিরের ফলা আর খোলামকুচি নিয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে গেল ও, তেমনটি কখনো দেখিনি। হালকাভাবে কথা বলার ধরন দেখে মনেই হল না যে অত্যন্ত নারকীয় একটা কেস একটু আগেই কুরে কুরে খেয়েছে ওর মস্তিষ্ককে সমাধান না-পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিকেল বেলা কটেজে ফিরে দেখলাম একজন দর্শনার্থী বসে রয়েছেন আমাদের ফেরার পথ চেয়ে—ইনিই নিমেষ মধ্যে আমাদের ফিরিয়ে আনলেন ভয়াবহ কেসের আলোচনায়। এক নজরেই দুজনেই চিনলাম ভদ্রলোককে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দরকার হল না। বিরাট চেহারা, এবড়োখেবড়ো সুগভীর বলিরেখা আঁকা মুখ, জ্বলজ্বলে ভয়ানক চোখ আর গরুড় পাখির চঞ্চুর মতো

টিকোলো নাক, প্রায়-কড়িকাঠ-ছোঁয়া তেল চটচটে চুল আর চিরন্তর চুরুটের দৌলতে ঠোঁটের কাছে নিকোটিন রাঙানো সোনালি-ঝালরওলা অমন আশ্চর্য সাদাটে দাড়ি গোটা লন্ডন আর আফ্রিকায় শুধু একজনেরই আছে–প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের অধিকারী বিখ্যাত সিংহশিকারী এবং অজানার অভিযাত্রী–ডক্টর লিয়ন স্টার্নডেল।

উনি যে এ-জেলায় আছেন, সে-খবর পেয়েছিলাম। জলার রাস্তায় বার কয়েক ওঁর তালঢ্যাঙা চেহারাও দেখেছিলাম। উনি আমাদের কাছে ঘেঁষেননি, আমরাও ওঁকে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছি উনি একলা থাকতে ভালোবাসেন বলে। এই কারণেই পর্যটনের ফাঁকে ফাঁকে বেশির ভাগ সময় কাটান বুচান অ্যারায়েন্সের নির্জন জঙ্গলের গভীরে একটা ছোট্ট বাংলো বাড়িতে। এ-অঞ্চলে এলে বই আর ম্যাপ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকেন নিজের মধ্যে নিজের কাজকর্ম নিজেই করেন, কারো সাহায্য নেন না–কারো সঙ্গে থাকেন না কোনো প্রতিবেশীর সঙ্গে মেশেন না–তাদের ব্যাপারে নাক গলান না। তাই অবাক হয়ে গেলাম ব্যগ্রভাবে যখন হোমসের কাছে জানতে চাইলেন, রহস্যজনক এই উপসংহারে অগ্রগতি কিছু হয়েছে কি না। বললেন, গাঁয়ের পুলিশগুলো এক্কেবারে আকাট আপনার অভিজ্ঞতা তো কম নয়–নিশ্চয় হালে পানি পাবেন। এ-ব্যাপারে আমার এত আগ্রহ কেন জানেন? আমার মা কর্নিশ–সেইদিক দিয়ে ট্রেগেন্নিসরা আমার মাসতুতো ভাইবোন। এদের আমি ভালো করেই চিনি। তাই মন আমার ভেঙে গেছে ওদের এই শোচনীয় পরিণতিতে। প্লিমাউথ পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম আজ সকালেই খবরটা পেয়ে, এলাম যদি আপনাদের তদন্তে সাহায্য করতে পারি–এই আশায়।

ভুরু তুলে হোমস বললে, জাহাজ ছেড়ে গেল তো?

পরের জাহাজে যাব।

তাই নাকি! একেই বলে বন্ধুত্ব।

আত্মীয়–আগেই বলেছি।

তা বলেছেন–মায়ের তরফে মাসতুতো ভাইবোন। মালপত্র কোথায়? জাহাজে নাকি?

কিছু কিছু–বেশিরভাগই হোটেলে।

কিন্তু খবরটা নিশ্চয় প্লিমাউথ খবরের কাগজে বেরোয়নি?

আজ্ঞে না। টেলিগ্রামে খবর পেয়েছি।

কে পাঠিয়েছে জানতে পারি?

অভিযাত্রীর বৃহৎ কৃশ বদনের ওপর দিয়ে একটা ছায়া ভেসে গেল যেন।

আপনার কৌতূহলটা একটু বেশি রকমের, মি. হোমস।

আমার ব্যাবসাই যে তাই।

রুক্ষ ভাবটা অতিকষ্টে সামলে নিলেন ডক্টর স্টার্নডেল।

মি. রাউন্ড হে পাঠিয়েছেন টেলিগ্রাম।

ধন্যবাদ। আপনার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, কেসটা সম্পর্কে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারিনি। তবে শিগগিরই করব। তার আগে কিন্তু বলাটা সমীচীন হবে না।

আপনার সন্দেহ কোন খাতে বইছে বলতে আপত্তি আছে?

জবাবটা জানা থাকলে তো বলব।

খামোখা খানিকটা সময় নষ্ট করলাম দেখছি। যাক, আর কথা বাড়াতে চাই না, অসভ্যের মতো হনহন করে বেরিয়ে গেলেন বিখ্যাত সিংহ শিকারি। পাঁচ মিনিটও গেল না, পেছন নিল শার্লক হোমস। ফিরল সন্ধেবেলায়! উদ্ভ্রান্ত মুখচ্ছবি আর শ্লথ পদক্ষেপ দেখেই বুঝলাম পণ্ডশ্রম হয়েছে–সুবিধে করে উঠতে পারেনি। একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে ছিল। চোখ বুলিয়ে নিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিলে অগ্নিকুণ্ডে।

বললে, প্লিমাউথ হোটেলের টেলিগ্রাম। মি. রাউন্ড হের কাছে ঠিকানা নিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলাম ডক্টর স্টার্নডেল যা বলে গেলেন, তা সত্যি কি না। দেখা

যাচ্ছে, সব সত্যি। সত্যিই উনি জাহাজে কিছু মাল পাঠিয়েছেন–একরাত হোটেলে কাটিয়েছেন, তারপর ছুটে এসেছেন এখনকার তদন্ত দেখতে। কী বুঝলে ওয়াটসন?

বুঝলাম যে এ-ব্যাপারে ওঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে।

খুবই গভীর, বন্ধু খুব গভীর। ওঁর এই সুগভীর আগ্রহের মধ্যেই কিন্তু একটা সুতো রয়েছে–খেইটা ধরতে পারছি না। ঠিকমতো নাগাল পেয়ে গেলেই জানবে জট ছড়িয়ে ফেলা যাবে। অত মুষড়ে পোড় না, ওয়াটসন। ফুর্তি করো। সব সূত্র এখনও হাতে আসেনি–এলে আর অসুবিধে থাকবে না বলে রাখছি।

হোমসের কথার তাৎপর্য যে কতখানি এবং কী ধরনের পৈশাচিক আর অদ্ভুত কর্মকাণ্ডের ফলে তদন্ত নতুন দিকে মোড় নিতে চলেছে, তখন কিন্তু তা একদম বুঝিনি। সকাল বেলা জানলায় দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছি, এমন সময়ে দেখলাম একটা এক্কাগাড়ি ঝড়ের মতো আসছে রাস্তা দিয়ে। গাড়ি দাঁড়াল আমাদেরই কটেজের সামনে, লাফিয়ে নামলেন পাদরি মশায় এবং নক্ষত্রবেগে দৌড়ে এলেন ভেতর দিকে। জামাকাপড় পরে তৈরি হয়েছিল হোমস দুজনেই দৌড়ে গেলাম ওঁর দিকে।

সাংঘাতিক উত্তেজিত হয়েছিলেন পাদরি। ভালো করে কথাও বলতে পারছিলেন না। হাঁসফঁস করতে করতে বললেন :

অপদেবতা! অপদেবতায় আমাদের ভিটেমাটি তুলে ছাড়বে মি. হোমস। কারুর নিস্তার নেই–কেউ বাঁচবে না। সবাই মরবে এ-অঞ্চলে।

ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে মুখে, আতঙ্ক বিস্ফারিত চোখে প্রায় নাচতে নাচতে চেঁচাতে লাগলেন ভদ্রলোক। চোখ-মুখের ওইরকম অবস্থা না-দেখলে নির্ঘাত হেসে ফেলতাম : অবশেষে একটু ধাতস্থ হয়ে ব্যক্ত করলেন ভয়াবহ সংবাদটা।

মি. ট্রেগেন্নিস কাল রাতে মারা গেছেন–তিন ভাইবোনের চোখে-মুখে যেসব লক্ষণ দেখা গেছে, তার সমস্ত ওঁর মুখেও ফুটে উঠেছে।

সঙ্গেসঙ্গে যেন এনার্জির বিস্ফোরণ ঘটল শার্লক হোমসের সর্ব অঙ্গে, ছিটকে গেল জ্যামুক্ত তিরের মতো।

আপনার এক্কায় আমাদের জায়গা হবে তো?

হবে।

ওয়াটসন, ব্রেকফার্স্ট পরে খাব। মি. রাউন্ড হে, চলে আসুন, আর দেরি করা যায় না তাড়াতাড়ি চলুন। কে আবার কোথায় হাত দিয়ে ফেলবে, তার আগেই পৌঁছাতে হবে।

পাদরি সাহেবের বাড়িতে ওপর নীচে দুটো ঘর নিয়ে থাকতেন মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিস। নীচে বসবার ঘর, ঠিক ওপরে শোবার ঘর। জানলার ধার পর্যন্ত বাগান। পুলিশ বা ডাক্তার এসে অকুস্থল লাটঘাট করার আগেই পৌঁছে গেলাম আমরা। গিয়ে যা দেখলাম, হুবহু তার বর্ণনা দিচ্ছি। দৃশ্যটা ইহজীবনে তোলবার নয়।

ঘরের আবহাওয়া এমনই ভয়াবহ আর গুমোট যে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে মনটা বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। চাকরটা ঘরে ঢুকেই জানলা খুলে দিয়েছিল তাই রক্ষে, নইলে আরও অসহ্য ঠেকত। এর কারণ বোধ হয় একটা তেলের বাতি–ঘরের ঠিক মাঝখানে। টেবিলের ওপর সেটা তখনও দপদপ করে ধোঁয়া ছাড়ছে। পাশের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে মি. মর্টিমার ট্রেগেন্নিস। ছুঁচালো থুতনি ঠেলে এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে চশমা জোড়া ঠেলে তোলা কপালের ওপর শীর্ণ মুখটা জানলার দিকে ফেরানো। মরা বোনের মুখে যে বিকট চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠতে দেখেছিলাম–অবিকল সেই আতঙ্ক এঁরও মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। হাত-পা মুচড়ে রয়েছে অস্বাভাবিকভাবে প্রচণ্ড একটা আতঙ্ক মুহূর্তের আক্রমণে বেঁকিয়ে আড়ষ্ট করে দিয়ে গিয়েছে হাতের দশ আঙুল। বেশবাস সম্পূর্ণ–কিন্তু তা তাড়াহুড়ো করে পরেছেন। আগেই শুনেছিলাম, রাতে শুয়েছেন–বিছানায় শোয়ার চিহ্ন আছে। খুব ভোরে ঘটেছে এই মর্মান্তিক ঘটনা।

এহেন মৃত্যুমহলে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে হোমসের সর্বাঙ্গে যে কী ধরনের আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেল, তা যে না দেখেছে সে কল্পনাই করতে পারবে না যে কী নিদারুণ বিদ্যুৎগতি সুপ্ত থাকে। ওর বাইরের শ্লথ-প্রকৃতির অন্তরালে। মুহূর্তের মতো চনমনে হল যেন প্রতিটি অণুপরমাণু সজাগ, সতর্ক, হুঁশিয়ার। উজ্জ্বল হল দুই চোখ, শক্ত হল পেশি। যেন

ব্যগ্র তৎপরতার নব বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হল সারাদেহে। জানলা দিয়ে বাগানে বেরিয়ে গিয়ে ফের ফিরে এল ঘরে। বেশ বার কয়েক ঘরময় চরকিপাক দিয়ে ছুটে গেল ওপরের শোবার ঘরে।

দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল শয়নকক্ষের ওপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে এক ধাক্কায় খুলে দিলে জানলা। সঙ্গেসঙ্গে বুঝলাম মনের মতো কিছু একটা চোখে পড়েছে। কেননা, পাল্লা খুলে যেতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে ঝুঁকে পড়ল নীচে। দুমদুম করে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, ছিটকে বেরিয়ে গেল জানলা দিয়ে, সটান উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাগানের মাটিতে। আবার দাঁড়িয়ে উঠল একলাফে, ফিরে এল ঘরে এবং সব কিছুই এমন একটা প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে করে চলল যেন শিকারের ঠিক পেছনটিতে এসে পড়েছে শিকারি কুকুর। অতি মামুলি তেলের বাতিটাকে অসীম মনোোযোগ নিয়ে দেখল। খোলের মাপ নিল। চিমনির ওপর যে অভ্র-আচ্ছাদন আছে, আতশকাচের মধ্যে দিয়ে সেটা অনেকক্ষণ খুব খুঁটিয়ে দেখল, তারপর ওপর থেকে খানিকটা ছাই চেঁছে নিয়ে রাখল খামের ভেতর। সবশেষে ডাক্তার আর পুলিশ আসতেই মি. রাউন্ড হেঁকে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

বললে, তদন্ত সার্থক হয়েছে। পুলিশের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করার ইচ্ছে আমার নেই। তবে আপনি দয়া করে বলে দেবেন, যেন ওঁরা শোবার ঘরের জানলা আর বসবার ঘরের তেলের বাতি–এই দুটো জিনিসের ওপর বেশি নজর দেন। প্রত্যেকটাই তদন্তে সাহায্য করবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কাজে লাগবে। এর বেশি খবর যদি চায় পুলিশ,

আমার কটেজে গিয়ে যেন দেখা করে। ওয়াটসন, চলো এবার অন্য ব্যাপারে মন দেওয়া যাক।

পুলিশি ব্যাপারে শখের গোয়েন্দার নাক গলানো বোধ হয় মনঃপূত হয়নি পুলিশ মহলের, অথবা হয়তো আশাব্যঞ্জক কোনো তদন্তসূত্র পেয়ে সেইদিকেই ছুটেছিল পুলিশ–কারণ যাই হোক না কেন, পরের দুটো দিন কেউ চৌকাঠ মাড়াল না আমাদের। এই দু-দিনের বেশির ভাগ সময় কটেজেই রইল হোমস, পাইপ টানল সমানে আর বিভোর হয়ে রইল দিবাস্বপ্নে। মাঝে মাঝে একাই বেরিয়ে যেত বেড়াতে ফিরত বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও বলত না কোথায় গিয়ে কী করে এল। এর মধ্যে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে অবশ্য দেখিয়ে দিলে তদন্তের লাইনটা কী। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের মৃত্যুর রাতে তার ঘরে যে তেলের বাতি দেখে এসেছি, হুবহু সেই ডিজাইনের একটা তেলের বাতি কিনে আনল বাজার থেকে। একই তেল দিয়ে ভরল বাতিটা এবং... জ্বালিয়ে রেখে দেখল তেল ফুরোয় কতক্ষণে–হিসেবটা লিখে রাখল কাগজে। আরও একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিল অত্যন্ত অপ্রীতিকর এক্সপেরিমেন্ট–জীবনে ভুলতে পারব কি না সন্দেহ।

একদিন বিকেলের দিকে আমাকে বলল, ওয়াটসন, নিশ্চয় লক্ষ করেছ–বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন রিপোর্টের মধ্যে একটা বিষয় কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই দেখা গেছে। প্রথমেই ঘরে যে ঢুকেছে, অদ্ভুতভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে ঘরের আবহাওয়া। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের বর্ণনা মনে করে দেখ। ডাক্তার ঘরে ঢুকেই অজ্ঞানের মতো চেয়ারে পড়ে যান। ভুলে গেছিলে? যাচ্চলে! কিন্তু আমার মনে আছে। হাউসকিপার মিসেস পোর্টারও ঘরে ঢুকে অজ্ঞান হয়ে যায়–পরে জানলা খুলে দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের

ঘরে আমরা ঢুকে টের পেয়েছিলাম একটা দম আটকানো আবহাওয়া। জানলা যদিও খোলা ছিল, তবুও ঘরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে সেই দম আটকানো গুমোট আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা চট করে ভুলতে পারবে বলে মনে হয় না! খোঁজ নিয়ে জেনেছি যে-চাকরটা প্রথমে ঘরে জানলা খুলেছিল, সে বেচারাও এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারছে না। ওয়াটসন, বলো দিকি প্রতিক্ষেত্রে এইভাবে কাহিল হয়ে পড়ার মানেটা কী? কীসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রয়েছে এর মধ্যে? বিষাক্ত আবহাওয়া, তাই নয় কি? আরও আছে–প্রতি ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে কিছু-না-কিছু জ্বলছে। প্রথম ক্ষেত্রে চুল্লির আগুন; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, তেলের বাতি। চুল্লির আগুন না হয় দরকার হয়েছিল কিন্তু তেলের বাতিটা ইচ্ছে করে জ্বালানো হয়েছিল–তেল পুড়তে কতটা সময় লাগে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখেছি, দিনের আলো ফোটবার পরেও জ্বালানো হয়েছিল বাতিটা। এই তিনটে জিনিসের মধ্যে নিশ্চয় একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। আগুন, দম-আটকানো আবহাওয়া, আর সবশেষে উন্মত্ততা অথবা মৃত্যু। পরিষ্কার। হল তো?

মনে তো হচ্ছে।

কাজ শুরু করার মতো একটা অনুমিতি এইভাবে খাড়া করে নিয়ে এগোনো যাক। প্রত্যেকবার ঘরের মধ্যে কিছু একটা পোড়ানো হয়েছে। ফলে এমন একটা নাম-না-জানা বিষময় আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যার প্রভাব থেকে কেউই রেহাই পায়নি। বেশ, বেশ। প্রথম ক্ষেত্রে, ট্রেগেনিস ভাইবোনের বেলায়–জিনিসটা রাখা হয়েছিল চুল্লির আগুনে। জানলা বন্ধ ছিল যদিও, কিন্তু চুল্লির ধোঁয়া বেরিয়ে গিয়েছে চিমনি দিয়ে। বিষটার কাজও হয়েছে দেরিতে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, মিস্টার মর্টিমার ট্রেগেনিসের ঘরে, তেলের বাতির

মধ্যে জিনিসটা পোড়ানো হয়েছে বলে ধোঁয়া বেরিয়ে যাওয়ার তেমন সুযোগ পায়নি; তাই বিষের ক্রিয়া হয়েছে খুবই তাড়াতাড়ি, প্রভাবটা হয়েছে প্রচণ্ড। সেইকারণেই প্রথম ক্ষেত্রে একটি মেয়ে বিষের সংস্পর্শে আসতে-না-আসতেই মারা গিয়েছে মেয়েদের দেহযন্ত্র পুরুষদের চাইতে অনেক বেশি অনুভূতি সচেতন বলেই কাজটা হয়েছে দ্রুত কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর বদলে এসেছে সাময়িক অথবা স্থায়ী উন্মত্ততা বিষটার প্রথম কাজ বোধ হয় তাই পাগল করিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ হয়েছে বিষক্রিয়া। এই দুই ঘটনা থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অন্তরালে কাজ করেছে এমন একটা বিষ যা পুড়ে গিয়ে ধোঁয়ার আকারে প্রথমে নিদারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে পাগল করে দেয় মানুষকে–তারপরে আনে মৃত্যু।

যুক্তির এই ধারাবাহিকতা মগজের মধ্যে নিয়ে দৌড়ে গেলাম মর্টিমার ট্রেগেনিসের ঘরে–আঁতিপাঁতি করে খুঁজলাম মারণদ্রব্যটার অবশিষ্টাংশ। তেলের বাতির অভ্রআচ্ছাদনেই এ-জিনিস লেগে থাকার কথা–যেখানে লাগিয়ে রাখলে নিজে পুড়ে ধোঁয়া হয়ে যাবে। সত্যিই দেখলাম স্তরে স্তরে সাজানো কিছু ছাই জমে রয়েছে ধোঁয়া আটকানোর আচ্ছাদনের মধ্যে কিনারা ঘিরে খানিকটা বাদামি পাউডার–তখনও পোড়েনি। তুমি তো দেখলে অর্ধেক পাউডার তুলে রাখলাম খামের মধ্যে।

অর্ধেক কেন?

ভায়া ওয়াটসন, সরকারি পুলিশবাহিনির অন্তরায় হওয়া আমার উচিত নয়। প্রমাণ-টমান যাই পাই না কেন, ওদের জন্যে তা রেখে আসি নিজে সরাই না। অভ্র আচ্ছাদনের

কীসের গুঁড়ো এখনও লেগে রয়েছে, ওদের বুদ্ধি থাকে, সংগ্রহ করুক। ওয়াটসন, এবার শুরু হবে আমাদের এক্সপেরিমেন্ট। জানলাটা খোলা থাক–সমাজে আমাদের এখনও দরকার আছে–অকালমৃত্যু ঘটাতে চাই না। তুমি বসবে খোলা জানলার ধারে আর্মচেয়ারে নিজের বুদ্ধি খাঁটিয়ে যদি বোঝো এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করার সময়ে এসেছে হস্তক্ষেপ করবে। কী বললে? এক্সপেরিমেন্টে তুমিও অংশ নেবে? আরে আরে ভায়া, তোমাকে আমি চিনি–ঠিক এমনটাই আশা করেছিলাম। ঠিক আছে ভায়া, ঠিক আছে। টেবিলের দু-দিকে পাতলাম দুজনের চেয়ার বিষ থেকে সমান দূরত্বে রইলাম দুজনে–বসব মুখোমুখি। দরজা খোলা থাকুক। দুজনেই কিন্তু বিষের খপ্পরে সমান ভাবে পড়ব, সমান ভাবে টের পাব বিষের ধোঁয়া কাজ করছে কীভাবে এবং সমানভাবে সুযোগ পাব বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ার আগেই এক্সপেরিমেন্ট ভন্ডুল করে দেওয়ার। পরিষ্কার তো? বেশ, বেশ। খাম থেকে বিষের গুঁড়ো বার করে রাখলাম জ্বলন্ত বাতির আচ্ছাদনে। এইবার! ওয়াটসন, বসে পড়ো, ভায়া বসে পড়ো। দেখো, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

বেশি দেরি হল না। ভয়ংকররা এল অত্যন্ত দ্রুত পদক্ষেপে অত্যন্ত অদ্ভুত পদসঞ্চারে। চেয়ারে চেপে বসবার আগেই নাসিকারন্ধ্রে ভেসে এল ঘন মৃগনাভির একটা কটু গুড়-পাক-দেওয়া গন্ধ। উগ্র বিচিত্র সেই গন্ধের প্রথম ঝাঁপটাতেই আমি আর আমার মধ্যে রইলাম না–আমার মস্তিষ্ক, আমার কল্পনাশক্তি যেন বেহাত হয়ে গেল অন্যের হাতে কর্তৃত্ব হারালাম আমারই মগজ আর কল্পনার ওপর। চোখের সামনে দূরন্ত ঘূর্ণিপাকের মতো ঘুরপাক খেতে লাগল নীরন্ধ্র তমিস্রাময় কালো ছায়া। শিউরে উঠল আমার অন্তরাত্মা। অকস্মাৎ একটা নামহীন আতঙ্ক সঞ্চারিত হয়ে গেল আমার অণুতে পরমাণুতে মন বললে, কুণ্ডলী পাকানো ওই বিকট মেঘপুঞ্জের মধ্যে যেন পুঞ্জীভূত হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের

যত কিছু রক্ত-জল-করা বিভীষিকা। ওরা যেন ওত পেতে রয়েছে পুরু ছায়ার মধ্যে, সময় গুনছে একযোগে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। বর্ণনাতীত সেই লোমহর্ষক অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে সিটিয়ে তুলল আমার সর্ব অঙ্গ। দুনিয়ার সমস্ত দানবীয় আর ভয়াল শয়তানিকে প্রত্যক্ষ করার ভয়ে আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। মনে হল যেন নিকষ মেঘের মতো ঘুরপাক খাওয়া কৃষ্ণ ছায়ার মধ্যে সরে সরে যাচ্ছে অজস্র আবছা আকৃতি ভাসছে, কাছে আসছে, আবার দূরে সরে যাচ্ছে। তারা কেউ স্পষ্ট নয় কিন্তু তারা হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে দেওয়ার মতো ভয়াবহ। প্রতিমুহূর্তেই মনে হল এই বুঝি সিঁড়ির ওপর শুনব ভয়ংকরের পদধ্বনি–যার ছায়া দেখামাত্র নিঃসীম আতঙ্কে অন্তরাত্মা বিদীর্ণ হয়ে যাবে আমার। অথচ সে কে, কীরকম তাকে দেখতে কিছুই জানি না–বুঝতে পারছি না। কিন্তু এই না-বোঝা আতঙ্কের খপ্পরে অসাড় হয়ে এল আমার জ্ঞানবুদ্ধি চেতনা–ক্ষণে ক্ষণে মনে হল অবর্ণনীয় অবিশ্বাস্য অস্বাভাবিক এমন কিছু একটা ঘটতে চলেছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যার তুল্য নজির আর দ্বিতীয় নেই। আমি অনুভব করলাম কল্পনাতীত আতঙ্কে। আমার চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে, গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, কোটর থেকে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে, জিভটা চামড়ার মতো শক্ত হয়ে বাইরে ঝুলে পড়েছে। এমন একটা তুমুল হট্টগোল, একটা বিকট বিপর্যয় লেগে গেল মস্তিষ্কের কোষে কোষে যে মনে হল যেকোনো মুহূর্তে ছিঁড়েখুঁড়ে দলা পাকিয়ে যাবে মগজের সবকটা স্নায়ু। ভীষণ ভয়ে আর্তগলায় বুকফাটা হাহাকার করতে গেলাম–কিন্তু গলা দিয়ে বীভৎস কর্কশ যে-আওয়াজটা বেরোল–সেটা বুঝি আমার নয়–যেন কাকা করে কেঁদে উঠল একটা দাঁড়কাক। অতিবড়ো দুঃস্বপ্নেও এহেন ডাক যে আমার গলা দিয়ে কখনো বেরোতে পারে ভাবতেও পারিনি। গা হাত পা হিম হয়ে গেল স্বকর্ণে সেই বিকৃত ধ্বনি শুনে। আতঙ্কের এই সর্বনেশে নাগপাশকে ঝেড়ে ফেলে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্যেই

প্রাণপণে, দেহের আর মনের শেষ শক্তিবিন্দু সঞ্চয় করে, সীমাহীন নৈরাশ্যের পুঞ্জীভূত মেঘের ফাঁক দিয়ে তাকালাম হোমসের পানে। অবশ অক্ষিপটে পলকের জন্যে ভেসে উঠল একটা সাদা কঠিন আতঙ্ক বিকৃত, দুমড়োনো-মুচড়োনো ভয়াল মুখচ্ছবি। ঠিক এই দৃশ্য, এই আতঙ্ক দেখেছি এর আগে দুটি মৃতদেহের মুখে। তৃতীয়বার দেখলাম যার মুখে সে আমার প্রাণাধিক বন্ধু শার্লক হোমস। হোমস! হোমস! হোমস! হোমসের মুখের এই ভয়ানক চেহারাই চাবুক হেনে জড়তা কাটিয়ে দিল আমার। মুহূর্তের মধ্যে আমার চেতনা আসন্নমৃত্যু আর উন্মত্ততার নরককুণ্ড থেকে ঠিকরে বেরিয়ে এল বাইরে ফিরে এল আমার শক্তি আর মস্তিষ্কের সুস্থতা। চেয়ার থেকে লাফিয়ে গেলাম। হোমসকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে টলতে টলতে কাত হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়তে পড়তেও কোনোমতে ছিটকে এলাম দরজা দিয়ে বাইরে এবং আছড়ে পড়লাম ঘাস ছাওয়া জমির ওপর। অবশ্য দেহে প্রায় বিলুপ্ত চেতনা নিয়ে পাশাপাশি পড়ে রইলাম দুই বন্ধু। আঙুল পর্যন্ত নাড়াতে পারলাম না–শুধু টের পেলাম চারদিকে যেন নেচে খেলা করছে প্রাণদায়ী সূর্যরশ্মি আতঙ্কে ঠাসা নারকীয় মেঘ ছিন্নভিন্ন করে উজ্জ্বল হিতকর তপন কিরণ এগিয়ে আসছে যেন আত্মার কাছে শয়তানের মুঠি শিথিল হয়ে যাচ্ছে অরুণ দেবের উষ্ণ স্পর্শে—কুয়াশার গাঢ় অবগুণ্ঠন যেভাবে দিকদিগন্ত থেকে একটু একটু করে উঠে গিয়ে মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইভাবে জমাট বাঁধা বর্ণনাতীত সেই আতঙ্ক মেঘও ওপরে উঠে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল–মনের ভেতর থেকেও নিকষ মেঘের তিরোধান ঘটল। মন আর দেহের শক্তি পুরোপুরি ফিরে না-আসা পর্যন্ত ঘামে ভেজা কপাল মুছতে লাগলাম ঘাসে বসে ভয়ার্ত চোখে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আসন্ন মৃত্যুর অপস্রিয়মাণ লক্ষণ দেখে বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম এইমাত্র কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এলাম দুজনে।

অবশেষে ভাঙা ভাঙা গলায় হোমস বললে, ভায়া, আমাকে ক্ষমা করো। এ-এক্সপেরিমেন্টে বন্ধুকে টেনে আনা আমার উচিত হয়নি।

হোমসকে এভাবে বিচলিত হতে কখনো দেখিনি। এভাবে ওর ভেতরের চেহারা কখনো চোখে পড়েনি। তাই আবেগে কেঁপে উঠল আমার গলা।

বললাম, হোমস, তোমার কাজে লাগতে পেরেছি, এইটাই তো আমার সবচেয়ে বড়ো আনন্দ।

মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এল ওর চিরপরিচিত মুখের চেহারা আশেপাশে যারা থাকে। তারাই চেনে হোমসের বাইরের এই খোলস। কিছুটা কৌতুক, কিছুটা ছিদ্রান্বেষী মুখচ্ছবি দিয়ে ঢেকে দেয় কোমল অন্তর-প্রকৃতি। বললে, ভায়া ওয়াটসন, নতুন করে আমাদের পাগল বানানোর আর দরকার ছিল না। পাগল হয়েছিলাম বলেই এ-জাতীয় এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়েছিলাম। বিষের ক্রিয়া যে এত আচমকা আর এত প্রচণ্ড হবে–কল্পনাও করিনি। ঝড়ের মতো কটেজে ঢুকে লম্ফটা ধরে নাকের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে বেরিয়ে এল হোমস ছুঁড়ে ফেলে দিলে কাঁটা ঝোঁপের মধ্যে। ঘরটা একটু পরিষ্কার থোক। ওয়াটসন, আগের ট্র্যাজেড়িগুলো ঘটেছে কীভাবে, এখন নিশ্চয় বুঝেছ?

এক্কেবারে।

উদ্দেশ্য কিন্তু এখনও অস্পষ্ট। এসো, এই কুঞ্জবনে বসে আলোচনা করা যাক। বিশ্রী গ্যাসটা যেন এখনও গলায় আটকে রয়েছে। সবকটা প্রমাণ কিন্তু মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকেই ফাঁসিয়ে দিচ্ছে। প্রথম ট্র্যাজেডিতে তিনি খুন করেছেন, দ্বিতীয় ট্র্যাজেডিতে তিনি নিজে খুন হয়েছেন। প্রথমেই একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে হবে। ট্রেগেন্নিস পরিবারে একটা পুরোনো ঝগড়া আছে। পরে অবশ্য তা মিটে গেছে। ঝগড়াটা কতখানি তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল–পরে যে সত্যি সত্যিই তা অন্তর থেকে মিটে যায়নি তার বিশদ খবর কোনোদিনই আর জানা যাবে না। মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের শেয়ালের মতো ছুঁচোলো মুখ, চশমা ঢাকা পুঁতির মতো ছোটো ধূর্ত চোখ দেখলে মনে হয় না অন্তর থেকে ক্ষমা করার মানুষ উনি। বাগানে কী যেন একটা ঘুরে বেড়াচ্ছে এই খবরটা শুনে সাময়িকভাবে আমাদের মন অলীক একটা স্তিত্বের দিকে ছুটে গিয়েছিল–খবরটা কিন্তু ওই ভদ্রলোকেরই দেওয়া। গোড়া থেকেই আমাদের ভুল পথে চালিয়ে দেওয়ার পেছনে ওঁর একটা উদ্দেশ্য ছিল–সোজা কথায় যাকে বলব মোটিভ। সবচেয়ে বড়ো কথা, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আগে তেলের বাতিতে উনি গুঁড়োটা না রেখে গেলে আর কে রাখবে বলতে পার? উনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই ঘটেছে ঘটমাটা। অন্য কেউ ঘরে ঢুকলে তিন ভাইবোনেরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াত নিশ্চয় টেবিলের কাছ থেকে সরে আসত। তা ছাড়া, কর্নওয়ালের মতো নিরুপদ্রব অঞ্চলে শান্তিপ্রিয় বাসিন্দারা রাত দশটার পর কারো বাড়িতে সামাজিকতা রাখতে যায় না। কাজেই, সব পয়েন্ট একদিকেই মুখ করে আছে–মর্টিমার ট্রেগেন্নিসের দিকে অপরাধী তিনিই স্বয়ং।

ওঁর নিজের মৃত্যুটা তাহলে আত্মহত্যা?

দেখে সেইরকমই মনে হতে পারে অসম্ভব কিছু নয়। তিন ভাইবোনের এ-হাল যে করেছে, অনুতাপে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে সে যে নিজের হাতে নিজেকে একইভাবে মেরে প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে, এইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়। তবে এ-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কয়েকটা প্রবল যুক্তি আছে। ইংলন্ডে একজনই জানেন। তার নিজের মুখে সব শুনব বলে অ্যাপয়েন্টমেন্টও করে রেখেছি। আরে! একটু আগেই ভদ্রলোক এসে গেছেন দেখছি! এদিকে আসুন, ডক্টর লিয়ন স্টার্নডেল। ঘরে বসে এমন একটা বিতিগিচ্ছিরি কেমিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট করেছি যে আপনার মতো বিশিষ্ট ভদ্রলোককেও ঘরে আর আপ্যায়ন করা যায় না।

কটাং করে গেট খোলার আওয়াজ শুনলাম। বাগানের পথে আবির্ভূত হল সুবিখ্যাত আফ্রিকান অভিযাত্রীর রাজকীয় মূর্তি। সবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন আমাদের গাঁইয়া কুঞ্জের দিকে।

ঘণ্টাখানেক আগে আপনার চিঠি পেলাম, মি. হোমস। আসতে বলেছেন বলে এলাম। কিন্তু হঠাৎ শমন পাঠানো হল কেন বুঝলাম না।

আপনার মুখে ব্যাপারটা সবিস্তার শোনবার জন্যে। তারপর আপনি যাবেন আপনার জায়গায়, আমরা যাব আমাদের ডেরায়। যাই হোক, এসে ধন্য করেছেন। এইভাবে ফাঁকা জায়গায় আকাশের নীচে আপনাকে আপ্যায়ন করতে হচ্ছে বলে কিছু মনে করবেন না। এইমাত্র একটা লোমহর্ষক কাহিনির মালমশলা সংগ্রহ করলাম আমি আর আমার এই ডাক্তার বন্ধুটি। কাহিনির নাম দিয়েছি–কনিশ-আতঙ্ক। তা ছাড়া, আপনার সঙ্গে যেসব

আলোচনায় বসব এখন, তা আপনাকে ব্যক্তিগত আঘাত হানতে পারে। সেইদিক দিয়ে এখানে আপনি নিরাপদ, আড়ি পাতার কেউ নেই।

মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে কঠোর চোখে হোমসের পানে চাইলেন সিংহশিকারি অভিযাত্রী।

মশায়, আমাকে ব্যক্তিগত আঘাত হানতে পারে এমন কী ব্যাপার আপনার পেটে আছে আমার মাথায় আসছে না।

মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে খুন করার ব্যাপার। বললে হোমস।

মুহূর্তের জন্যে মনে হল সশস্ত্র থাকলেই বুঝি ভালো করতাম। স্টার্নডেলের প্রবৃত্তি-প্রকটিত ভীষণ মুখটা নিমেষ মধ্যে কালচে-লাল হয়ে গেল, অঙ্গারের মতো জ্বলে উঠল দুই চোখ। দড়ির মতো ফুলে উঠল রগের শিরা–দু-হাত মুঠো করে বাঘের মতো লাফিয়ে গেলেন হোমসের দিকে। থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন পরক্ষণেই প্রবল চেষ্টায় আসুরিক হিংস্র প্রবৃত্তিগুলোর লাগাম টেনে ধরলেন–হঠাৎ এমন ভয়ংকরভাবে ঠান্ডা হয়ে গেলেন যা তাঁর ক্রোধের অকস্মাৎ বিস্ফোরণের চাইতেও বেশি বিপজ্জনক বলে মনে হল।

মি. হোমস, বহুদিন বর্বরদের সঙ্গে ঘর করেছি, আইনকানুনের নাগালের বাইরে জীবন কাটিয়েছি, দরকার হলে আইন আমিই সৃষ্টি করেছি–দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আমিই হয়েছি। দয়া করে তা মনে রাখবেন। আপনি জখম হোন, এটা আমি চাই না।

আমিও আপনাকে আহত করতে চাই না, ডক্টর স্টার্নডেল। সেইজন্যেই তো পুলিশ না-ডেকে আপনাকে এনেছি। আমার সদিচ্ছের এইটাই কি স্পষ্ট প্রমাণ নয়?

অ্যাডভেঞ্চার-আকীর্ণ জীবনে এই প্রথম বুঝি ভয় পেলেন ডক্টর স্টার্নডেল। সশব্দে শ্বাস টেনে বসলেন পাশে। হোমসের আচরণে প্রশান্ত অভয়–উদবিগ্ন পুরুষের অন্তরে প্রলেপ দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। বিশাল থাবার মতো দু-হাত বারকয়েক মুঠো করে এবং খুলে বিড়বিড় করে আপন মনে কী যেন বললেন ডক্টর স্টার্নডেল।

তারপর বললেন, কী চান বলুন তো? খুলে বলুন মশায়, চালাকি করতে যাবেন না। আড়ে আড়ে কথা ছাড়ুন–খুলে বলুন। আর যদি ধাপ্পা মেরে বাজিমাত করব ভেবে থাকেন খুব খারাপ জায়গায় চালাকি করতে এসেছেন জেনে রাখবেন।

আমি তো খুলেই বলব–নইলে আপনি মন খুলবেন কী করে। খোলামেলা হাওয়াটা পারস্পরিক ব্যাপার তো। এরপর আমি যা করব, সেটা কিন্তু পুরোপুরি নির্ভর করছে আপনি কীভাবে আত্মসমর্থন করবেন, তার ওপর।

আত্মসমর্থন?

হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ।

কী ব্যাপার?

মর্টিমার ট্রেগেন্নিসকে খুন করার অভিযোগের ব্যাপারে।

রুমাল বার করে কপাল মুছতে মুছতে স্টার্নডেল বললেন, আপনি কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। এইভাবেই কি ধাপ্পা মেরে জেতেন সব কেসে?

শক্ত গলায় হোমস বললে, ডক্টর স্টার্নডেল, ধাপ্পাটা আপনি মারছেন–আমি নয়। প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটা ঘটনা বলব–যার ভিত্তিতে পৌঁছেছি এই সিদ্ধান্তে। জাহাজে মালপত্র চাপিয়ে আফ্রিকায় পাচার করে দেওয়ার পর আপনার হঠাৎ ফিরে আসার ঘটনাটা শুনেই বুঝেছিলাম, এই নাটক নতুন করে খাড়া করতে গেলে আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন–

আমি ফিরে এলাম–

শুনেছি কেন ফিরে এলেন এবং কারণটা নাকচও করেছি বিশ্বাস করার মতো নয় বলে। যাকগে সে-কথা। আপনি আমার কাছে এলেন শুধু একটা কথা জানতে–কাকে সন্দেহ করেছি আমি। আপনার প্রশ্নের জবাব আমি দিলাম না। আপনি সোজা পাদরিমশায়ের বাড়িতে গিয়ে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজের বাড়ি চলে গেলেন।

আপনি জানলেন কী করে?

আপনার পেছন পেছন আমি গিয়েছিলাম বলে।

আমি তো কাউকে দেখিনি।

আমি যখন আপনার পেছন নেব, ঠিক এইরকমটাই দেখবেন সবসময়ে–মানে, আমাকে কখনো দেখতে পাবেন না–আমি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাব। সারারাত ছটফটিয়ে কাটালেন নিজের কটেজে, শেষকালে একটা মতলব মাথায় এল। সকাল বেলা বেরিয়ে পড়লেন প্ল্যানমাফিক কাজ হাসিল করার জন্যে। তখন সবে ভোরের আলো ফুটছে! কটেজ থেকে বেরিয়েই দরজার পাশ থেকে তাগাড় করা লালচে নুড়ি কয়েক খামচা তুলে নিয়ে পকেটে পুরলেন।

ভীষণ চমকে উঠলেন স্টার্নডেল, অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন হোমসের দিকে।

হনহন করে এক মাইল হেঁটে পৌঁছোলেন পাদরিমশায়ের বাড়িতে। এখন যে খাঁজকাটা সুখতলাওলা টেনিস জুতো পায়ে দিয়েছেন, তখন এই জুতো পরেই বেরিয়েছিলেন। পাদরিভবনে পৌঁছে ফলের বাগান পেরিয়ে পাশের ঝোপ টপকে পৌঁছোলেন ভাড়াটে ট্রেগেন্নিসের জানলার ঠিক নীচে। তখন দিনের আলো ফুটেছে, কিন্তু বাড়ির কেউ জাগেনি। পকেট থেকে কয়েকটা নুড়ি বার করে আপনি মাথার ওপরকার জানলা টিপ করে ছুঁড়তে আরম্ভ করলেন।

তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন স্টার্নডেল।

সাক্ষাৎ শয়তান নাকি আপনি!

অভিনন্দন শুনে হাসল হোমস। দু-মুঠো, কি তিন মুঠো নুড়ি ছোড়বার পর জানলায় এসে দাঁড়ালেন ভাড়াটে ভদ্রলোক। হাত নেড়ে তাঁকে নীচে আসতে বললেন আপনি। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নিয়ে নীচের বসবার ঘরে নেমে এলেন ভদ্রলোক। আপনি ঢুকলেন জানলা দিয়ে। কথা বললেন সামান্য কিছুক্ষণের জন্যে আগাগোড়া পায়চারি করলেন ঘরময়। তারপর বেরিয়ে এসে জানলা বন্ধ করে দিলেন। লনে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরিয়ে দেখতে লাগলেন কী হয়। ট্রেগেন্নিস মারা যাওয়ার পর যে-পথে এসেছিলেন, সেই পথেই বাড়ি ফিরে গেলেন। ডক্টর স্টার্নডেল, এবার বলুন এ-কাজ করলেন কেন? কী যুক্তিতে করলেন? মোটিভ কী আপনার? ওপরচালাকি করতে গেলে কিন্তু ব্যাপারটা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যাবে জেনে রাখবেন।

মুখখানা ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল ডক্টর স্টার্নডেলের। দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপরেই এক ঝটকায় বুক পকেট থেকে একটা ফোটোগ্রাফ বার করে ছুঁড়ে দিলেন সামনের ঘেসো টেবিলের ওপর।

যা কিছু করেছি, এইজন্যেই করেছি।

পরমাসুন্দরী এক মহিলার আবক্ষ আলোকচিত্র! ঝুঁকে পড়ল হোমস।

বলল, ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস।

হ্যাঁ, ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস।বললেন ডক্টর স্টার্নডেল। আমার ভালোবাসার মানুষ ব্রেন্দা ট্রেগেন্নিস। এ-ভালোবাসা আজকের নয়–বহু বছরের মনপ্রাণ দিয়ে সে ভালোবেসেছে আমাকে, আমি বেসেছি তাকে। কর্নিশ অঞ্চলে কেন মাঝে মাঝে এসে একলা কাটিয়ে যাই–কেউ তা বোঝেনি অবাক হয়েছে–কারণটা আবিষ্কার করতে পারেনি। এই হল সেই রহস্য। শুধু এর জন্যেই সুদূর আফ্রিকা থেকে ছুটে এসেছি বার বার। বছরের পর বছর গিয়েছে ভালোবাসা আরও নিবিড় হয়েছে। সে অপেক্ষা করেছে, আমিও অপেক্ষা করেছি, বিয়ে কিন্তু হয়নি। কেননা, আমি বিবাহিত। বউ অনেকদিন পালিয়েছে। অথচ ইংলন্ডের জঘন্য আইনের জন্যে তাকে ডাইভোর্সও করতে পারিনি। বছরের পর বছর কেবল অপেক্ষাই করে গিয়েছে সে-অপেক্ষা যে এই পরিণতির জন্যে, তা কে জানত বলুন। বলতে বলতে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ডক্টর স্টার্নডেল। থরথরিয়ে কেঁপে উঠল সুবিশাল দেহ। দাড়ির নীচে দু-হাত ঢুকিয়ে নিজেই টিপে ধরলেন নিজের গলা। অতি কষ্টে সামলে নিলেন নিজেকে ফোঁপানি থামিয়ে আত্মস্থ হয়ে ফের বলতে লাগলেন।

পাদরি সাহেব সব জানেন। উনি আমাদের দুজনেরই সব খবর রাখেন। বিশ্বাস করে ওঁর কাছেই কেবল মনের কথা বলেছি আমরা। তাই উনি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন আমাকে। আফ্রিকায় যাওয়া বা মালপত্রের কথা তখন কি আর মনে থাকে? সব ফেলে চলে এলাম। যাকে জীবন দিয়ে ভালোবেসেছি তার এই পরিণতি দিশেহারা করে দিল আমাকে সব

ফেলে দৌড়ে এলাম শোধ নেব বলে। মি. হোমস, আপনার হারানো সূত্র এবার নিশ্চয় পেয়েছেন?

বলে যান।

পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট বার করে ঘেসো-টেবিলের ওপর রাখলেন ডক্টর স্টার্নডেল। প্যাকেটটার ওপরে লেখা র্যাডিক্স পেডিস ডায়াবোলি। নীচে লাল রঙের বিষের লেবেল সাঁটা। প্যাকেটটা আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, আপনি তো ডাক্তার। এ-জিনিসের নাম কখনো শুনেছেন?

শয়তানের-পা শেকড়! না, কক্ষনো শুনিনি!

তার জন্যে ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না। যদ্দূর জানি, বুড়ার ল্যাবরেটরিতে একটাই নমুনা আছে এই শেকড়ের—ইউরোপের আর কোথাও নেই! বিষবিজ্ঞান বা ভেষজবিজ্ঞানে এখনও ঠাঁই পায়নি এই শেকড়। শেকড়টাকে দেখতে কিছুটা মানুষের পায়ের মতো, কিছুটা ছাগলের পায়ের মতো–তাই উদ্ভিদবিজ্ঞানী অভিযাত্রীরা এর নামকরণ করেছেন শয়তানের পা। পশ্চিম আফ্রিকায় যারা রোগ সারায়, এ-শেকড়ের খবর তারাই কেবল রাখে–আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ প্রয়োগের সময় কাজে লাগায়–তাই শেকড়-রহস্য আর কাউকে জানায় না। উবাঙ্গিতে১৪ অদ্ভুত একটা ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ায় এই নমুনাটা হাতে পেয়েছিলাম আমি; বলতে বলতে, প্যাকেট খুলে লালচে বাদামি নস্যির মতো একগাদা গুঁড়ো বার করে দেখালেন ডক্টর স্টার্নডেল।

তারপর? কঠিন কণ্ঠে বললে হোমস।

সবই আপনাকে বলব, মি. হোমস। অনেক কিছুই আপনি জানেন, তাই আমার স্বার্থে আপনার বাকিটুকুও জানা দরকার। ব্রেন্দার জন্যেই ট্রেগেন্নিস ফ্যামিলির সঙ্গে খাতির জমেছিল আমার। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে মর্টিমারের সঙ্গে এদের একবার বিবাদ লাগে। পরে তা মিটে যায়। মর্টিমারকে কিন্তু আমি বেশ কয়েকটা ব্যাপারে সন্দেহ করেছিলাম। লোকটা ধূর্ত, চাপা, পঁাচালো–কিন্তু পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাঁধাতে চাইনি সঠিক কোনো কারণ না-থাকায়।

হপ্তা দুয়েক আগে কটেজে এসেছিল মর্টিমার। আফ্রিকায় দুষ্প্রাপ্য কয়েকটা জিনিস দেখিয়ে গল্প করেছিলাম। এই পাউডারটাও দেখিয়েছিলাম। আশ্চর্য গুঁড়োর অদ্ভুত ধর্ম ব্যাখ্যা করেছিলাম। ব্রেনের মধ্যে ভয় পাওয়ার কেন্দ্রকে কীভাবে উদ্দীপ্ত করে, কীভাবে মানুষকে হয় পাগল, নয় একেবারে মেরে ফেলে–তা বলেছিলাম, নিগ্রোদের কাউকে শাস্তি দেওয়ার দরকার হলে গাঁয়ের পুরুত এই গুঁড়ো আগুনে ফেলে তার দফারফা করে ছাড়ে। ইউরোপের বিজ্ঞান আজও এই বিষের সন্ধান পায়নি বিষের ক্রিয়া ধরবার ক্ষমতাও কোনো বিজ্ঞানীর নেই। ঘর ছেড়ে বাইরে যাইনি আমি, তা সত্ত্বেও কীভাবে যে গুঁড়োটা সরিয়েছিল মর্টিমার জানি না। খুব সম্ভব আমি যখন আলমারি খুলে ঝুঁকে পড়ে কৌটো দেখছিলাম, সেই সময়ে শেকড়ের কয়েক চিমটে গুঁড়ো হাতসাফাই করে। বিষটা কতক্ষণে কাজ দেয় পরিমাণ কতখানি লাগে–এই নিয়ে ওর প্রশ্নগুলো কিন্তু বেশ মনে

আছে। তখন স্বপ্নেও ভাবিনি ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য আছে বলেই অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইছে শয়তানের পায়ের শয়তানি বৃত্তান্ত।

প্লিমাউথে পাদরির টেলিগ্রাম পাওয়ার আগে এ-প্রসঙ্গে আর ভাবিনি। কুচক্রী মর্টিমার ভেবেছিল, আমি আফ্রিকায় রওনা হয়ে গিয়েছি বেশ কয়েক বছরের জন্যে কেউ আর আমার খবর পাবে না। কিন্তু আমি ফিরে এলাম সঙ্গেসঙ্গে। সত্যিই আমারই শয়তানের-পা বিষ দিয়ে পৈশাচিক এই কাণ্ডটা করা হয়েছে কি না, আগে তা যাচাই করতে চেয়েছিলাম। আপনার কাছে এলাম আপনি কী ভেবেছেন জানবার জন্যে। কিন্তু দেখলাম, কিছুই জানেন না আপনি। আমি কিন্তু বুঝেছিলাম, দুজনকে পাগল আর একজনকে খুন করেছে মর্টিমার। করেছে বিষয় সম্পত্তির লোভে। তিনজনকেই পথ থেকে সরাতে পারলে সব বিষয় একা পাবে–এই লোভে শয়তানের-পা শেকড় দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে এমন একটি মেয়েকে যাকে আমি সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালোবেসেছি–আমাকেও যে ভালোবেসেছে। মহাপাপী এই মর্টিমারকে সাজা দেওয়ার দায়িত্বও আমার। ভাবতে বসলাম সাজাটা কী ধরনের হওয়া উচিত।

আইনের স্মরণ নেব কি? কিন্তু প্রমাণ কই? প্রমাণ ছাড়া অত্যাশ্চর্য এই উপকথা আদালত বিশ্বাস করবে কেন? মর্টিমার অপরাধী–আমিই শুধু জানি ও যা করেছে, তা বর্ণে বর্ণে যে সত্য–কল্পনা নয়, তা দেশের লোককে বিশ্বাস করাব কেমন করে? চেষ্টা করলে হয়তো সাক্ষীসাবুদ প্রমাণ জোগাড় করে বিশ্বাস করাতে পারি নাও পারি! কিন্তু যদি না-পারি? ঝুঁকি নিতে আমি রাজি নই। আমার প্রতিটা রক্তবিন্দু তখন প্রতিহিংসা নেওয়ার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছে। মি. হোমস, এর আগেও আপনাকে বলেছি, বহু বছর আদিম

অসভ্যদের সঙ্গে ঘর করেছি আমি–আইনের বাইরে কাটিয়েছি বলেই নিজের আইন নিজেই বানিয়েছি–সাজা নিজেই দিয়েছি। এখনও তাই করব। ঠিক যেভাবে মারা গেছে আমার ভালোবাসার পাত্রী, ঠিক সেইভাবে মরতে হবে মর্টিমারকেও। ব্রেন্দার যে-পরিণতি সে ঘটিয়েছে–সেই একই পরিণতির দিকে তাকে ঠেলে দেব আমি–এই হল আমার প্রতিজ্ঞা।

সবই বললাম আপনাকে। বাকিটুকু আপনিই বলেছেন। সারারাত ছটফট করলাম। ভোর বেলা বেরিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে টেনে তুলতে অসুবিধে আছে অনুমান করেই পকেট বোঝাই করে কয়েকমুঠো নুড়ি নিয়ে গেলাম, জানলা লক্ষ করে ছুঁড়তে লাগলাম। নীচে এসে জানলা খুলে আমাকে ভেতরে ঢোকাল মর্টিমার। ভণিতা না-করে সোজাসুজি আরম্ভ করলাম কাজের কথা বুঝিয়ে দিলাম আর সমস্ত কুকীর্তি আমি ধরে ফেলেছি এবং শাস্তি দেওয়ার জন্যেও তৈরি হয়ে এসেছি। রিভলভার তুলে রাসকেলকে কাঠের পুতুলের মতো বসিয়ে রাখলাম চেয়ারে। ল্যাম্প জ্বেলে খানিকটা গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম ওপরে। তারপর রিভলভার নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম জানলার বাইরে পালাবার চেষ্টা করলেই ভয় দেখিয়ে ফের ঘরে ঢোকাব। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মারা গেল মর্টিমার। অকথ্য যন্ত্রণা পেয়েছিল মরবার আগে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আমার পাথরের মতো শক্ত মনে কোনো দাগ পড়ল না। ব্রেন্দা যে কষ্ট পেয়েছে, তত কষ্ট ত পেতে হয়নি–কাজেই আমার মন কাদবে কেন? মি. হোমস, সবই তো শুনলেন, এখন বলুন কী করবেন আমাকে নিয়ে। আমি এখন আপনার মুঠোর মধ্যে। যা খুশি করতে পারেন–বাধা দেব না। মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না শুধু এইটুকু জেনে রাখুন জানি না কোনো নারীকে কখনো ভালোবেসেছেন কি না বাসলে আমি যা করেছি, আপনিও তাই করতেন।

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইল হোমস।

তারপর বলল, আপনার প্ল্যান কি এখন?

বাকি জীবনটা মধ্য আফ্রিকায় প্রাণীতত্ত্ব নিয়ে কাটাব। অর্ধেক কাজ এখনও বাকি।

যান, বাকিটুকু শেষ করে ফেলুন। আপনাকে আমি অন্তত আটকাব না।

উঠে দাঁড়াল ডক্টর স্টার্নডেলের দৈত্যমূর্তি। গম্ভীরভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে মন্থর চরণে বেরিয়ে গেলেন কুঞ্জের বাইরে। পাইপ ধরিয়ে নিয়ে তামাকের থলি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল হোমস।

বলল, ভায়া, পৃথিবীতে এমন অনেক ধোঁয়া আছে যা খুব বিষাক্ত নয়, কিন্তু শ্রান্ত মনকে চাঙা করে তুলতে অদ্বিতীয়। আপাতত সেই জাতীয় ধোঁয়া খানিকটা খাও। এ-কেসে আমাদের নাক গলাতে কেউ যখন ডাকেনি তখন আমাদের যা খুশি আমরা করতে পারি। নিজেরা যখন তদন্ত করেছি, কী করব না-করব, সেটাও ঠিক করব নিজেরা। তাই নয় কি? তুমি হলে কী করতে? পুলিশে ধরিয়ে দিতে ভদ্রলোককে?

নিশ্চয় না।

ওয়াটসন, জীবনে কোনো নারীকে ভালোবাসিনি, যদি বাসতাম এবং সে-নারীটির শেষ দশা যদি এইরকম হয়, তাহলে সিংহশিকারি ঠিক যেভাবে আইনের বাইরে গিয়ে সাজা দিয়েছেন, আমিও হয়তো তাই করতাম। যাকগে ভায়া কীভাবে রহস্যভেদ করলাম, তা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে তোমার বুদ্ধিমত্তাকে খাটো করতে চাই না। জানলার বাইরে নুড়ি দেখেই শুরু করেছিলাম গবেষণা। পাদরির বাগানে এ-রকম নুড়ি কোথাও নেই। ডক্টর স্টার্নডেলের ওপর নজর পড়তেই তাঁর কটেজের বাইরে দেখলাম একই নুড়ি পড়ে রয়েছে পাকার। দিনের আলোয় জ্বলন্ত ল্যাম্প এবং অভ্র-আচ্ছাদনের ওপর গুঁড়ো দেখেই যুক্তির কৌশল মনে মনে বানিয়ে নিয়েছিলাম। যাকগে, এ-প্রসঙ্গ এবার বাদ দাও। কেল্টিক কথাবার্তার চালডিয়ান শেকড় যে এই কর্নিশ অঞ্চলেই রয়েছে তাই নিয়ে গবেষণা শুরু করা যাক।

———

টীকা

শয়তানের পা : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ডেভিলস ফুট স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৯১০ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

হার্লে স্ট্রিট : লন্ডনের এই রাস্তায় বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অফিস বা চেম্বার অবস্থিত : দ্য রেসিডেন্ট পেশেন্ট গল্পের টীকা দ্রষ্টব্য।

সে কাহিনি অন্য সময়ে বলা যাবেখন : এই গল্প ওয়াটসন কোনোদিনই বলেননি।

কর্নিশ অন্তরীপ : ইংল্যন্ডের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত অঞ্চল।

পোলধু উপসাগর : এই নামে কোনো উপসাগর নেই। কিন্তু মাউন্টস বে-র তীরবর্তী পোলধু কোভ নামে একটি জায়গা আছে। এই পোলধু থেকে ১২ ডিসেম্বর ১৯০১ তারিখে মর্স কোডে প্রথম রেডিয়ো ট্রান্সমিশন প্রেরিত হয়। অতলান্তিকের ওপারে। নিউফান্ডল্যান্ডের সেন্ট জন-এ সেই রেডিয়ো বার্তা গ্রহণ করেন ইতালিয় পদার্থবিদ ওগলিয়েমমা মার্কনি (১৮৭৪-১৯৩৭)।

মাউন্টস বে : ইংলিশ চ্যানেল এবং অতলান্তিক মহাসাগরের ঠিক সংযোগস্থলে এর অবস্থান।

কর্নিশ ভাষা : জুলিয়াস সীজারের সময় থেকে ব্রাইটনদের কথ্য ভাষা কর্নিশ, কেল্টিক উপগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীতে এই ভাষার প্রচলন থাকার নথীভুক্ত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। ইংলান্ডের অন্য দুটি ভাষা ব্রেটন এবং ওয়েলশ অদ্যাবধি প্রচলিত থাকলেও কর্নিশ ভাষার ব্যবহার অষ্টাদশ শতকে লুপ্ত হয়।

চালডিন ভাষা : সেমিটিক ভাষা চলে ভিন্ন বা চ্যালডিয়নের অপর প্রচলিত নাম অ্যারামিক। এই ভাষার সঙ্গে হিব্রু, সিরিয়াক এবং ফিনিশীয় ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়।

ফিনিশিয়ান : বর্তমান লেবানন যে অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানেই ছিল ফিনিশিয়া। ফিনিশীয়রা ছিল নৌবাণিজ্যে পারদর্শী। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি ফিনিশিয়া পারসিক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে টেবিলে বসেছিলাম।

জর্জ বসে ছিল জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে : জর্জ যদি হুইস্ট খেলায় মর্টিমারের বিপরীতে বসে, তাহলে ওয়েন আর ব্রেন্দা ছিল মুখোমুখি চেয়ারে। সেক্ষেত্রে মৃত ব্রেন্দার দুই পাশে দুই ভাইয়ের থাকা সম্ভব হয় না।

তারপরে আনে মৃত্যু : একইরকমভাবে বিষাক্ত মোমবাতির ধোঁয়া দিয়ে হত্যা করবার ঘটনা দেখা গিয়েছে এডগার অ্যালান পো-র লেখা একটি গল্পে।

বুড়া : ১৩৬১ সালে হাঙ্গেরী রাজধানীর পত্তন হয় বুড়া শহরে। ১৮৭৩-এ দানিয়ুব নদীর অপর পারে অবস্থিত পেস্ট শহরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ফলে শহরের নতুন নাম হয় বুড়াপেস্ট।

আনুষ্ঠানিকভাবে বিষ প্রয়োগের সময় : আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের বন্য উপজাতির মানুষদের মধ্যে অভিযুক্তকে বিষ খাইয়ে তার অপরাধ নির্ণয়ের প্রথা আছে। বিষ খেয়ে যদি সে বমি করে বিষ উগরে দেয়, তাহলে ধরে নেওয়া হয় লোকটি নিরপরাধ। অন্যথায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

উবাঙ্গি : কিংবা উবাংসি বা মুরাংসি মধ্য আফ্রিকার একটি নদী। কঙ্গোর প্রধান শাখানদী ভবাংগি এবং এমবমু (Ambomu) নদী ১৮৯৭ সালে বেলজিয়ান কঙ্গো এবং ফরাসি কঙ্গোর সীমা নির্ধারক রেখা হিসেবে চিহ্নিত হত।

এ-রকম নুড়ি কোথাও নেই : স্টার্নডেল পাদরির বাগানের নুড়ি না কুড়িয়ে নিজের বাগান থেকে নুড়ি নিয়ে এসেছিল কি শার্লক হোমসের অনুসন্ধানের সুবিধার্থে? প্রশ্ন তুলেছেন গবেষক ডি. মার্টিন ডেকিন।